'বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে

পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

বিমল চন্দ্র বর্মণ

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫

রেজি. নং: **A00HI1200215**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

Certified that the Thesis entitled

"বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১" ***("Bam Rajneetite Uttarbanger Rajbanshi Samaj: 1946-2011")*** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Rup Kumar Barman, Professor, Department of History, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree of diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor **Candidate**

Dr. Rup Kumar Barman
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata-700032
Dated:

(Bimal Chandra Barman)
Dated:

মুখবন্ধ

সমাজব্যবস্থার দৈনন্দিন জটিলতার সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করার তাগিদে অনেক সময় সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে ‘জাতি’ বা ‘শ্রেণি’ প্রসঙ্গটি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ সমাজবিন্যাস ও তার কাঠামোর ব্যাখ্যা যেমন ‘জাতি’ বা ‘শ্রেণি’ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে অতি সহজে দেওয়া সম্ভব তেমনি স্তরায়নের জায়গাটি উভয়ের গঠন প্রনালীর সঙ্গে সংপৃক্ত। অন্যথায় উৎপাদনের সম্পর্ককে ‘শ্রেণি’ ও ‘জাতি’ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বিচার করার প্রবণতার থেকে উভয়ের আলোচনার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কথা বললে ‘জাতি’ ব্যবস্থার আলোচনা স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। কেননা ভারত জাতপাতের একটি দেশ। সেকারণে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা ও জাতি বিষয়টি (Caste) একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না। জাতি যে দেশের প্রধান ভিত্তি সেখানে জাতি বিন্যাসকে সামনে রেখে দেশ ভাঙ্গা গড়ার ঘটনাবলি সংগঠিত হয়েছে। অর্থাৎ জাতের প্রসঙ্গটি ওতপ্রোতভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলি (Political Party) তার নীতি নির্ধারণে জাতি প্রশ্নটিকে শুধুমাত্র রাজনীতিতে নিয়ে আসেন নি বরং তাকে নিয়ে কীভাবে রাজনীতি করা যায় বা দলের প্রভাব বাড়ানো যায় সে বিষয়ে সজাক দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। সম্প্রতি (২০২১) পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির এজেন্ডা তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন জাতভুক্ত সমাজকে নিয়ে। কত ধরনের সুবিধে পাইয়ে দেওয়া যায় তার তালিকা দিয়ে প্রচার শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন জাতির অতীত গৌরব ও তার স্বরূপ নিয়ে ভাষ্য তৈরি করে রাজনীতিবিদরা চেষ্টা করেছিল সহজে কীভাবে

সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। ফলত বিভিন্ন রাজনীতির বয়ানে জাতি বিষয়টি আলোচনার প্রধান উপজীব্য হলেও সমাজের নিম্নবর্ণের তথা শ্রমজীবি মানুষের প্রতি লক্ষ রেখে মার্কসীয় ইতিহাস রচনা হয়েছে। আলোচ্য সন্দর্ভের সীমিত পরিসরে মার্কসীয় তত্ত্বের বিচারে সমাজব্যবস্থাকে না ভাবলেও বঙ্গের বামপন্থীদের আখ্যানে ও ব্যাখ্যায় কীভাবে উত্তরবঙ্গের তথা রাজবংশীদের প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে তার দিকে লক্ষ রেখে প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছে। সেইজন্য আমাদের গবেষণার সময়সীমা মূলত ১৯৪৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বিবেচিত হয়েছে। কারণ আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে বামপন্থীদের উত্থান ও পতনের ঘটনাক্রম যুক্ত। যার বিকাশ মূলত ১৯৪৬ সাল থেকে ধরা যেতে পারে। উক্ত সময়ে তেভাগার আন্দোলনে বামপন্থী নেতাদের রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা যুক্ত হয়ে একটা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্র নির্মাণ করতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে কৃষক হিসাবে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ জাতি ও শ্রেণির উভয় ধারণা আন্দোলনে যুগ্ম চরিত্র প্রদান করতে সাহায্য করেছে। সেকারণে সন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারিত হয়েছে*‘বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১’*। বাম-রাজনীতির পরিমন্ডলে রাজবংশী সমাজ কীভাবে পরিচালিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ বুঝতে জাতি প্রশ্নটি সন্দর্ভে প্রায়োগিক বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে। অর্থাৎ জাতি পরিসরে শ্রেণির বিষয়টি কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং উক্ত পরিমন্ডলে শ্রেণির আখ্যান কীভাবে এসেছে তার নিরিখে আলোচ্য সন্দর্ভটি রূপায়িত হয়েছে।

বঙ্গের বামপন্থী কার্যকলাপে মূলত দৈনন্দিন অভ্যাস পাল্টানোর উপর জোর দিয়ে সমাজ বিশ্লেষণে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থানের থেকে শ্রেণিসংগ্রামের মতাদর্শ কতটা স্থানীয় সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছিল তার প্রাথমিক অনুসন্ধান আলোচ্য প্রকল্পটি রচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইতিহাস রচনার উপাদান

হিসাবে একপ্রকার কোন ঘটনা বা অভ্যাস কিংবা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সূত্রায়িত হয়। সেই নিরিখে বামেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ইতিহাসে উপজীব্য। এই Commonality উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের একটি যোগসূত্র যা স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলে কি প্রচলিত সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে অন্যরকম হয়ে যায় ? সামাজিক সংগঠনগুলো কি ভেঙ্গে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় ? এই জিজ্ঞাসাগুলো প্রাথমিকভাবে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

যুগ্মভাবে জাতি এবং শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাসকে নিয়ে আলোচনা আকাদেমির একটি স্বীকৃত বিষয়। উক্ত বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের সমর্থন যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি স্থানীয় ইতিহাস কীভাবে বস্তুবাদী ইতিহাসের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় তার উপর স্বয়ং কার্ল মার্কসের লেখনী অবগত হতে সাহায্য করেছে। উভয় বিষয় আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা দেখে মনে হয় কোন স্থানের নিরিখে যুগ্মভাবে জাতি এবং শ্রেণির সহবস্থান পরিক্ষা নিরিক্ষা করা হলে শ্রেণি প্রশ্নটি প্রাধান্য পেয়েছে। এমন ভাবনাই প্রকট হয়েছে বঙ্গের বামপন্থীদের আখ্যান ও ব্যাখ্যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পেশাগত চরিত্র অনেকটাই 'সার্বজনীন' ভাবনাকে অগ্রণী করে তুলেছে বলেই জাতি বিষয়টি অবহেলিত থেকে গেছে। শুধু জাতি বিষয়টি নয়, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো একপ্রকার এড়িয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার বিকাশ হয়েছে বলে মনে করেন সুদীপ্ত কবিরাজ তার *'মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান* (২০২২) নামক গ্রন্থে। এই অবহেলার ভাবভঙ্গিমা বদল না হলেও আলোচ্য সন্দর্ভটি জাতি প্রতিরোধের নিরিখে স্থানের স্বতন্ত্রতা ও তার কাঠামোকে উপস্থাপন করেছে। স্থানবাচক জনসমষ্টির আচরণ বা অভ্যাস কীভাবে স্থানের ইতিহাস নির্মাণ করে এবং

উক্ত প্রেক্ষাপটে কীভাবে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস যুক্ত করার প্রচেষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গের বামপন্থীরা সেই দিকে লক্ষ রেখে প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছে।

বঙ্গের বামপন্থা জাতিভেদ কাঠামোকে আঘাত করে বঙ্গীয় সমাজে যুক্ত হওয়ার প্রয়াস রাখে। অর্থাৎ একটা সংঘাতের বিনিময়ে তার প্রাপ্তি ঘটে। বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলন এই ঘটনার সাক্ষ্য দেয় এবং হটাৎ করে বামেদের উত্থান শুরু হয়। এই বিষয়টিকে আলোচনার নিয়ে আসতেই কতগুলো প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। যেমন এর ফলে কি জাতির ইতিহাসের পরিপূরক হতে পেরেছিল শ্রেণির ইতিহাস ?- এই রকম কতগুলো ভাবনাই আমাদের প্রকল্পটি রূপায়নে সাহায্য করে। তবে আলোচ্য সন্দর্ভটি রচনা কখনই সম্ভব হত না, যদি না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণ বিষয়টির উপর আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন। শুধু তাই নয়, গবেষণা প্রকল্পটি রূপায়নে তত্ত্বাবোধয়কের দায়িত্ব নিয়ে তিনি গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। হয়ত কয়েকটি বাক্য বা শব্দ ব্যয়ে ওনার এই অবদান তুলে ধরা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে আমার বন্ধুবর যারা (কিশোর রায় সরকার, অঙ্কন রায়, প্রসেনজিত নস্কর, জয়দীপ দত্ত, শুভঙ্কর রায় এবং আরও অনেকেই) সবসময় পাশে থেকে বিভিন্ন মতামত এবং বইপত্র প্রদান করেছে তাদের কথাও কখনই কয়েকটি মুখের শব্দে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং অনেকের সঙ্গে গল্পগুজবের আড্ডায় সামিল হয়েছিলাম, তারা সমাজের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় বুঝতে শিখিয়েছে, এদের প্রত্যেকের সহযোগীতা ও সাহায্য ব্যতিত এ গবেষণা কর্মটি রচনা করা সম্ভব হত না। এদের প্রত্যেকের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা ও বয়স্ক ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আবার স্থানীয় ইতিহাস জানতে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা যেমন করতে হয়েছে, তাদের

সকলের নাম না বললেও তাদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে এই গবেষণা প্রকল্পটি রচনা করতে আমরা National Library, কলকাতা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা; West Bengal Secretariat library, কলকাতা; West Bengal State Archives, কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; মুজফফর আহমেদ গ্রন্থাগার, কলকাতা; উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার; আজাৎ হিন্দ পাঠাগার, জলপাইগুড়ি; এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের অকুন্ঠ সহযোগীতা পেয়েছি। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে আমার বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ এ কাজে তাদের ঐকান্তিক ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা সঙ্গে জুরে আছে।

তারিখ: স্বাক্ষর

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১-১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও বঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতির সূচনা পর্ব ১৮-৪২

তৃতীয় অধ্যায়: রাজবংশী সমাজজীবন ও জাতি প্রতিরোধ ৪৩-১৪৪

চতুর্থ অধ্যায়: *রাজবংশীদের বাম-রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া: দেশভাগ পর্যন্ত* ১৪৫-২০৫

পঞ্চম অধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের শ্রেণি রাজনীতিতে রাজবংশীদের অবস্থান: উত্তর-উপনিবেশিক পর্ব ২০৬-২৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ২৯৬-২৯৮

সহায়ক গ্রন্থসমূহ: ২৯৯-৩১১

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সাধারণত ‘জাতি’ ও ‘শ্রেণি’র ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক পর্বে উভয়ের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাদৃশ্যতা প্রতীয়মান হয়। এই সমরূপতার জায়গাটি উভয়ের চারিত্রিক কাঠামোর স্তরায়ন ও তার সম্পর্ককে ঘিরে ব্যপ্ত। তবে উভয়ের মতাদর্শ সম-ভাবাপন্ন না হলেও চারিত্রিক কাঠামোতে কিছুটা মিলগত দিক রয়েছে। ফলত একটা জটিলতা প্রকাশ পায় যখন যুগ্মভাবে তার চর্চা হয়ে থাকে। একে অপরের সুক্ষ্ম সম্বন্ধ এমনভাবে মিলেমিশে রয়েছে তার প্রাথমিক বিচার যদি উৎপাদন সম্পর্ক দিয়ে শুরু করা যায় তাহলে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য অতি সহজে প্রতীয়মান হয়। শ্রেণির ধারণা মূলত চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থাকে বদল করার উপর জোর দেয়। অন্যদিকে জাতি ব্যবস্থা নতুন করে উৎপাদনের সম্পর্ক তৈরি করতে উৎসাহ না দেখালেও প্রয়োজনের নিরিখে তার সম্পর্ক সাধিত করে। অন্যথায় জাতের প্রশ্নটির সঙ্গে ভারত তথা বঙ্গের সমাজজীবন জড়িয়ে রয়েছে। তার উৎপত্তি স্বাভাবিকভাবে (Natural Way) হলেও শ্রেণির ধারণাটি একপ্রকার ব্যাখ্যান (Interpretation) দিয়েই হয়ে থাকে। সুতরাং জাতি প্রশ্নটি কথা বললেই একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসর ও তার অবস্থানকে বুঝিয়ে থাকে। সে বিষয় নিয়ে, সাহিত্যিক থেকে সমাজবিজ্ঞানী এমনকি রাজনীতিবিদদের আলোচনায় ‘জাতি’ ও ‘শ্রেণির’ প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে। তবে তাদের আলোচনার উদ্দেশ্য একমাত্রিক না হলেও ভিন্ন মতামত বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে সমাজকে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ফলত উভয় ধারণার মধ্যে সমাজ-সংগঠনের

প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। সেদিক থেকে উভয়ের স্বতন্ত্রতা ও আন্তঃসম্পর্কের সমান গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান জাতি ব্যবস্থা তার কৌলিন বৃত্তি ত্যাগ করে উৎপাদনের নতুন নতুন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। সেই সূত্র ধরে অনেকেই জাতির তুলনায় শ্রেণির গ্রহণযোগ্যতাকে বড় করে দেখেছেন।[১] তবে উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে জাতি অবস্থান নিলেও জাতের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। সেই দিক থেকে দেখলে জাতিসত্তার বিষয়টি তার ঐতিহ্যের কালানুক্রমিকতা বজায় রেখেছে। উভয়ের এই সংঘবদ্ধতা বোঝার সুবিধার্থে গবেষণার স্থান ও জাতি প্রসঙ্গটি উত্তরবঙ্গের নিরিখে রাখা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা মূলত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজব্যবস্থার জায়গা থেকে করা হয়েছে। উক্ত পরিসরে বামপন্থী রাজনীতির সমন্বয় ও সংঘাত কীভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার আলোচনা করছে আলোচ্য সন্দর্ভটি।

বিশ শতকের গোড়া থেকে ‘শ্রেণি’র নিরিখে সমাজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে নিম্নবর্ণীয় জাতিসমূহের মধ্যে চেতনার জাগরণ উক্ত সময় থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যপ্ত হয়। উভয় ধারণার আবির্ভাবের সময়কাল প্রায় একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিকশিত হয়। উভয়ের এই উন্মেষ ভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া হলেও তাদের পারস্পরিকতা আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রেণি ভাবনার মধ্য দিয়ে সমাজ নির্মাণ প্রশ্নে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। যে উদ্দেশ্যের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ককে নতুন করে রাজনীতিকরণ করে ঐক্যতার প্রশ্নকে জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই ভিন্নভাবে উৎপাদন করার কৌশল আয়ত্ব করে উৎপাদনকারীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদানের মধ্য দিয়ে শ্রেণির প্রশ্নটি আবির্ভূত হলেও জাতি কাঠামোতে সে রকমভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভাবা হয়নি। চার বর্ণের মধ্যে শেষক্ত বর্ণ দুটিকে (বৈশ্য ও শূদ্র) সেবাকর্মের মধ্যে থাকার পরামর্শ

দিয়েছেন শাস্ত্রকারীরা। সেদিক থেকে দেখলে জাতি ও শ্রেণির গণ্ডির মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে নিম্নজাতির বা শ্রেণির অবস্থান লক্ষণীয়। তাদের অবস্থান স্তরায়নে যথেষ্ট প্রযুক্ত হলেও শ্রেণি বিষয়টি ‘লেনদেন’ সম্পর্কিত আর জাতির স্তরায়ন ‘প্রয়োজনের’ ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছে। সেকারণে জাতি বিষয়টি অনেকটা মানুষের প্রকৃতিগত প্রবণতার প্রকাশ বলে ধরা হয়।[২] তার সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে ঘনিষ্টতার জায়গাটি অনেকটা জাতিগত বিন্যাসের যে ক্রমোচ্চতা তার মাপকাকঠিতে বিচার্য। অনুরূপভাবে শ্রেণি বিভাজনের বিষয়টি উক্ত স্তরায়নের মত করে দেখার প্রবণতা রয়েছে। অন্যথায় শ্রেণির ইতিহাস ব্যাখ্যায় জাতি ইতিহাসে উপাদানগত দিকগুলো বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। আরো যদি বলা যায় এর কমন দিকগুলোর কথা তাহলে শ্রেণির ইতিহাস নির্মাণে বঙ্গের পূর্ববর্তী বাম নেতৃত্বদের বিনয়ী ও সমব্যথীময় জীবনধারণ পদ্ধতি অনেকটা নিম্নবর্ণীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিলে যায়। ফলত এই উক্ত দিকগুলো দেখে আপাত মনে হতে পারে ‘শ্রেণি’ ও ‘জাতি’ ধারণাটি এক ও অভিন্ন। তবে বিষয়টি এমনটা নয়। উভয়ের মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্রতা তা এড়িয়ে গিয়ে শ্রেণি চেতনার ব্যপ্তির দিকটি প্রচারে আনতে থাকে বঙ্গীয় সমাজ। যেহেতু আমাদের সন্দর্ভের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তরবঙ্গ, সুতরাং ‘জাতি’ ও ‘শ্রেণি’র ধারণাটি বৃহত্তর বঙ্গের নিরিখেই উত্থাপিত হয়েছে। বঙ্গীয় সমাজ ও রাজনীতিতে জাতির জায়গাটি সমগ্র ভারতের নিরিখে কিছুটা ভিন্ন। তেমনি উত্তরবঙ্গের জাতির ইতিহাস স্বতন্ত্র, বৃহত্তর বঙ্গের নিরিখে। প্রথমে আমরা বঙ্গের জায়গা থেকে বিষয়টি অনুসন্ধান করব যা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতি ধারণাটির সঙ্গে তার পার্থক্য প্রতীয়মান করতে সাহায্য করবে। উত্তরবঙ্গের জাতি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সন্দর্ভটি রচিত হলেও এর সঙ্গে শ্রেণির সংযুক্ত বা দ্বন্ধের প্রশ্নটি কীভাবে উত্থাপন করা

যায় তা সন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলো রচনা করতে সাহায্য করবে। জাতি তার স্বকীয়তা নির্মাণে কোন নির্দিষ্ট স্থানের বৈশিষ্ট্যকে যেমন সমান গুরুত্ব প্রদান করে সেরকমভাবে বঙ্গের বামপন্থীদের শ্রেণি চেতনার বিষয়টি প্রকাশ পাইনি। এখানেই উভয়ের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য লক্ষণীয়। সেকারণে জাতির একটি স্তর অন্যটির উপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং একটা পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্ব চরিত্র প্রকাশ করে। উক্ত দুই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সন্দর্ভটি প্রণয়নের মাপকাঠি হলেও প্রাথমিকভাবে জাতি বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হব। কেননা ভারত তথা বঙ্গে সমাজ বিন্যাসের বিষয়টি জাতিকে ঘিরে থাকায় জাতির অবস্থান বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ অন্বেষণ করা হয়েছে।

বৃহত্তর বঙ্গের কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গে রাজবংশীদের বোঝাপড়াকে তেভাগার আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) দিয়ে অতি সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ অবিভক্ত বঙ্গের রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুর ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এবং আন্দোলনের জন্মস্থান।[৩] আর সেই স্থানীয় ইতিহাস রচনায় রাজবংশীদের ভূমিকাকে এতাবৎ হওয়া গবেষণায় বিশেষ প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে যুক্ত হওয়ার সুযোগ যেমন হয়েছিল তেমনি সন্দর্ভের পরিসীমা হিসাবে উক্ত স্থান বিবেচিত হয়েছে। সম্প্রতি ‘উত্তরবঙ্গ’ নামে যে অঞ্চলটি সমধিক পরিচিত তার প্রেক্ষাপটে সন্দর্ভটি প্রণয়িত হয়েছে।

তেভাগা পর্বে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের কথা বিভিন্ন সাহিত্যে বা বঙ্গের বাম নেতাদের লেখনীতে কিংবা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে বলা হলেও সেই বিষয় নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন গবেষণাপত্র রচনা হতে দেখা যায়নি। এমনকি উপনিবেশিক পর্বে বাম-রাজনীতিতে রাজবংশীদের একটি অংশ যুক্ত থাকলেও তাদের অবস্থান নিয়ে

আলোচনা একপ্রকার হয়নি বললে চলে। এই শূন্যস্থান পূরণ করার একটা ছোট প্রয়াস হল এই সন্দর্ভটি। এতাবৎ হওয়া গবেষণায় 'জাতি' ও 'শ্রেণি'র উপর যা আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে তার একটি রূপরেখা নিম্নে তুলে ধরা হল।

পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা:

উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকেই ভারতের বিভিন্ন জেলার সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্রিটিশ আধিকারিকরা। সেই লেখনীতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ আধিকারিকদের এই ধরনের উদ্যোগের আবডালে ছিল প্রশাসন পরিচালনার তাগিদ ও সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন। সে কারণে প্রত্যেক জেলার জনবিন্যাস ভালোভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং জেলা শাসক ও অনান্য আধিকারিকদের সেই দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহ দেন। শুধু তাই নয়, জনবিন্যাসের সঙ্গে জনতত্ত্বের ধারণা দিতে থাকলে স্থানীয় সমাজে একধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকেই জাতির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলা চলে। বিশ শতকে তথাকথিত ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণীয় মানুষদের জাত্যগ্রসরণ (Caste Mobility) ধারার সুত্রপাত ঘটতে দেখা যায় উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। যে সকল ব্রিটিশ আধিকারিকের লেখনীতে রাজবংশী বিষয়টি জায়গা করে নিয়েছিল এমন কয়েকজন শাসক পন্ডিতবর্গের মধ্যে ড. বুকানন হ্যামিল্টনের (Buchanan Hamilton) নাম করতে হয়। তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি সজ্ঘবদ্ধ করে মন্টগোমারী মার্টিন পরবর্তীতে প্রকাশ করেন (১৮৩৮) '*The History, Antiquity, Topography and Statistic of Eastern india'* নাম দিয়ে।[৪] এর পরবর্তীতে ডাব্লু ডাব্লু হান্টার[৫](W. W. Hunter), হার্বাট রিজলী[৬] (H. H. Risley) কিংবা ও'মালি[৭] (L.S. O'Malley) নাম উল্লেখ করা যায়। তবে ব্রিটিশ শাসন বিস্তারের

সঙ্গে বুকানন-সৃষ্ট জ্ঞানচর্চার ধারা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ডাব্লু. ডাব্লু. হান্টার লিখেছেন: 'My materials are chiefly taken from Dr. Buchanon Hamilton's Ms Account 13 of Rangpur, Mr. B.H. Hodgson's Essay on the Koch, Bodo, Dhimal Tribes (Journal of the Assiatic Society of Bengal, 1849 Part-ii), and Colonel Daittan's, Descriptive and Ethnalogy of Bengal' (Calcutta 1872)'।[৮]

বিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যেসকল ভারতীয় জাতি বিষয়টি লেখনীর প্রতিপাদ্য করেছিল তারাও উপনিবেশিক ধারা অনুসরণ করে জাত ব্যবস্থার নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।[৯] এদের মধ্যে যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের *'Hindu Caste and Sects, An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system'* গ্রন্থটি ১৮৯৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[১০] নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের *'Origin and Growth of Caste in India'* প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে।[১১] সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ১৯৫১ সালে প্রকাশ করেন *'Kirata Jana Kriti'*।[১২] ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *'বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)'* প্রকাশ পেয়েছে ১৯৬৩ সালে।[১৩] নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের *'Origin and Growth of Caste in India, Vol-II, Castes in Bengal'* প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে।[14] উক্ত গ্রন্থে তিনি রাজবংশী জাতি সহ বঙ্গের কয়েকটি নিম্নবর্ণীয় জাতির সন্মানজনক পরিচিত তুলে ধরেছেন।[১৫] অন্যান্য গ্রন্থদ্বয় মূলত বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিচার করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার তাঁর গ্রন্থে রাজবংশীদের অবস্থান দেখাতে গিয়ে তিনি নিন্দাসূচক ভাবনার প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে জাত ব্যবস্থার মধ্যে আর্য ও অনার্য বির্তকের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন, একটু ভিন্নভাবে। তিনি বিষয়টি দেখেছেন 'আর্য ও অনার্য শব্দদুটি দুটি ধর্মের বিভিন্নতার সূচক যা দলাদলির সংজ্ঞামাত্র'।[১৬] উক্ত গ্রন্থগুলি অনেকটা বঙ্গে নিরিখে রচিত হয়। তা সত্ত্বেও এই নতুন লেখনীতে সেই অর্থে নিম্নবর্ণীয় মানুষের অবস্থান ফুটে উঠেনি।

১৯৯০র দশক থেকে উক্ত ধারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় ইতিহাসে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস রচনা গুরুত্ব পেয়েছে। সেই উদ্যোগে রাজবংশীদের উপর কয়েকটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মূলত একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে থেকে রাজবংশী জাতি আন্দোলন নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ হয়। তার মধ্যে স্বরাজ বসুর *'Dynamics of a caste movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947'.*[১৭] গ্রন্থটি রচিত হয় ২০০৩ সালে। বসু মূলত রাজবংশীদের পরিচিতি, জাতি চেতনা এবং ক্ষত্রিয়করণের রাজনীতির জায়গাটিকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। রাজবংশী জাতির জনক হিসাবে পঞ্চানন সরকারের (তিনি পঞ্চানন বর্মা নামে সমধিক পরিচিত) 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠার সময় কাল থেকে (১৯১০) দেশভাগ পর্বের সময়সীমার মধ্যে রাজবংশীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনা রেখেছেন। সেই জীবনচক্রে পঞ্চাননের 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রভাব এবং কিছুটা সমিতির ব্যর্থতার ইতিহাস তিনি লেখনীতে নিয়ে এসেছেন। একই সঙ্গে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় যা সমিতি গড়ে তোলার পশ্চাতে পঞ্চাননের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বোঝতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে জাতি আন্দোলন গড়ে তোলার আবডালে বর্মার পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে বলে অভিমত প্রকাশ

করেন। ২০০৪ সালে রূপ কুমার বর্মণের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ *‘জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্বঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবংশী–ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা’* প্রকাশিত হয়েছে।[১৮] আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য হল ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পটভূমি গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে প্রশ্নটি সামনে আসতে দেখা যায় তা হল রাজবংশীরা, কোচ জাতি নয়। ব্রিটিশ আদমশুমারির অভিপ্রায় ছিল কোচ ও রাজবংশী একই জাতি সম্ভূত। এই বির্তকটি ধরে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা কোচদের, রাজবংশী জনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তকরণের দিকে নিয়ে যায়। বর্মণ বাবুর এই অনুসিদ্ধান্ত অনেকটা ব্রিটিশ প্রতিবেদন নির্ভর। এর সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন রাজবংশী এলিট সম্প্রদায় জাতি রাজনীতির (Caste Politics) তুলনায় জাতীয় রাজনীতির (National) ক্ষমতার পরিসরকে অনেকটা বড় করে দেখেছেন। যার কারণে একটা সময় দেখা গেল জাতি আন্দোলন থেকে বেড়িয়ে অনেকে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। তার মধ্যে রাজবংশী এলিটদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বর্মণের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি *‘রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস’* এবং পঞ্চানন বর্মার জীবনী রচনা করে তাঁর পরিচিতি পরিমণ্ডলকে ইতিমধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সেকারণে এবং পঞ্চানন পরবর্তীতে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ছিলেন রাজবংশী জাতি আন্দোলনের প্রথম শ্রেণির নেতা। রাজবংশী নেতাদের জাতি রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে যূথিকা বর্মা তার গবেষণা (২০২১) *‘জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ’*, গ্রন্থে দেখেছেন জাতির সার্বিক স্বার্থ রক্ষার জায়গা থেকে।[১৯]

দেশভাগ পরবর্তীতে বিশেষত যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্টের সময় কালে আলাদা রাজ্যের দাবি তুলে রাজবংশীরা জাতি আন্দোলন গড়ে তোলেন। কামতাপুর রাজ্যের নামে উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্র রাজ্য করার দাবির মধ্যে রাজবংশীরা কতগুলো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল। উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে কীভাবে আলাদা রাজ্যের ধারণা রাজবংশীরা নিয়ে আসেন এবং তার বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা তুলেছেন ধীরেন্দ্রনাথ দাস।[২০] ওনার *'Regional Movement, Ethnicity and Politics'* নামক গ্রন্থটি ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। রাজ্য গঠনের জন্য যে সকল উপাদান অপরিহার্য যেমন অঞ্চলের ইতিহাস, স্থানের স্বতন্ত্রতা, ভাষার ও তার সাহিত্য, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক মনবৃত্তি এবং স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য স্থানীয়দের প্রতিরোধ যা রাজ্য গঠনে এবং তার বৈধতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের ভৌগলিক পরিবেশ যথোপযুক্ত হলেও শাসক শ্রেণির অসহযোগিতাকে তিনি আলোচনায় নিয়ে এসেছেন। রূপ কুমার বর্মণ তার অনবদ্য গবেষণা *'Contested Regionalism'*[২১] প্রকাশ করেন ২০০৭ সালে। উক্ত গ্রন্থে উত্তর-উপনিবেশিক সময়কালে রাজবংশীদের কীভাবে আঞ্চলিক রাজনীতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল তার যেমন ব্যাখ্যা রেখেছেন তেমনি রাজবংশীদের Caste base ethnicity যা উপনিবেশিক পর্বে একটি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হলেও পরবর্তীতে সুস্পষ্ট কোন পথের সন্ধান করতে পারে নি বলে মনে করেন। আন্দোলনের এই অস্পষ্টতাই আন্দোলনকারীদের আঞ্চলিকতার দিকে নিয়ে গেছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। জাতি এবং আঞ্চলিকতার যৌথতার নিরিখে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবির প্রাসঙ্গিকতা প্রকাশ পেয়েছে রূপ কুমার বর্মণের গ্রন্থে। ২০২১ সালে আর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন নির্মল চন্দ্র রায়।[২২] যা মূলত রাজবংশীদের জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ রাজবংশী জাতি আন্দোলন, রাজবংশীদের আলাদা রাজ্যের দাবি এবং তাদের রীতিনীতি কিংবা কীভাবে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত সমাজের অঙ্গে পরিণত হয়েছে তার আলোচনার হলেও শ্রেণির নিরিখে রাজবংশীদের নিয়ে কোন গবেষণা রচনা হয়নি। উত্তরবঙ্গের শ্রমের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজবংশীদের অবস্থান নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ নেই বললে চলে। তার মধ্যে এক দুজন গবেষকের রচনাতে কিছুটা বাম আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে। তার প্রসঙ্গ অনেকটা তেভাগার উপর। তেভাগা আলোচনার বিষয় হলেও তাতে রাজবংশীদের কথা আলোচনাই উঠে আসেনি। অথচ উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ এবং তার অবদানের কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু লেখনীতে তাদের কথা একপ্রকার নেই বললে চলে। শ্রেণির নিরিখে যে সকল গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে রঞ্জিত দাসগুপ্তের[২৩] নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি বাম দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখেছেন। জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ির উৎপত্তির (১৮৬৯) সময়কাল থেকে দেশভাগ পর্যন্ত তার গবেষণার পরিধি। মুলত বোদা, পাটগ্রাম ও পচাগড় এই তিনটি অঞ্চল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। এই গবেষণা গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল জলপাইগুড়ির সামাজিক কাঠামোর স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরা। এই মৌলিক ধারা সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাবধারাকে যুক্ত করে পরিবর্তনের জায়গাটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই নতুন ভাবধারা অনেকটা শাসকের হাত ধরে বিশেষত চাবাগিচা এবং রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ তৈরি হয়েছিল। এতেই স্থানীয় জীবনধারাতে পরিবর্তনের দিকগুলো প্রকাশ পেয়েছে। অপরদিকে পুঁজির বিকাশ এবং শ্রমজীবি মানুষের আবির্ভাব জলপাইগুড়িতে বাম-রাজনীতির পরিসর সৃষ্ট হতে সাহায্য করে। এই সূত্র ধরে তেভাগা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেছেন। যা জাতি রাজনীতির

উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল তার আভাস ফুটিয়ে তুলেছেন। সুভজ্যোতি রায়[২৪] ব্রিটিশ শাসন কাঠামোয় কীভাবে জলপাইগুড়ির সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে বাম আন্দোলনের সাংগঠনিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কার্তিক চন্দ্র সূত্রধরের[২৫] গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জমি ও জমি সম্পর্কে বিবর্তন এবং এর মধ্য দিয়ে যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে তা তিনি জলপাইগুড়ির জেলার নিরিখে তুলে ধরেছেন। *'Right-Left Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assemly Election (from 1920 to 2016)* রূপ কুমার বর্মণের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি[২৬] এবং ওনার অপর একটি গ্রন্থ *'জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রর্তক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান'* এ তিনি পশ্চিমবঙ্গের জাতি রাজনীতি প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে বাম জমানায় নির্বাচন রাজনীতিতে তাদের অবস্থান এবং ভদ্রবাবু সমাজ নিম্নবর্ণীয় মানুষের প্রতি কিরূপ মনভাব ব্যক্ত করেছেন তার আলোচনা রেখেছেন।[২৭] তিনি খুব সম্প্রতি (২০২২) রচনা করেন *'পরিবর্ত অনুসন্ধান, রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা'* নামক গ্রন্থটি।[২৮] উক্ত গ্রন্থে অভিজ্ঞতার নিরিখে বঙ্গের বামপন্থীদের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রসঙ্গ, আঞ্চলিকতা এবং জাতি আন্দোলন কীভাবে ১৯৭০র দশক থেকে গোটা বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের তৎপর হয়েছে এবং মুলনিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিগকে পরিণত হয়েছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত আকর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে আলোচ্য সময়কালে কীভাবে জাতির ইতিহাস রচনার জায়গাটি উপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের ভাবধারা সামনে রেখে সাহিত্য রচনা হয়েছে তার দিকটিকে তিনি তুলে ধরেছেন। ফলত যেভাবে সমাজ ব্যাখ্যার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে

তা একটা পরিসর তৈরি করতে পারলেও বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি কিন্তু ভিন্নতাকেই প্রকট করে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

উপরিউক্ত গবেষণাধর্মী রচনাগুলি ছাড়াও কিছু সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যদের আলোচনা রয়েছে যা আমাদের গবেষণার বিষয়কে ভাবতে সহায়তা করেছে। যেমন জাতীয় আন্দোলন বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশীদের ভূমিকা ও অবদান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন নির্মল কুমার চৌধুরি।[২৯] খুব সাম্প্রতিককালে (২০২২) অরিন্দম পাকরাশী সম্পাদনা করেন *'ডুয়ার্স গান্ধী: নলিনী মোহন পাকরাশী ও স্বাধীনতা সংগ্রাম'*।[৩০] পশ্চিমবঙ্গের জাতপাত ও জাতিহিংসার ইতিহাসের সঙ্গে বাম জমানার থেকে বর্তমান সময়কালের নির্বাচন রাজনীতিতে নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন রূপ কুমার বর্মণ। ২০২২ সালে প্রকাশিত ওনার গ্রন্থটি হল 'সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ'।[৩১] ২০০৭ সালে সুখবিলাশ বর্মার[৩২] সম্পাদিত কামতাপুরী আন্দোলনের উপর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা রাজবংশী জাতি আন্দোলনের বিষয়ে অবগত করতে সাহায্য করে। তেমনিভাবে রূপ কুমার বর্মণের অপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ হল *'Partition of India and its impact on Scheduled Caste in Bengal'*.[৩৩] বাংলার বিভিন্ন সমাজের নিম্নবর্ণীয় মানুষের অবস্থানের সঙ্গে রাজবংশীরা কীভাবে দেশভাগের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ রেখেছেন আলোচ্য প্রকল্পে। অভিজিৎ দাসগুপ্তের[৩৪] গবেষণা মূলত জমিকে আলোচনার প্রধান বিষয় করে বাম-রাজনীতি ও পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার নিরিখে জলপাইগুড়ির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। এছাড়াও কিছু বামপন্থী সমাজকর্মীর লেখনী আমাদের গবেষণার প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে সাহায্য করেছে।[৩৫] উপরিউক্ত রচনাসমূহ রাজবংশীদের

অবস্থান নিয়ে আলোচনা রাখলেও বাম-রাজনীতিতে রাজবংশীদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে একপ্রকার নীরব থেকে গেছে। সেই শূন্যস্থানের পূরক বলা যেতে পারে আমাদের আলোচ্য সন্দর্ভটি। সেই সূত্রেই আমরা আলোচ্য প্রকল্পটির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রথম জিজ্ঞাসা হিসাবে যে প্রশ্নগুলো রেখেছি পরবর্তী অংশে সেগুলো তুলে ধরা হল -

গবেষণার মূল প্রশ্নসমূহ -

১. বিশ শতকের প্রথমার্ধে কীভাবে রাজবংশী জাতি চেতনার বিকাশ ঘটেছিল ?

২. রাজবংশী জাতি প্রতিরোধ কতটা শ্রেণি প্রশ্নকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ? জাতি প্রশ্নের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সংযুক্তি কতটা বস্তুবাদী ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল ?

৩. বামপন্থী রাজনীতির অভ্যন্তরে রাজবংশীদের অবস্থান এবং প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল ?

৪. সমতা-ভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান কীভাবে নতুন করে জাতি প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছিল ?

গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণ হেতু প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেই উপাদানের জায়গাটি প্রধানত কোন অভিজ্ঞতা, ঘটনা বা অভ্যাসের জায়গা থেকে উপলব্দ হয়। তথাকথিত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে সরকারি মহাফেজখানার উপর নির্ভরশীলতা তথ্য অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে আমাদেরকে সমূহ গুরুত্ব আরোপ করতে আগ্রহশীল করে তুলেছে। যা ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা,

লিফলেট, পত্রপত্রিকা, মৌখিক ইতিহাস (Oral Narative) এবং ব্যক্তিগত ডাইরি ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অনেকটা মহাফেজখানার সীমাবদ্ধতার শূন্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ আমাদের গবেষণা প্রকল্পটি সরকারি পরিভাষা পূনঃমূল্যায়নের পাশাপাশি স্থানীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলো যেমন তাদের রচিত গল্প, গান, কাব্য, কথা, ছিল্কা, নাটক, কবিতা এবং প্রবন্ধের ব্যাখ্যা নতুন করে Existing Literature কে বদল না করলেও নতুন করে ভাবাতে সাহায্য করবে। এতাবৎ প্রকাশিত হওয়া গ্রন্থের (Secondary Materials) বিচার্যতাকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের বাম-আন্দোলনের জোয়ারে রাজবংশীদের অবস্থানকে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছে। আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা নিলেও, রাজবংশীরা বামপন্থী রাজনীতিতে কীভাবে মূল্যায়িত হয়েছে তার যথোপযুক্ত আলোচনা রেখেছে। সেকারণে উত্তরবঙ্গের বাম আন্দোলনের প্রসরতা দিকে না অগ্রসর হয়ে বরং উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাদের যে পরিভাষা প্রকাশ পেয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে সন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। যে বোঝাপড়া আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে জাতি রাজনীতির প্রসঙ্গটিকে। সেকারণে সন্দর্ভটি জাতি থেকে শ্রেণি এবং শ্রেণি জায়গা থেকে জাতির মৌলিকতার প্রশ্নটির অনুসন্ধান করেছে।

অধ্যায় বিভাজন:

সন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়:** *'ভূমিকা'*তে সমগ্র প্রকল্পটি রূপায়নের পদ্ধতি এবং গবেষণার শূন্যতা (Research Gap) অনুসন্ধান করেছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়:** *'উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও বঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতির সূচনাপর্ব'* আলোচনা করেছে জাতি ও শ্রেণির ধারণা। সেই নিরিখে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে কীভাবে বামপন্থী চিন্তাভাবনা প্রকাশ করা যায় তার প্রেক্ষিত রচনার পাশাপাশি বঙ্গের বাম আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: *'রাজবংশী সমাজজীবন ও জাতি প্রতিরোধ'* এ রাজবংশী জাতি প্রশ্নটি উত্থাপন যার সব থেকে বড় অবদান রয়েছে তিনি পঞ্চানন বর্মা। তিনি রাজবংশী জাতির জনক হিসাবে বেশ পরিচিত। কারণ তিনি বঙ্গের জাতীয় ঘরনার রাজনীতির থেকে রাজবংশীদের প্রথম পৃথক করে জাতি প্রশ্নটিকে নতুন করে উপস্থাপন করেন। তিনি কীভাবে পৃথকীকরণের পথে হাটলেন তার ব্যাখ্যা করেছে আলোচ্য অধ্যায়টি। উক্ত পৃথকীকরণের রাজনীতি কীভাবে নতুন রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল। এই নতুন সম্প্রদায়ের ধারণা নির্মাণে পঞ্চাননের সাংগঠনিক কার্যকলাপ বোঝাপড়ায় আনতে আদি সমাজের বিভিন্ন লক্ষণকে সামনে রেখে তার ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত সমাজের প্রতিরোধ এবং বামেদের তেভাগার সংগ্রাম এই দুয়ের পারস্পরিকতা বুঝতে সাহায্য করেছে জাতির অবস্থাকে। **চতুর্থ অধ্যায়:** *'রাজবংশীদের বাম-রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া: দেশভাগ পর্যন্ত'*- আলোচনা রেখেছেন জাতি ও শ্রেণির সংযুক্তির বিষয়টি। তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব এবং পরবর্তীতে বাম সরকার প্রতিষ্ঠার (১৯৭৭) মধ্য দিয়ে যে সাম্যবাদ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে শ্রেণি প্রশ্নটি শুধু অর্থনৈতিক বিষয় না হয়ে সাংস্কৃতিক শক্তির (Cultural Power) দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। উন্নয়নকে রাজনৈতিক আলোচনার মাপকাঠিতে রেখে সাংস্কৃতিক প্রভাবকে 'সমগ্রতার' (Totality) জায়গায় নিয়ে গিয়ে সাম্যবাদের ভাবনাকে তুলে ধরে। যা **পঞ্চম অধ্যায়:** *'পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের শ্রেণি রাজনীতিতে রাজবংশীদের অবস্থান: উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে'*- এ তুলে ধরা হয়েছে। ফলত সাম্যবাদের খোলসে জাতি প্রশ্নটি তার আদিসত্তার জায়গাটিকে ধরে কীভাবে নিজের অবস্থান করে নিয়েছিল তার আলোচনা রয়েছে। **ষষ্ঠ অধ্যায়:** *'উপসংহার'* তে সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটির স্বরূপ দেখানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. প্রদীপ বসু: 'জাতি শ্রেণি ও সত্তরের ভারত', অনিল আচার্য (সম্পা): সত্তর দশক, সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, (*কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০২০*), পৃ. ১৬০।
২. Octavio Paz, *In light of India*, (London, The Harvill Press, 1955).
৩. Sugata Bose: *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics*: *1919-1947*, (Landon, Cambridge University Press, 1986), p. 254.
৪ .Montgomary Martin: *The History, Antiquity, Topography and Statistic of Eastern India*, (Landon, W. H. Allen and Co. 1838), পুর্নমুদ্রণ, (Delhi, Cosmo Publications, 1976).
৫. W.W.Hunter: *A Statistical Account of Bengal*, Vol. X, (London, trubner & Co., 1875-77).
৬. H.H. Risley: *The Tribe and Castes in Bengal*, Vol- 2, (Calcutta, Bengal Secretarian Press, 1891).
৭. L.S.O'Malley: Indian Caste Custom, পুর্নমুদ্রণ, (Cambridge University Press, 2013).
৮. W.W. Hunter: *A Statistical Account of Bengal*, Vol. X, *Op.Cit.*, P. 346.
৯. রূপ কুমার বর্মণ: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রর্তক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান*, (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯), পৃ. ২২-৪২।
১০. Jogendra Nath Bhattacharya: *Hindu Caste and Sects: An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system*, (Calcutta, Thacker, Spink and Co. 1896).
১১. Nripendra Kumar Dutta: *Origin and Growth of Caste in India*, Vol. I, (Calcutta, The book Company. Lm, 1931).
১২. Sunity kumar Chaterji: *Kirata Jana Kriti*, (Calcutta, Asiatic Society, 1951).
১৩. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: *বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)*, (কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০২০)।
১৪. Nripendra Kumar Dutta: *Origin and Growth of Caste in India*, vol. II, Castes in Bengal, (Calcutta, Firma K.L.Mukhopadhyay, 1969). .
১৫. রূপ কুমার বর্মণ: *পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি এবং ইতিহাস চর্চা*, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২), পৃ. ১০০।
১৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: *বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
১৭. Swaraj Basu: *Dynamics of a caste movement, the Rajbansis of North Bengal: 1910–1947*, (Delhi, Manohar, 2003).
১৮. রূপ কুমার বর্মণ: 'জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্বঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবংশী – ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা', অনুরুদ্ধ রায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান ১৮, *(কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪)*।
১৯. যূথিকা বর্মা: *জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ*, (কলকাতা, সোপান, ২০২১)।
২০. Dhirendra Nath Das: *Regional Movement, Ethnicity and Politics,* (Delhi, Abhijeet Publication, 2005).
২১. Rup Kumar Barman: *Contested Regionalism: A new look on the History, Culture Change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam*, (Delhi, Abhijeet Publication, 2007).
২২. Nirmal Chandra Roy: *The sage of Uttarkhanda Dal: In search of Kamtapur Identity*, (Kolkata, Reader, 2021).
২৩. Ranjit Das Gupta: *Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947*, (New York, Oxford University Press, 1992).

২৪. Subhajyoti Ray: *Jalpaiguri under Colonial Rule: 1765 to 1948*, Doctoral thesis, School of Oriental and African Studies, (London University of London, 1997).
২৫. Kartik Chandra Sutradhar: *Land and livehood: A Study on the Agro-Political Movements of a Bengal District, Jalpaiguri (1869-2004)*, (Siliguri, N.L. Publishers, 2013).
২৬.Rup Kumar Barman: 'Right-Left-Right'and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Election (from 1920 to 2016)', *Contemporary Voice of Dalit, Vol-10, Issue-2,* 216-231, (Sage Publication, 2018).
২৭. রূপ কুমার বর্মণ: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রর্তক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯)।
২৮. রূপ কুমার বর্মণ: *পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুত ও ইতিহাসচর্চা,* (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২)।
২৯. নির্মল কুমার চৌধুরি: *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়,* (জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, ১৯৮৫)।
৩০. অরিন্দম পাকরাশী (সম্পা): *ডুয়ার্স গান্ধী: নলিনী মোহন পাকরাশী ও স্বাধীনতা সংগ্রাম,* (Kolkata, Sarat Impressions Private limited, 2022).
৩১. রূপ কুমার বর্মণ: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২)।
৩২. Sukhbilas Barma: *Socio-Political Movements in North Bengal (A Sub-Himalayan Tract*), Vol 1 & 2, (Delhi, Global Vision Publishing House, 2007).
৩৩. Rup Kumar Barman: *Partition of India and its impact on Scheduled Caste in Bengal*, (New Delhi, Abhijit publication, 2012).
৩৪. Abhijit DasGupta: *Land and Politics in West Bengal: A Sociological Study of a Multi-Caste village*, Doctoral thesis, (England, University of Sussex, July, 1980).
৩৫. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার: *পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা,* (কলকাতা, মনিষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৮৩); জীবন দে: *আমার জীবনের অক্টোবর,* (তুফানগঞ্জ, সীমান্ত প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৭৮); কমল গুহ: *আমার জীবন আমার রাজনীতি,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০২); সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫); সমীরণ দত্তগুপ্ত: *তিস্তাতটরেখা,* (কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও বঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতির সূচনাপর্ব

উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে রাজবংশীদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ও তার সৃষ্ট সংস্কৃতি ধরেই বিকাশ ঘটেছে। উত্তরবঙ্গ কোন একক জাতি বা বর্ণের মানুষ দ্বারা সৃষ্ট একটি জনপদ নয়। ফলত বিভিন্ন ধর্মের উপস্থিতির মধ্যে জাতির নিজস্বতার জায়গাটি প্রকট। সেই নিরিখে রাজবংশী প্রশ্নটির স্বকীয়তা বর্তমান। এই প্রেক্ষিত ধরেই জাতিচর্চার জায়গাটি উনিশ শতক থেকে ব্রিটিশ আধিকারিকদের বিভিন্ন লেখনীতে ওঠে এসেছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগ নিছক ভারতের জনবিন্যাসকে অনুসন্ধান করা নয় বরং এর আবডালে লুকিয়ে ছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের ভাবনা। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় জনপরিসরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বিশ শতকে তা আন্দোলনে রূপ পেয়েছে। এই কার্যক্রম জাতিচেতনা বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে সেই আন্দোলনকে ধরে ব্রিটিশ শাসকেরা সাম্রাজ্যস্থাপনের নতুন উপাদান খুঁজে নেয়।[১] অর্থাৎ আধুনিক ভারতে জাতপাতের রাজনীতি নতুন করে শাসকের শাসন পরিচালনায় বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ফলত জাতের প্রশ্নটি রাষ্ট্র নীতির নির্ধারক হয়ে ওঠেছে। এই জাতি সৃষ্ট পরিসর এবং তার ভৌগলিক পরিচিতিতে কীভাবে শ্রেণির প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় তার ঘটনাক্রম বোঝার নিরিখে আলোচ্য অধ্যায়টি রূপায়িত হয়েছে।

১. জাতি ও শ্রেণি প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা

জাতপাতের সঙ্গে রাষ্ট্র চিন্তার সম্পর্ক তৈরি করতে ব্রিটিশ শাসকেরা সবসময় সচেষ্ঠ ছিলেন। অর্থাৎ ভারতের সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র নীতি নির্ধারনে জাতের প্রশ্নটি একটি চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। সেইদিক থেকে দেখলে শ্রেণির প্রশ্নটি ইউরোপীয়

সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। তাই বঙ্গের বামপন্থার জায়গাটি ইউরোপ-কেন্দ্রিক ভাবনা থেকে আমরা প্রাপ্ত করি। সেই ভাবনাকে বঙ্গের নিরিখে প্রয়োগ করার উৎসাহ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ব্যপ্ত হয়েছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বের শ্রমজীবি মানুষের কাছে একটা অনুপ্রেরণার স্তম্ভবিশেষ। যার প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও বৃহৎ বঙ্গ তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তবে বাংলায় তার প্রভাব ছিল বেশ শ্লথ। ১৯২০ সালের দিক থেকে 'শ্রমিক ও কৃষক' প্রশ্নটি ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হলেও শ্রেণিচেতনার বিষয়টি একপ্রকার ছিল না বলেই চলে। কংগ্রেসি রাজনীতির পরিমণ্ডলে তার বিকাশ ঘটেছিল। চল্লিশের দশকে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বিস্তার শুরু হলেও সত্তরের দশকের শেষদিকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে অনেকটা উন্নয়নের প্রশ্নকে সামনে রেখে। এই সমতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শ্রেণি রাজনীতি প্রকাশ হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাকে বদল করার সংগ্রাম জাতি আন্দোলনকে উদ্ভূত করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ সমাজ চিন্তার গতানুগতিকতার পরিবর্তন উভয় ধারণায় উঠে এসেছে।

সমাজ সংস্করণের প্রশ্নে জাতি আন্দোলন নবজাগরণের সূচনা করে বলে অনেকে মনে করেন।[২] এই সংগ্রাম সংস্করণের সূচক হলেও নিম্নস্তরের মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ ন্যায্যতা স্থাপনের প্রশ্নটিকে নিয়ে এসেছিল। এক্ষেত্রে জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৯৯০), সবিত্রীভাই ফুলে (১৮৩১-১৮৯৭), পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩) কিংবা বি. আর. আম্বেদকরের (১৮৯১-১৯৫৬) নাম উল্লেখ করা যায়। এজন্য ভারতের সংবিধান এবং আম্বেদকর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ জাতিগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সচেষ্ঠ হন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল দশ বছরের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনা সম্ভব হবে যদি অগ্রাধিকার দেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে

রূপায়িত হয়নি।[৩] ফলত জাতি রাজনীতিতে সমতার আন্দোলন ভারতে শুরু হলেও তা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে শোষণ বা বঞ্চনার থেকে মুক্ত করতে সমতার নিরিখে সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবি জাতি আন্দোলনের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠেছিল। সুতরাং উভয় ধারণার বিকাশ এবং সমৃদ্ধি একই স্থানের না হলেও উত্তরবঙ্গে কীভাবে শ্রেণির ক্ষেত্র রচিত হয় এবং রাজবংশী সমাজ সেই চিন্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তার প্রেক্ষিত ধরে আলোচনা রাখা হয়েছে।

ইউরোপ-কেন্দ্রিক ভাবনাকে ধরে শ্রেণির উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করলেও ভারত কিংবা বঙ্গীয় সমাজে উক্ত ভাবনা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অনেকটাই ইউরোপীয় ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন বঙ্গের বামপন্থীরা। এই চিন্তাভাবনার সমালোচনা করেছেন সুদীপ্ত কবিরাজ। তার খুব সম্প্রতি প্রকাশিত (২০২২) গ্রন্থটি *‘মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান’* ভারতীয় বামপন্থীদের এই একমাত্রিক ভাবনার জায়গাটিকে মার্কসীয় চিন্তার পরিপন্থী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৪] আমরা যদি বামপন্থী চিন্তার ভিতর জাতির ধারণাটি কীভাবে সম্পৃক্ত তার অনুসন্ধান করতে যাই তাহলে এই একমাত্রিক ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করে থাকি। যেমন বঙ্গের সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারায় বিকশিত হলেও বামপন্থী লেখকেরা ‘সামন্ততন্ত্র’ বা ‘আধা-সামন্ততন্ত্র’ নামে ব্যাখ্যা দিয়ে ইউরোপকে বঙ্গের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কারণ শোষণ ও বঞ্চনার একটা সমগোত্রীয় চরিত্র উপস্থাপন করার প্রবণতা লক্ষণীয়। অন্যথায় শ্রেণির ধারণা ব্যক্ত করতে অনেকসময় জাতিগত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] যেমন ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্রের মধ্যকার বিভাজন চর্তুবর্ণের ধারণাতে ব্যপ্ত এবং তার মধ্যে থাকে জাতি প্রতিরোধ ও স্বাধীন হওয়ার ধারণা। যা এই ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই বিভাজনকে শ্রেণির ধারণায় ব্যক্ত করা হয় শোষণ ও বঞ্চনার প্রশ্নে। উক্ত

স্তরায়নকে স্বাধীন থেকে পরাধীন এবং প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্কে সূচিত করে শ্রেণির ভাবনা প্রকট করা হয়েছে। সেখানে একটা লেনদেনের প্রবণতাকে দেখানো হয়েছে। এই উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি অনেকটা রাজনৈতিক এবং বির্তকিত ভাবনার জায়গা থেকে উঠে আসে। সেই বির্তকে না গিয়েও এর একটা সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

১. ১. শ্রেণির ধারণা

ভবিষ্যৎ সামাজিক সমতা প্রশ্নে, সচেতন শ্রেণি সমন্বিত প্রতিরোধ বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার পতনকে তরান্বিত করবে এই বিশ্বাস শ্রেণি চেতনার পরিসরকে ক্রমান্বয়িত করে। সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের একত্রিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করেন লেনিন। সেই সমন্বিত প্রয়াসে লুকিয়ে থাকে সমাজের একচেটিয়া সম্পদ দখলের বিরুদ্ধে উঁকে দাঁড়ানোর সংগ্রাম। যাকে আমরা শ্রেণিসংগ্রাম বলে বিবেচিত করতে পারি।[৬] অন্যথায়, কার্ল মার্কস 'শ্রেণি' কথাটিকে ব্যবহার করেছেন গতিশীলতার অর্থে। এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তরণ হল এর প্রতিপাদ্যতা। যদিও সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই পরিবর্তনের চিত্র লক্ষ করা যায় না। মার্কসের লেখায় শ্রেণি কথাটার এটাই সহজবোধ্য অর্থ বলে বিবেচিত হয়।[৭] বঙ্গের বামপন্থী রাজনীতি এর মধ্য দিয়ে এমন একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেয় তা একটা নতুন শৈল্পিক জগতের আবির্ভাব ঘটায়। তা নিয়ে অনুরাধা রায়[৮] এবং অমিত গুপ্তের[৯] গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে একটা কর্তৃত্বকারীর (Dominancy) ভূমিকা পালন করে। এই বামপন্থী সংস্কৃতির অভ্যন্তরে রাজবংশী সংস্কৃতির স্বীকৃতি কীভাবে একাত্ব হয়ে যায় তার জায়গাটি বুঝতে সাহায্য করবে উভয়ের পাস্পরিকতাকে।

১. ২. জাতি ও বর্ণের ধারণা

বর্ণ ও জাতি শব্দ দুটিকে অনেকসময় একই অর্থে প্রকাশ করা হয়। ইংরাজি শব্দ 'Caste' অর্থে তার ব্যবহার বহুল পরিমানে বঙ্গে প্রচলিত। যদিও 'Caste' শব্দটি পুর্তুগিজ ও স্প্যানিশ 'Casta' সঞ্জাত। ল্যাটিন শব্দ 'Castus' থেকে যার উৎপত্তি। যার অর্থ করা হয় 'বিশুদ্ধতা'- যার সঙ্গে অন্যের মিশ্রণ ঘটেনি।[১০] বাংলায় caste এর অর্থ জাতি ও বর্ণ বোঝালেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। বর্ণ প্রধানত বিশুদ্ধতার ও জন্মগত অধিকারের এক প্রতিক এবং জাতি হল একটা পেশাগত পরিচিতি যার অবস্থার অবনমন বা উন্নয়নকে ধরে প্রসারিত। সেকারণে জাতির ধারণা গতিশীলতাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। অন্যথায় জাতি কথাটি তার ব্যপ্তির বহিঃপ্রকাশ। যেমন বর্ণ তিন হলেও জাতির সংখ্যা অনির্দিষ্ট। সেই নিরিখে বর্ণের কাঠামে জাতির পরিধি অনেকটাই বিস্তৃত এবং বিশুদ্ধতার ও সামাজিক মর্যদার নিরিখে কোন জাতির অবস্থান কোথায় হবে সেই অর্থে বর্ণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গান্ধিজীও 'জাতি' শব্দটিকে বর্ণের অপভ্রংশ বলে মনে করে।[১১] জাতি বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ঘিরে সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট জাতি কতগুলো উপ- জাতে নিজেকে বিভক্ত করে। উপ-জাতির এক একটি জাত বিশেষ পেশায় নিজের দক্ষতা দেখিয়ে তার গুণ প্রকাশ করে। এই রকম উপ-জাতের সমষ্টিকে ইংরাজিতে 'Caste-Cluster' বলা হয়। এর মিলিত রূপকে 'জাতি' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইরাবতী কার্ভের মতে '...the castes are a product of continous fragmentation'.[১২] সুতরাং জাতি সামাজিক ক্রমোচ্চতায় কোন বর্ণের অর্ন্তভুক্ত হবে তা বোঝা যায়। অন্যথায় একটি সম্পুর্ণ জাতির কাছাকাছি অন্য জাতি সংমুখিন হলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়। এখানেও উভয়ের পার্থক্যকে বিবেচিত করা হয়েছে কর্মের দক্ষতায়।[১৩] এই ব্যবস্থা

কোন একসময় সমাজকে গঠনমূলক বা structural করে তোলে। সমাজের এই গঠনমূলক অধ্যায় নির্ধারিত হয়েছে 'শুদ্ধ' ও 'অশুদ্ধতার' ধারণায়। কীভাবে পবিত্র ও অপবিত্রতার ইতিহাস জাতিচর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে তার তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন লুই ডুমন্ট তাঁর *'Homo-Hierarchicus'* গ্রন্থে।[১৪] জাতি ও বর্ণের ইতিহাস স্বয়ং ক্রম-বিভাজিত এবং তার আকার অনেকটা বৃত্তাকার বা cycleর মত। প্রত্যেক জাতির একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে, তার মধ্যে জাতির রীতিনীতি ব্যপ্ত এবং একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে আসার সহজ মাধ্যম হল দক্ষতার প্রদর্শন কিন্তু সামাজিক সংস্কার বাদ দিয়ে নয়। এই ব্যবস্থা জাতিকে গতিশীল করে তুলেছে। এই ধরনের আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় হিতেশরঞ্জন স্যান্যালের লেখায়। জাতির ইতিহাসচর্চা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। ফলত জাতি স্বয়ং ক্রম-বিভাজিত। আপাতদৃষ্টিতে এই বিভাজন প্রকট হলেও বাইরে থেকে সে নিজেকে ঐক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে। সেই বিভাজনের পর্যায়গুলি হল যথাক্রমে শ্রম বিভাজন (Division of Labour), ক্রমোচ্চতা (Hierarchy) এবং ধর্মীয় দিক (Riligious Aspect)। এই বিভাজিত শ্রমের দিকটি প্রগতিশীল বামপন্থীদের শ্রেণির ইতিহাস ব্যাখ্যা করার জন্য সহজ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু জাতির শ্রম বিভাজনের ধারণাটাই একেবারে ভিন্ন। যেমন মৎস্যজীবি এবং শিকারী মানুষের মধ্যে কে শ্রেয় ?(Superior) যদি বলা হয় তাহলে মৎস্যবৃত্তিধারীর অবস্থান শ্রেষ্ঠ বলা যায়। কারণ তাঁর কারবার যেহেতু জলকে নিয়ে তাই তাঁকে জল বহন করতে হয় না। অন্যদিকে হান্টারকে জল বহন করতে হয়। সেই জল সকলের প্রয়োজন সে মাঝি হোক আর বন মানুষেই হোক। সেই অর্থে এই জল বহন 'পেশা'য় পরিণত হলে তার সামাজিক মর্যাদা নিম্নে প্রথিত হয়। ফলত এই বিভাজন ছিল প্রয়োজন ভিত্তিক, বিনিময় মূল্যে

নয়। সেকারণে বামপন্থীদের অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্মিত শ্রেণির ধারণার সঙ্গে জাতির শ্রমবিভাজনের কোন সম্বন্ধ নেই।

২. কীভাবে রাজবংশী পরিমণ্ডলে বামপন্থী চিন্তাকে যুক্ত করা যায় ?

কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী ইতিহাস নির্মাণ যার পদ্ধতিগত ইতিহাস মূলত সাধারণ মানুষ ও তার অভিজ্ঞতাকে শ্রেণির ধারণার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষকে ইতিহাসে সংযুক্তকরণ একপ্রকার ইতিহাসকে অনেকটা তলিয়ে দেখতে সাহায্য করে। ফলত বস্তুবাদী ইতিহাসকে প্রকল্পের বিষয় করে কোন স্থানের নিরিখে উপস্থাপনা করা হয় তাহলে স্থানের বিশিষ্টতা ও তার অতীত ঘটনার উপস্থিতিকে নতুন করে বুঝতে সাহায্য করে। অর্থাৎ ঘটনার আবির্ভাব ও উপস্থাপন আবার কীভাবে রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠে তার গুরুত্ব প্রকাশ করতে সাহায্য করে। আমাদের আলোচ্য প্রকল্পটি শ্রেণিকে বিষয় করে স্থান ও তার অতীত ইতিহাস পুনঃমূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছে। ঘটনার মধ্য দিয়ে যেমন স্থানের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করা সহজ হয় তেমনি উক্ত স্থানের সাধারণের না বলা কথা, নতুন কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে সামনে আনতে সাহায্য করে। আখ্যানের (Narative) এই রূপান্তর একদিকে ঘটনার গুরুত্বকে অন্যদিকে এর শূন্যস্থান পূরনের পূরক হিসাবে বামেদের উপস্থিতি এই দুইয়ের পারস্পরিকতা স্থান ও ঘটনাকে নতুন মাত্রা দেয়।

বঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্ব হিসাবে তেভাগা আন্দোলনের কথা বলতে হয়। আর যদি আন্দোলনের স্থান হিসাবে জলপাইগুড়ি, রংপুর এবং দিনাজপুরের তথা উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে তাহলে রাজবংশী, স্থানীয় মুসলিম ও কিছু সাঁওতাল, ওঁরাওদের দেখতে পাওয়া যায় যারা আন্দোলনের এবং স্থানের মৌলিকতা নির্মাণ করে। এই দুয়ের সম্পর্ককে ‘শ্রেণির ধারণা’য় এমনভাবে সামনে

নিয়ে আসে যেন মুসলিম এবং সাঁওতাল ওঁরাওদের স্বতন্ত্রতাকে অস্পষ্ট করে স্থানের গুরুত্বকে সার্বজনীন (Universal) করে তোলে। স্থানের বৈচিত্র্যতার পরিবর্তে সামগ্রিক অর্থে 'কৃষক সম্প্রদায়' দিয়ে সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। 'কমরেড' সূচক সম্বোধন এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যেন প্রচলিত সমাজের মধ্যে একটা আলাদা গোলার্ধ তৈরি হয় যেখানে 'আমরা সকলে একসঙ্গে রয়েছি'[১৫] এমন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে রাজবংশীর অবস্থান কীভাবে সংযুক্ত হয়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া অন্বেষণ করবে আলোচ্য গবেষণা সন্ধর্ভটি।

জাতিসম্ভূত সমাজে শ্রেণি সংযুক্তের প্রসঙ্গটি একপ্রকার ১৯৪৬ সাল থেকে বঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গে প্রকট হয়। সেকারণে সন্দর্ভের আলোচ্য সময়সীমা তেভাগার পর্ব থেকে বিবেচিত হয়েছে। এই সংযুক্তকরণের সঙ্গে জুরে আছে বঙ্গের প্রথমদিককার বাম নেতৃত্বের আত্মত্যাগ ও নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন। সেদিক থেকে দেখলে 'জাতি' ও 'শ্রেণির' উভয়ের এক দীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ করা যায়। ভারতীয় সমাজ ধর্মের আদলে সৃষ্ট হলেও সেই ইতিহাসে কীভাবে শ্রেণিচেতনা বৃদ্ধি করা যায় এজন্য বামপন্থীদের একটা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সেই সংগ্রাম হলেও আমরা মূলত বঙ্গের নিরিখে তা সীমাবদ্ধ রাখব। বঙ্গে এই সংগ্রামের সূচনা হয় একপ্রকার ত্রিশের দশকে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক দল শহুরে বাঙালি মার্কসীয় ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে সমাজব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনে বিশ্বাস রাখে। গ্রামকে ধরে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা নিয়ে গ্রামে পৌঁছাতে শুরু করেন এবং এক দশকের মধ্যে কৃষকদের সঙ্গে সংপৃক্ততা গড়ে তোলে। প্রারম্ভিক পর্বে তাঁরা গ্রামে প্রবেশ না করলেও গ্রামকেন্দ্রিক 'মেলা' ও 'হাট'কে ধরে বাম-রাজনীতির পরিধি বাড়াতে সচেষ্ট হন। সেখানে ছোটখাট সভা, মিছিল, বক্তিতার জায়গা তৈরি করে সাধারণ গ্রামবাসীর

কাছাকাছি আসতে চেষ্ঠা করেন। এর পরবর্তীতে 'কৃষক সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন জেলাতে। যদিও কংগ্রেসি রাজনীতির হাত ধরে। কারণ গ্রাম প্রবেশের পথ তাদের কাছে খুব একটা সহজ ছিল না। ফলত তাদের সাথে কীভাবে কৃষক সমাজের সংযুক্তি ঘটেছিল তা দেখবে আলোচ্য সন্দর্ভটি।

৩. গবেষণার ভৌগলিক পরিধি ও তার গুরুত্ব

১৯৪৬ সালে বঙ্গের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বামপন্থীদের অবস্থান জনসংমুখে উঠে আসে। সেই লাইন ধরে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে রাজনীতিতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। তেভাগা এবং সরকার গঠন এই দুই পর্বের মধ্য একটা বিস্তর ব্যবধান লক্ষণীয়। প্রথমত, সময়ের দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, স্থানের পরিসর উক্ত সময়ে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ নেয়। অর্থাৎ ভারতভাগ (১৯৪৭) এই দুই পর্বের পরিসীমা নির্ধারণ করে দেয়, নতুনভাবে। দেশভাগের অনুপূর্বে জলপাইগুড়ি, রংপুর এবং দিনাজপুর প্রধানত তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত। স্বাধীনতার পরবর্তীতে উক্ত স্থানের খণ্ডাংশ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যুক্ত হয় যা বর্তমান উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। আমাদের গবেষণার স্থান হিসাবে বর্তমান উত্তরবঙ্গ এবং অবিভক্ত বৃহত্তর বঙ্গের উক্ত স্থানের অতীত ইতিহাস অন্বেষণের মধ্য দিয়ে রাজবংশী ও বামপন্থী রাজনীতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবে। স্থানের অবস্থানের দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যাবে তেভাগা আন্দোলনের পরিমন্ডল অবিভক্ত বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। যা দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে সীমিত। যদিও তার গুরুত্ব ও প্রভাবকে প্রবল করে ভাববার একটা প্রবণতা রয়েছে। সেকারণে সাম্প্রতিককালেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। সেদিক থেকে দেশভাগ তথা বঙ্গভাগ মানুষের রাজনৈতিক ভূপরিমন্ডলের সীমারেখায় শুধু বিভাজন

এনে দিয়েছে এমনটা নয় বরং তার ধারাবাহিকতা ও তার স্মৃতি থেকে গেছে দেশভাগ পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে। সেই পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে নকশাল আন্দোলন এবং বামফ্রন্টের রাজত্ব। এর মধ্যে কমিউনিস্ট লাইন কয়েকবার বদল হয়েছে, দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং শেষে যুক্তফ্রন্ট থেকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তেভাগা পর্বকে চিহ্নিত করা হয়। তাই যথাযত গুরুত্ব দিয়ে বলতে দেখা যায় তেভাগা আন্দোলনে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের কথা কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত শ্রেণির নিরিখে রাজবংশীদের অবস্থান নিয়ে কোন গবেষণা পত্র প্রকাশ পাইনি। সেই শূন্যস্থানের সেতুবন্ধনের উদ্যোগ নিতে গিয়ে আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটির অবতারণা।

অবিভক্ত বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার ইতিহাস যা আমাদের গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। উক্ত স্থান আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র এই কারণে যে, বামপন্থীদের তেভাগার কৃষকসংগ্রাম তথা তার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনে স্থানীয় ইতিহাসের ভূমিকা অবিসংবাদিত। এই স্থানীয় ইতিহাসের রূপকার হিসাবে রাজবংশীদের প্রাধান্য বেশ প্রকট। সেকারণে জাতির ইতিহাসের সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের সংযুক্তকরণ এবং সংমিশ্রণ বুঝতে উক্ত স্থানকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অপরদিকে রাজতান্ত্রিক কোচবিহার বঙ্গের উপনিবেশিক শাসনে অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে পরিণত না হওয়ায় সেখানকার রাজনৈতিক জীবন অনেকটাই স্বতন্ত্র। কারণ উভয় অঞ্চলে উপনিবেশিক শাসন সমহারে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। উপনিবেশিক শাসনের বাইরে পরিসীমা যেমন প্রিন্সলি স্টেট কোচবিহার পাশাপাশি অবস্থান করায় অনেকসময় বামপন্থী কর্মীদের নিরাপত্তার জায়গা হয়ে উঠেছিল। যা দেশভাগ পরবর্তীতে রাজতন্ত্রের মর্যাদা বিলপ্তি হলে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে

কোচবিহার আত্মপ্রকাশ করে। জেলা কোচবিহার বাম আন্দোলনের অন্যতম ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি গবেষণা প্রকল্পের স্থানের সীমানা অতিক্রম করে। তবে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের ইতিহাস একে অপরে সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টভাবে বিরাজ করে অনেক কাল ধরে। সম্পর্কের জায়গাটি হল উভয়েই দীর্ঘদিন রাজতন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে গড়ে ওঠা একটি জনপদ। স্বভাবতই উভয়ের গ্রাম্য জীবন একই লয়ে ও বর্ণনায় ফুটে ওঠেছে। রাজতান্ত্রিক শাসনের শুরুর থেকে উক্ত দুই সমাজ ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। অভিবাসীতের আগমন সেই ভিন্নতাকে প্রকট করে। রাজ শাসনকার্যে এবং সংস্কৃতায়নের জন্য অন্য জাতির মানুষজন আসতে শুরু করেছিল অনেক আগের থেকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় কোচ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ (১৪৯৬-১৫৩৩) হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণ এনে উক্ত স্থানে হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটান এবং সঙ্গে তাদের জমি দান করার রীতিও চালু করেন।[১৬] অপরদিকে উপনিবেশিক শাসনের বিস্তৃতি ঘটলে বাঙালি ও অবাঙালি মানুষজন উত্তরবঙ্গে আসতে দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে একটি নাগরিক সমাজের চিত্র ফুটে উঠে। এমনই চিত্র দেখতে পাওয়া যায় রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটতে শুরু করে। জমি-কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রভাবে জমিদার জোতদারদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল উক্ত দুই জেলা। সঙ্গে প্রশাসনিক কাজের হাত ধরে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এই সমস্ত পেশার মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে। ভিন্নতার চিত্রটি আরো স্পষ্ট হতে থাকে উপনিবেশিকতার হাত ধরে। চাবাগানগুলি গড়ে উঠলে শ্রমজীবী মানুষের আগমন এই বৈচিত্র্যতাকে বাড়িয়ে তোলে। এই বৈচিত্র্যতা অর্থনৈতিক জীবনকে এতটাই অসাম্যের দিকে নিয়ে যায় যা একদিকে ধনতন্ত্রের সূচনা করে আর অন্যদিকে গ্রাম্য সামন্ত

জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। এই সূত্র ধরে বাম আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান ভূ-কেন্দ্রে পরিণত হয় উত্তরবঙ্গ। অন্যদিকে, স্থানীয় মানুষের বৈচিত্র্যতাও কম নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও উপজাতির মানুষের বাসস্থান হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ। কোচ, মেচ, ধিমাল, রাজবংশী, টোটো, গারো, নেপালি, ভূটিয়া, বোড়ো, আরো কত না জাতিই বাসবাস করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। দেশভাগ পরবর্তীতে এর সঙ্গে আরো যোগ দিয়েছিল ব্রাহ্মণ থেকে ভিন্ন জাতে লোকেরা। তা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলছে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র জীবন ধারার এক প্রবাহ।

ভৌগলিক পরিবেশের স্বতন্ত্রতা যেমন লক্ষণীয় তেমনি উত্তরবঙ্গের সীমারেখাকে ধরে গড়ে তুলেছে ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ এবং তিব্বত। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশ পথ হল উত্তরবঙ্গ। সঙ্গে বিভিন্ন নৃতাত্বিক জনসমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এখানকার সমাজ ব্যবস্থা। ধর্মীয় জীবনেও এই ছাপ লক্ষ করার মত। শৈব, শাক্ত থেকে শুরু করে বৈষ্ণব; বৌদ্ধ, জৈন থেকে মুসলিম সমস্ত ধর্মের মধ্য একটা সমন্বয় নিয়ে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক জাতি তার স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রভাবের মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে।

শুধুমাত্র ভৌগলিক বা নৃতাত্বিক নয়, উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনে এমন এমন ঘটনার আবির্ভাব হয়েছিল তা জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক জীবনে তার প্রভাব লক্ষণীয়। নকশাল বাড়ির আন্দোলনের কথা আমরা সবাই জানি। সাহিত্য থেকে শৈল্পিক জীবনের এমন মনোরম পরিবেশ তৈরি করে যা একদিকে নান্দনিক জগতকে প্রভাবিত করে দুনিয়া বদলের ডাক দেয়। ব্রিটিশ ভারতের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের (১৭৬৩-১৮০০) কথা। যার পীঠস্থান রংপুর। এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত[১৭] যেমন রংপুর থেকে শুরু হয়েছিল তেমনি

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুল মন্ত্র 'বন্দোমাতরম' রচনা করলেন রংপুর ও জলপাইগুড়ি থেকে। এই বন্দেমাতরম হয়ে উঠে এখানকার রাজবংশী জাতি আন্দোলনের অন্যতম শ্লোগান। উত্তরবঙ্গের মাটিতেই সন্ন্যাসীরা প্রথম বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়েছিল। সন্ন্যাসীদের উত্তরসূরি হিসাবে রাজবংশীরা নিজেদের জাতি আন্দোলনে বন্দেমারতম ধ্বনিকে প্রকাশ করে। রাজবংশীদের 'বন্দেমাতরম' আর কংগ্রেসি 'বন্দেমাতরম' একেই স্বরের প্রতিধ্বনি নয় বলে অনেকে মনে করে।[১৮] ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে রাজবংশীরা কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট উভয়ের দলের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন[১৯] যা স্পষ্টতই উক্ত বয়ানকে প্রমাণিত করতে সাহায্য করে। রাজবংশীদের 'বন্দেমাতরম' আওয়াজ শুনে মনে হতে পারে কংগ্রেস ও রাজবংশী একে অপরে পরিপূরক। তবে বিষয়টি ওই রকমটা নয়। যদিও বামপন্থী প্রগতিশীলরা তাই মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বাম নেতাদের বয়ানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে রামমোহন রায় ব্রিটিশ সরকারের চাকরি নিয়ে অনেকদিন রংপুরে থেকে যান এবং এখানে একই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার অধ্যায়ন যেমন শুরু করেন তেমনি ব্যক্তিগত ব্যবসার মধ্য দিয়ে আর্থিক জীবনে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ঘটাতে বেশ সফল হয়েছিলেন। সে সম্পদ পরবর্তীতে তাঁর সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ সহায়ক হয় বলে অনেকে মনে করেন। শুধু তাই নয়, রায়, রংপুরে থাকাকালীন ডিগবি সাহেবের হাত ধরে ইংরাজি ভাষা শিখতে শুরু করেন। এই ইংরাজি শেখার মধ্য দিয়ে পশ্চিমী জগতের চিন্তাভাবনা সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। সেই সুত্রে তাঁর মধ্যে স্বদেশী ভাবনার সূত্রপাত রংপুর থেকে শুরু হয়।[২০] অপরদিকে সন্ন্যাসী বা ফকিরদের কথা বললে প্রথমে যে কথাটি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা হল এক নির্লিপ্ত জীবনের চিত্র। তাদের আর্থিক জীবনে কিছু নেই কিন্তু একটা পরিচিতি

রয়েছে। তাদের এই বহমান জীবনধারার প্রভাব স্থানীয় জীবনে বেশ প্রকট তা আমাদের আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে। দান ও দক্ষিণার উপর নির্ভর করে জীবন-নির্বাহ এক অর্থে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের বিদ্রোহ ছিল। অন্যদিকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি (১৯১০) ও তার আন্দোলনের সঙ্গে রংপুরের নাম জড়িত। ক্ষত্রিয়করণ রাজবংশী জাতি সচেতনার এক বিশেষ পর্ব যা রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার রংপুরে ওকালতি জীবনকে যুক্ত করে। এই রকম পরিমণ্ডলে বাম নেতৃত্বের আবির্ভাব আমরা দেখতে পাই উত্তরবঙ্গে। বিশেষত ১৯৩০ এর দশকে বাম সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়ে গ্রামেগঞ্জে বামপন্থী নেতাদের অবর্তীন হতে দেখা যায়। মহামন্দার প্রভাবে যখন গ্রামগুলি প্রভাবিত হচ্ছিল সেই সময় অর্থনৈতিক অসাম্যের বিষয়টি লোকচক্ষে আরো বড় করে দেখা দিতে লাগল। এই অসাম্যের প্রশ্নে কৃষকদের সান্নিধ্যে আসার অভিপ্রায় নিয়ে বামপন্থীদের উপস্থিতি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কীভাবে প্রসারিত হচ্ছিল তার দিকে লক্ষ রাখতে গেলে আমাদের বাম আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধানে সচেষ্ট হতে হয়।

বস্তুবাদী ইতিহাসে নিরিখে রাজবংশী জাতি তথা উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ কিছুটা উঠে এসেছে বাম নেতৃত্বদের লেখনীতে যারা[২১] বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন। সেজন্য আমাদের আলোচ্য সন্দর্ভটি রচনায় তাদের ব্যাখ্যা বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে বিষয়টি উপস্থাপন হয়েছে এবং উপস্থাপিত ঘটনাকে আবার কীভাবে রাজনীতি করা হয়েছে। এই যুগপদ ঘটনার পরম্পরা বুঝতে গেলে বঙ্গে বাম রাজনীতির পটভূমির দিকে লক্ষ রাখতে হয়।

৪. বঙ্গে বাম-রাজনীতির সূচনা পর্বের ইতিহাস

বঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শাসন কাল বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় একটু গোড়ার দিকে। বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের নিয়ন্ত্রক পার্টি (Mother Party) হল 'ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি' (CPIM)। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল বাম ভাবাপন্ন কতগলো দলের সমন্বয়ে। 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (CPIM) বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রণ করলেও 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র জন্ম ও বিভেদ ঘটতে শুরু করে 'ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি' (CPI) থেকে। দুটোই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু প্রাথমিকভাবে তাদের বিভাজনকে বুঝতে গেলে উক্ত বন্ধনীর চিহ্ন দিকে তাকাতে হয়। পার্থক্য শুধু একটি 'M' সঙ্কেতে। এই 'M' কে ধরা হয় 'Marxist'. বলা হয়েছে এটা একটা মতাদর্শগত পার্থক্য যা বিভেদের জন্ম দিয়েছিল। আসলে এই বিভাজনের জায়গাটা তৈরি হয়েছিল ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পরবর্তীতে নিকিতা ক্রুচেভের সময়কালে। তিনি 'তিন পি তত্ত্ব' ঘোষনা করার পর থেকে চীন, রুশ এবং সোভিয়েতের বিভাজন শুরু হয়। এই তিন পি তত্ত্ব হল-- ১.শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ, ২.ধনতান্ত্রীক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবস্থান এবং ৩.ধনতান্ত্রীক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উক্ত লাইনকে ফলো করতে গিয়ে বিভাজিত হয়ে পড়ে। জাতির (Nation) প্রশ্নে এই বিভাজন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে। একদিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (National Democratic Front বা NDF) প্রবক্তারা দক্ষিণপন্থী এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (People's Democratic Front বা PDF) প্রবক্তারা বামপন্থী নামে পরিচিত হলেন। মুল কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) থেকে ১৯৬৪ সালে যারা বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল তৈরি করলেন তাঁরা CPI এর সঙ্গে 'M'

(Marxist) যুক্ত করে নিজেদেরকে আলাদা করে নিলেন। এরা ছিলেন নরম বামপন্থী। এর প্রধান নেতা ও প্রবক্তা হলেন জ্যোতি বসু। আর পুরানো দলকে চিহ্নিত করার হল চরমপন্থী হিসাবে। এর প্রধান নেতা ও প্রবক্তা হলেন মুজফ্ফর আহমেদ।[২২] অর্থাৎ সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে এই বিভাজন শুরু হয়েছিল বলে ধরা হয়। CPI ভোট রাজনীতি বিশ্বাসী না থাকলেও CPIM গণতান্ত্রিক ভোট রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখতেন। এই CPIM ভেঙ্গে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল CPI(ML). নকশাল যাদের বলা হয়। এরা মাওজে-দং এর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে শাসক শ্রেণিকে উৎখাতের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছিলেন। বিপ্লবী চিন্তা ভাবনা ছেড়ে CPIM ১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেন। এই সরকারের নাম দেওয়া হয় যুক্তফ্রন্ট (UF) সরকার। অজয় মুখার্জি এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আর জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙার যথাক্রমের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও ভূমি বিষয়ক মন্ত্রী লাভ করেন। এই পর্বে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে একদল কমিউনিস্ট নকশাল আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হন। যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন বিশেষত জমিদারদের উৎখাত এবং কৃষকদের জমি বন্টনের মধ্য দিয়ে আমুল পরিবর্তনের আভাস না থাকায় নকশালরা কমিউনিস্টদের থেকে সরে গিয়ে আমুল পরিবর্তনের দাবি রাখে। যার জন্য দেখা গেল যুক্তফ্রন্ট সরকার নকশালদের দমানোর কাজে পুলিশ ও মিলিটারি শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল।[২৩] এই আঁকাবাঁকা পথ ধরে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠে জনতা পার্টিকে সমর্থন জানিয়ে।[২৪] আলোচ্য সময় পর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার দুই বার ক্ষমতা দখল করে (১৯৬৭ এবং ১৯৬৯)। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালের রূপান্তর পার্টির ইতিহাসে সাফল্যতার জায়গা থেকে বিবেচিত হয়েছে।

একদিকে যেমন এই পর্বে পার্টির সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি ঘটেছে তেমনি কৃষক জগতকে কিছুটা যে প্রভাবিত করতে পেরেছিল তা দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করা শক্তি বুঝতে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় সাফল্য এবং কৃষক জনপ্রিয়তা যা শাসকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যকে ভিন্ন করতে শুরু করে। কারণ সেখানে সোজা সহজভাবে কৃষক ও স্থানীয় নেতার সঙ্গে শাসকের সমন্ধ স্থাপিত হয়নি বলে এরিল্ড এঙ্গেলসেন রুড মনে করেন। তিনি লিখেছেন--

> 'there is no straight forward relationship between what the party officially wanted and what it actually wanted, between what its leadership wanted and what its local activists wanted, or, lastly, between party objectives and how these were perceived by the poor'.[২৫]

যার কারণে অনেকসময় দেখা গেছে সিলিং আইনের নিয়মানুসারে ৭৫ বিঘে জমি দখলে রাখার নিয়ম থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি এমনকি রেষানলে পড়তে হয়েছিল অনেক চাষিকে যারা সাধারণভাবে শ্রেণিশত্রু বলে বিবেচিত হয়নি।[২৬] তার প্রভাব রাজবংশী সমাজে কীভাবে পড়েছে তার পর্যালোচনা করবে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) থেকেই উক্ত ভিন্নমতালম্বী দল বা পার্টির উদ্ভব হতে দেখা যায়। তবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসকন্দে, ১৯২০ সালে ১৭ অক্টোবর তারিখে।[২৭] প্রতিষ্ঠাতা রূপে এক জন বাঙালির নাম জড়িয়ে রয়েছে। যিনি ইতিহাসে এম এন রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়) নামে প্রসিদ্ধ। তাসকন্দে প্রতিষ্ঠিত পার্টিকে, যাকে মুজফ্‌ফর আহমেদ বলেছেন প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সেটি ছিল একটি গোষ্ঠী। এটি গোষ্ঠীর উদ্ধে উঠতে

পারেনি। সে কারণে তা পার্টির চরিত্র অর্জন করতে পারেনি বলে অনেকে মনে করেন।[২৮] যাইহোক না কেন, এম এন রায় প্রথম জীবনে বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি অনুশীলন সমিতির কর্মী এবং বাঘাযতীনের নেতৃত্বে অস্ত্র যোগাড়ের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি দেন। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, চিন, জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে মেক্সিকো যান। তিনি যোগ দেন সেখানকার এক সমাজতন্ত্রী দলে। পরে এই দলের সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেক্সিকোতে রুশ কমিউনিস্ট নেতা মাইকেল বরোদিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরবর্তীতে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) তিনি বরোদিনের সঙ্গে যোগদান করেন।[২৯] এই সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই এম এন রায়ের উদ্যোগে তাসকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়। তবে এই পার্টিতে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গঠনতন্ত্র ছিল না বলে অনেকে মনে করেন।[৩০] এর মধ্যে রুশ বিপ্লবের কথা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। যার প্রভাব থেকে বঙ্গ বিচ্ছিন্ন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের খবর পেয়েছিলেন প্রায় ছয় মাস পড়ে।[৩১] শ্লথ লয়ে ছড়িয়ে পড়লেও এই নতুন চিন্তাভাবনার দ্বারা অনেকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সেই দিক থেকে বলতে গেলে ভারতে এই পার্টি প্রতিষ্ঠায় যাদের নাম করা হয় তাঁরা হলেন বঙ্গের মুজফ্‌ফর আহমেদ, মুম্বাইয়ের শ্রীপাত অমৃত ডাঙ্গে, চেন্নাইয়ের সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এবং লাহোরের গোলাম হোসেন। চার দিক থেকে চার জন ব্যক্তির নেতৃত্বে চার জায়গায় কমিউনিস্ট চক্র গড়ে ওঠে।[৩২] তবে এরা কেউই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেনি। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সত্যভক্ত নামে উত্তরপ্রদেশের এক কংগ্রেস-কর্মী। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি মোহভঙ্গ হলে তিনি

কমিউনিজিমের দিকে ঝুঁকেন। তাঁরেই প্রচেষ্টাতে ১৯২৫ সালে কানপুরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়া।[৩৩] অর্থাৎ ১৯২৫ সালে থেকে ভারতে এক সংগঠিত পার্টির রূপ পেল। অর্থাৎ দেশভাগের প্রান্তে এসে কমিউনিস্টদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল মুজফ্ফর আহমেদকে কেন্দ্র করে। কারণ তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল বঙ্গে পার্টির দায়িত্ব। সে সময় কমিউনিস্ট চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। আর একটি দল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে সরে এসে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে জড়িয়ে পড়েন। মুজফ্ ফর আহমেদ থেকে অবনী লাহিড়ী ও অন্যান্যদের[৩৪] লেখাতে স্পষ্ট যে বিপ্লবীরা জেল খানায় বসে সাম্যবাদী ভাবধারায় পরিণত হয়েছিলেন এবং জেল থেকে বের হয়ে পার্টিতে যোগদান করেন। এরাই পরবর্তীতে এক এক জন কমরেড হয়ে উঠেছিলেন। প্রশ্ন যদি করা হয় কীভাবে জেলখানায় সাম্যবাদীর বই পৌঁছেছিল? ব্রিটিশরা তো কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনায় ঘোর বিরোধী ছিলেন। আসলে বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার বার বার মুষড়ে পড়তে থাকেন। সরকার কোনভাবে তাঁদের দমাতে পারছিল না। কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে লাভ হচ্ছিল না। বাংলার যে সন্তানরা ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে হাসতে পারে তাঁদের আবার কি শাস্তি দেবে! বরং সরকারেই ভয় পেয়ে যাচ্ছিলেন। তাই বিপ্লবী কার্যকলাপকে ঘুরিয়ে দিতে এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলেন প্রশাসক। জেলখানায় তাঁরাই পৌঁছে দিতে লাগলেন কমিউনিজমের লেখাপত্র। সেদিক থেকে দেখলে কমিউনিস্ট ভাবধারাকে ব্রিটিশরাই বহন করে আনলেন।[৩৫] সেকারণে সেসময় (১৯৩২), সেলুলার জেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহেরা নিয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। শুধু সেলুলার নয়,

আন্দামান থেকে অন্যান্য জেলগুলিও অনুরূপ চেহেরা নিয়েছিল। যে সমস্ত বন্দী বিপ্লবীরা সেলুলার জেলে ছিলেন তারা বন্দী জীবন কাঠিয়ে ছিলেন মার্কসবাদ লেনিনবাদের জ্ঞানার্জনের সাধনার মধ্য দিয়ে। শুধু পড়তেন তা নয়, তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আবার পড়াতেন। যেমন সেলুলার জেলে ক্লাস নিতেন নারায়ণ রায়, নিরনঞ্জন সেন, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রমুখ। এর পর চলত পারস্পারিক আলোচনা।[৩৬] এরা পরবর্তীতে যখন জেল জীবন থেকে মুক্তি পেল, অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও জেলায় জেলায় পার্টির কাজ কর্ম শুরু হলে এরাই তার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।[৩৭] ফলত এই পর্বে পার্টি তার ব্যপ্তি, কার্যক্রম অনেকটাই প্রসারিত করতে পেরেছিলেন তা অনুমেয়। কমিউনিস্টরা ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ এই কাল পর্বে অনান্য দলগুলির সঙ্গে একাত্ব হয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এমনকি অনান্য দলে নাম লিখিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্কিম মুখার্জি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি নিবার্চিত হয়েছিলেন এবং পাচুগোপাল ভাদুড়ী এবং কমল সরকার ছিলেন সহ সম্পাদক। এই রকম বিভিন্ন পার্টিতে অংশগ্রহণ করে কাজকর্ম আরাম্ভ করেছিলেন। এই পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট নীতি গ্রহণ করে বলে অনেকেই মনে করেন।[৩৮]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালে CPI এর নীতি নির্ধারণ কিছুটা যুদ্ধ বিরোধী হলেও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশ্নে যুদ্ধকে সমর্থন করেন। সোভিয়েতের সঙ্গে ব্রিটিশ মিত্রতার কারণে বামেদের ব্রিটিশ বিরোধীতার থেকে সরে আসতে দেখা যায় এবং নেতাজী সুভাষ[৩৯] থেকে গান্ধীজির ভারতছাড় আন্দোলনকে সমর্থন না করলে ব্রিটিশ সরকার পুরষ্কার স্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টিকে আট বছরের অবৈধ পার্টিকে থেকে মুক্ত করে বৈধ বলে ঘোষণা করেন। অথচ বলা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের

অবদানের কথা।[৪০] শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে তপশিলি জাতিসমূহের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছিলেন। ফলত তাদের ব্রিটিশ প্রীতি, কখন কংগ্রেস প্রীতি এমনকি ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে ১৯৭৭ সালে সরকার গড়তে দেখা যায়। অন্যদিকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ধ্বজা তুলে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যসাধনের প্রক্রিয়াকে জোর দিয়েছিলেন। পার্টি যে বার বার স্ববিরোধীতার নীতি অবলম্বন করেছেন তা দেখা যায় ১৯৬৪, ১৯৬৭, ১৯৬৯ এবং ১৯৭৭ সালে। অর্থাৎ বার বার ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্য দিয়ে বামপন্থীরা নিজেদের ক্ষমতা দখলের দিকে নিয়ে গেছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান, প্রসরতা, বিভাজন এবং সরকার গঠন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সাম্যবাদে প্রভাব বিস্তার ঘটানোর কার্যক্রম যথাক্রমে সাংগঠনিকভাবে এবং পত্র পত্রিকা বই ছাপানোর মধ্য দিয়ে চলছিল। জেলায় জেলায় কমিউনিস্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামে গ্রামে নেতাদের আগমনের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ গ্রাম্য জীবনের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কীভাবে ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কীভাবে শ্রেণি প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে যেমন বিভিন্ন পত্র পত্রিকা যেমন– কারখানা পত্রিকা, চাষি, মজুর, দিন মজুর, সাম্য, গণনায়ক, লাঙল – বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং প্রকাশনার জন্য ‘ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত’ হয়। যদিও স্থানীয় ভাষায় কোন পত্র পত্রিকা বা লিফলেট প্রকাশের উদ্যোগ বঙ্গের বাম রাজনীতিতে দেখা যায়নি। এই যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে কমরেডদের অনলস শ্রম করতে দেখা যায় কংগ্রেস রাজনীতির পরিমণ্ডলে। প্রথমদিকে কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেতারা ময়দানে নেমেছিলেন। এর সঙ্গে আমরা দেখতে পাই, ১৯২৯ সালের মহামন্দা, ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের মঙ্গা এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল যা বাম নেতাদের পার্টি তৈরি

করতে বেশ সদার্থক ভূমিকা নিয়েছিল। যা তাদের তেভাগা সংগ্রামে নামতে সুবিধে হয়েছিল। এর মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষত ত্রিশের দশকের একে বারে শেষদিকে জেলার কমিটিগুলো প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। দেশভাগের ফলে অগণিত নতুন মানুষের আগমন এবং পরবর্তীতে ছাত্র শিক্ষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন থেকে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির বিরূদ্ধে আন্দোলন যা বাম দলগুলোকে ক্ষমতা দখলের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

৫. পর্যবেক্ষণ

বাম আন্দোলনে তেভাগার প্রভাব যেভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই অর্থে অন্য আন্দোলনগুলো যেমন রেল বা কারখানার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েনি। উত্তরবঙ্গে তেভাগা সংগ্রামে রাজবংশী, স্থানীয় মুসলিম ও সাঁওতালদের অংশগ্রহণের কথা উঠে আসলেও সীমিত পরিসরের আলোচনা মূলত রাজবংশীদের প্রতিপাদ্য করে তুলেছে। অবিভক্ত বাংলার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে রাজবংশীদের সংখ্যা হিন্দু সমাজে ১/৩ দেখা যায়।[৪১] সেই অর্থে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। রাজবংশীদের এই যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি যেমন আন্দোলনের এবং বঙ্গের রাজনীতির আলোচনার বিষয় করে তোলে। সেইদিক থেকে রাজবংশীদের অবস্থানের গুরুত্ব বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, বামপন্থীদের আলোচনায় রাজবংশী জাতি প্রশ্নটি কীভাবে বিষয় হয়ে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দেখাতে সাহায্য করবে শ্রেণির ধারণাকে। দ্বিতীয়ত, জাতি প্রশ্নের একটা নিজস্বতা রয়েছে, তার মান্যতাকে ধরে এই দুইয়ের পারস্পরিকতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ এই সম্পর্ক আবার কীভাবে রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠল তারও একটা আলোচনা রাখা হয়েছে প্রকল্পে।

এই ত্রিবিবিধ প্রক্রিয়া আমাদের নিয়ে যাবে জাতির আদিসত্তার প্রশ্নকে খুঁজতে। সেখান থেকে বাম রাজনীতির কার্যকলাপকে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য সন্দর্ভে।

আকস্মিকভাবে বাম আদর্শের আবির্ভাব এবং তার নতুন চিন্তারকে আত্তীকরণ করে ব্যবহারিক করে তোলার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেই সংগ্রামের সঙ্গে পরবর্তীতে বাম সরকার গঠনের মধ্যে একটা বিস্তর দূরত্ব বিদ্যমান যা বামভাবাপন্ন কর্মীদের লেখা আত্ম-জীবনীতে প্রকাশ পেয়েছে।[৪২] অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বার বার বদলাতে হয়েছে। সেই বদলানোর রাজনীতিতে কীভাবে রাজবংশীরা ছিল তার জটিলতার জায়গাগুলো অনুসন্ধান করেছে গবেষণা প্রকল্পটি।

আলোচ্য প্রকল্পটিতে জাতি প্রশ্নটি বোঝার তাগিদে শ্রেণির ধারণাকে গবেষণার বিষয়বস্তু করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ইতিহাস লেখা আমাদের অভিষ্ট নয়, বরং জাতি প্রসঙ্গ বদলে যাওয়া বা সময়ের নিরিখের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হওয়ার অভিপ্রায় যেমন বিভিন্ন আলোচনায়[৪৩] উঠে এসেছে, সেই জায়গাতে জাতি প্রশ্নটির প্রতিরোধের ধারণাকে অবতারণ করে জাতির অবস্থান দেখানো হয়েছে। রাজবংশী জাতি প্রতিরোধের এই ধারা- আদি থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত- কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার নিরিখে গবেষণা প্রকল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে। সেকারণে এর পরবর্তী অধ্যায়টিতে জাতির ধারণা ও রাজবংশীদের অবস্থান দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Nicholas B. Dirks: *Caste of Mind: Colonialism and the Making of Mordern India*, (New Jersey, United Kingdom, Princeton University Press, 2001).

২. Gail Omvedt, 'Thought and Ideology of Jotirao Phule', in Simhadri Somanaboina & Akhileshwari Ramagoud (ed): *The Routledge Handbook of the Other Backward Classes in India, Thought, Movements and Development*, (*New York, Routledge, 2022*), p. 39.

৩. অতীন ঘোষ: *দলিত সমাজ ও আম্বেদকর*, (কলকাতা, নিউ ঘোষ প্রেস, ১৯৫৫); মনোরঞ্জন বড়াল: *প্রসঙ্গ: তফশিলভুক্তদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা*, (কলিকাতা, পথসংকেত প্রকাশনা, ১৯৯০)।
৪. সুদীপ্ত কবিরাজ: *মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান*, (কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২২)।
৫. Arild Engelsen Ruud: *Poetics of Village Politics, the making of West Bengal's rural communism*, (New York, Oxford University Press, 2003); Ranjit Das Gupta: *Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947*, (Delhi, Oxford university Press, 1992).
৬. ভি. আই. লেনিন: *গ্রামের গরিবদের প্রতি (১৯০৩), কৃষক-সমস্যা সম্পর্কীত প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়া*, বিভূতি গুহ ও অরুণ মিত্র (অনুবাদ), দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪৫), পৃ. ৯৪।
৭. সুদীপ্ত কবিরাজ: *মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
৮. Anuradha Ray: *Cultural Comminism in Bengal 1936-1952*, (Delhi, Primus Books, 2014).
৯. Amit Gupta: *Crises and Creativities: Middle-Class Bhadralok in Bengal 1932-52*, (Hydrabad, Orient BlackSwan, 2009).
১০. Louis Dumont: *Homo Hierarchicus, the Caste system and its implementations*, (New Delhi, Oxford University Press, 1988), p. 21.
১১. নির্মলকুমার বসু, *মহাত্মা গান্ধি*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা, পুনশ্চ, ২০১৪), পৃ. ৯৪।
১২. Iravati Karve: *Hindu Society - An Interpretation*, (Deccan College, Poona, Sangam Press Private Ltd., 1961), p. 13.
১৩. Ibid.
১৪. Louis Dumont: *Homo Hierarchicus, the Caste system and its implementations, op.cit.*
১৫. Arild Engelsen Ruud: *Poetics of Village Politics, The making of West Bengal's Rural Communism, Op.cit.*, P. 33. 'আমরা সকলে একসঙ্গে রয়েছি' এই বাক্যটি Ruud সাহেবের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে।
১৬. Harendra Narayan Chaudhari: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements*, (Cooch Behar State Press, 1903), p. 121.
১৭. কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর: 'উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ: ঔপনিবেশিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ', আনন্দগোপাল ঘোষ ও নীলাংশুশেখর দাস (সম্পা): সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহ: প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ, *(মালদা, সংবেদন, ২০১১)*, পৃ. ১৭৮।
১৮. আনন্দ গোপাল ঘোষ: উত্তরখণ্ড আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, *(কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০)*, পৃ. ৫১০।
১৯. দিনাজপুর থেকে শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ, গোবিন্দ চন্দ্র রায়, রংপুর কেন্দ্র থেকে নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (জয়ী প্রার্থী), ক্ষেত্রনাথ সিংহ ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। Dilip Banrjee: *Election Recorded, An analytical Reference, Bengal, West Bengal, 1862-2012*, vol- 1, Sixth Edition, (Kolkata, Star Publishing House, 2012), পৃ. ৮২-৮৩।
২০. আনন্দ গোপাল ঘোষ: ভারত-পথিক রামমোহন রায় ও উত্তরবঙ্গ, আনন্দগোপাল ঘোষ, সৌমিত্র প্রসাদ সাহা (সম্পা): উত্তরবঙ্গ ইতিহাস ও সমাজ-২, *(মালদা, সংবেদন, ২০১৫)*, পৃ. ১১০-১১২।
২১. সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার: *পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা*, (কলকাতা, মনিষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৮৩); সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি*, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫); সমীরণ দত্তগুপ্ত, *তিস্তাতটরেখা*, (কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০)।
২২. অমিতাভ চন্দ্র: 'ষাটের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বিভাজন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমান্তরাল প্রয়াস: একটি পর্যালোচনা', অনিরুদ্ধ রায় (সম্পা.): ইতিহাস অনুসন্ধান- ১৯, *(কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫)*, পৃ. ৪৭১।
২৩. Ross Mallick: *Development policy of a Communist government: West Bengal since 1977*, (New York, Cambridge University Press, 1993), p. 12.

২৪. Profulla Roy Choudhury: *Left experiment in West Bengal*, (New Delhi: Patriot Publishers, 1985), p. 147.
২৫. Arild Engelsen Ruud: *Poetics of the village politics, the making of West Bengal Rural Communism*, *Op.cit.* p. 106.
২৬. Ibid, p. 106.
২৭. মুজফ্‌ফর আহমেদ: *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, প্রথম খণ্ড ১৯২০ ১৯২৯, দ্বাদশ মুদ্রণ, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ. ৬৯।
২৮. ভানুদেব দত্ত: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট: ভারত*, (কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০১৫), পৃ. ২০।
২৯. মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
৩০. ভানুদেব দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৩৪. Profulla Roy Choudhury, *Left experiment in West Bengal*, *op.cit.*, p. 39.
৩৫. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *ভারতের কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) চিন্তাধারা ও তার পরিণতি*, (কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্ক, ২০১২), পৃ. ১৩।
৩৬. ভানুদেব দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৩৭. অমিতাভ চন্দ্র: 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়' (১৯৩৫-১৯৩৯), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, *(কলকাতা: কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০)*, পৃ. ৫১৬।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০; অঞ্জন সাহা, ভারতের 'কমিউনিস্ট পার্টি ও যুক্তফ্রন্ট রণনীতি: একটি পর্যলোচনা', অনিরুদ্ধ রায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান -১৮, *(কলকাতা: ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪)*, পৃ. ২৭৫- ২৮০।
৩৯. সজল বসু: *বাঙ্গালী জীবনে দলাদলি*, (কলকাতা, কল্পন, ১৯৮৬), পৃ. ৮৮-৯১। নেতাজিকে কখন তোজোর গাধা কখন বা ফ্যাসিস্টদের কুকুর বলে বিবেচিত করা হয়েছে। জগদীশ চন্দ্র মন্ডল: *ভারতের কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) চিন্তাধারা ও তার পরিণতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৪০. সুস্নাত দাশ: *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও অবিভক্ত বাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন, প্রথম খণ্ড (১৯২০-৪১)*, (কলকাতা, নক্ষত্র প্রকাশন, ২০১৮)।
৪১. Sekhar Bandyopadhyay: Changing Borders, shifting loyalties: Religion, Caste, and the Partition of Bengal in 1947, (*Asian studies Institute Working paper 2*, 1998).
৪২. জীবন দে: *আমার জীবনের অক্টোবর*, (তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সীমান্ত প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৭৮); সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫); মণিকুন্তলা সেন: *সেদিনের কথা*, (কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২)। এনারা জীবনের শেষ পাদে এসে এক ধরনের অনুশোচনায় কথা ব্যক্ত করেছেন। অনুশোচনার ভাষা ছিল প্রায় এই রকম 'কি চেয়েছিলাম আর কি পেলাম!'
৪৩. Arild Engelsen Ruud: *Poetics of Village Politics, The making of West Bengal's Rural Communism*, *op.cit.*; Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste movement, the Rajbansis of North Bengal, 1910–1947*, (Delhi, Manohar, 2003).

তৃতীয় অধ্যায়

রাজবংশী সমাজজীবন ও জাতি প্রতিরোধ

ভারত তথা বঙ্গীয় সমাজ অনুসন্ধান প্রশ্নে প্রথম যে উপাদানটির কথা আমাদের মনে পড়ে তা হল জাতি ব্যবস্থা। কারণ জাতি ও তার স্তরবিন্যাসের নিরিখে সমাজ ব্যাখ্যার প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। অনুরূপভাবে, বর্ণ তথা জাতি হল ভারতীয় সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। সে কারণে সত্যতা যাচাইয়ে জাতি প্রসঙ্গটি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিদ্য অঙ্গ। সেইসূত্রে রাজবংশী প্রশ্নটিকে আলোচনার বিষয় করে স্থানের চরিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে অতীত ইতিহাস বোঝার চেষ্টা করেছে আলোচ্য অধ্যায়টি। অতীত ও বর্তমান পরম্পরার রাজবংশী ইতিহাস রচনার ব্যাখ্যান কীভাবে ওঠে এসেছে তার জায়গাটি ধরে আলোচ্য অধ্যায়টি দেখানোর চেষ্টা করেছে রাজবংশীদের অবস্থানকে। সেই ইস্পিত ইঙ্গিতের ধারা জাতি প্রতিরোধের প্রশ্নটিকে স্পষ্ট করে। যা উত্তরবঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বুঝতে এবং তার অবস্থান বোঝার সুবির্ধাথে জাতির স্ব চরিত্র ও স্থানের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করবে আলোচ্য অধ্যায়টি।

১. পৌরাণিক ভাষ্যে এবং বর্তমান রাজনীতির সংখ্যা তথ্যে রাজবংশীদের অবস্থান

উত্তরবঙ্গ, বঙ্গের নিরিখে কিছুটা স্বতন্ত্র। ভৌগলিকতা এবং নৃতাত্বিক পরিচয়ে সৃষ্ট সমাজজীবন এই স্বতন্ত্রতাকে প্রকট করে। এই ভিন্নতা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে ‘আদিম সংস্কৃতি’ (Primitive culture) হিসাবে। আদিমতার প্রশ্নটি বনজঙ্গলের পরিবেশকে ঘিরে রয়েছে যেখানে অনার্য সমাজ বসবাস করে; এই

রকমভাবে ভারতীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি উত্তরবঙ্গের অবস্থান তুলে ধরেছেন। এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের পরিবেশগত সাদৃশ্য আজও বর্তমান। অন্যদিকে, উপনিবেশিক শাসনের অনুকূলে ব্রিটিশ আধিকারিকরা[১] এবং পরবর্তীতে যেসকল ভারতীয়[২] জাতি বিষয়টি তাদের লেখনীর প্রধান উপজীব্য করেছেন তাদের রচনাতে রাজবংশী প্রশ্নটি অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার করে দেখানো হয়েছে। সন্দর্ভের বিষয় হিসাবে রাজবংশী প্রশ্নটিকে নির্বাচন করার পশ্চাতে উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতি উপর রাজবংশী সমাজের প্রাধান্য ও আদিপত্যকে প্রকট করে। সেকারণে উত্তরবঙ্গে অন্য জাতিসমূহের তুলনায় রাজবংশীদের প্রাধান্য সমাজ তথা বর্তমান রাজনীতিতে বেশ প্রকট।[৩] বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে নমঃশূদ্র এবং রাজবংশী এই দুই জাতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে, হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশের লোকসংখ্যা এই দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত। আবার রাজবংশীরা উত্তরবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই বিবেচিত হয়েছে। সেকারণে উত্তরবঙ্গকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী প্রসঙ্গটি চলে আসে। ২০১১ সালের জনগণনায় কোচবিহার জেলার মোট জনসংখ্যা দেখান হয়েছে ২৮,১৯,০৮৬ জন। তার মধ্যে তপশিলি জাতি হল ১৪,১৪,৩৩৬ জন। মোট জনসংখ্যার ৫০.১৭%। সেখানে রাজবংশীদের সংখ্যাটা হল ১০,৬৩,৫৮১ জন। তপশিলি জাতির নিরিখে রাজবংশীরা ৭৫.২%। মোট জনসংখ্যার নিরিখে ৩৭.৭২%। জলপাইগুড়িতে মোট জনসংখ্যা দেখান হয়েছে ৩৮,৭২,৮৪৬ জন। তার মধ্যে ১৪,৫৮,২৭৮ জন হল তপশিলি জাতি। মোট জনসংখ্যার ৩৭.৬৫% হল তপশিলি জাতি। উত্তর দিনাজপুরের মোট জনসংখ্যা ৩০,০৭,১৩৪ জন। তার মধ্যে ৮,০৭,৯৫০ জন হল তপশিলি জাতি। মোট জনসংখ্যার ২৬.৮৭% হল তপশিলি জাতি। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুরের মোট জনসংখ্যা

১৬,৭৬,২৭৬ জন। তার মধ্যে ৪,৮২,৭৫৪ জন হল তপশিলি জাতি। মোট জনসংখ্যার ২৮.৭৪% হল তপশিলি জাতি।[৪] পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজে রাজবংশীরা জনসংখ্যার দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করেছে।[৫] সহজে অনুধাবন করা যায় নির্বাচনী-রাজনীতিতে রাজবংশীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার প্রভাব এবং নির্বাচনের ভূমিকায় উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী প্রশ্নটি একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। উপরিউক্ত জাতিগত পরিচয়ে রাজবংশীদের অনার্য বলে চিহ্নিত করা হলেও এর বাইরে রাজবংশীরা নিজেদের পরিচয় করে থাকেন, ভিন্নভাবে। এই ব্যাখ্যায় যিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন তিনি পঞ্চানন বর্মা (সরকার) নামে সমধিক পরিচিত। যাকে রাজবংশীরা জাতির জনক বলে মনে করে। বর্মার ব্যাখ্যায় ইতিহাস লিখনীর বিষয়বস্তু যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি পৌরাণিক কল্পকথাও। যাকে তিনি দিয়েছেন নতুন ইন্টারপিটেশন যা ব্রাহ্মণীক্যাল গণ্ডির জায়গাটিকে নতুন করে না ভাবালেও অন্যরকম পথের সন্ধান করতে সাহায্য করে। পঞ্চানন বর্মার সেই উদ্যোগে নির্মিত হয় জাতি আন্দোলন যা রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলন নামে পরিচিত। এম. ফিল গবেষণা সন্দর্ভে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যকলাপ, জাতি পরিচিতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন কাঠামো থেকে শুরু করে পঞ্চানন বর্মার বঙ্গের রাজনৈতিক জীবন পরিসরে যুক্ত হওয়ার জটিলতার জায়গাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়টিতে আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করব রাজবংশী জাতি আন্দোলন গঠনে পঞ্চানন বর্মার অভিপ্রায় এবং আন্দোলনের প্রারম্ভিকতাকে যা বর্মার জীবনবোধকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। সেই নিরিখে পঞ্চানন বর্মা'র আন্দোলন এবং তাঁর পূর্ববর্তী সমাজের অবস্থানের দিকে লক্ষ রাখলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় এই দুই সমাজের চিত্র যা রাজবংশীর ভাবনাচিন্তাকে প্রকট করতে সাহায্য করে। আবার রাজবংশীদের সঙ্গে

বঙ্গের শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস ও তার উৎপত্তিগত স্থান হিসাবে উত্তরবঙ্গের নাম জড়িয়ে রয়েছে। উভয়ের আর্দশগত জায়গাটি একে অপরের পরিপূরক না হলেও রাজবংশীদের আর্থিক দুর্দশাময় জীবনের প্রতিচ্ছবি অনেকটা বাম-রাজনীতির পলিসি তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। রাজবংশী বোঝাপড়া (Understanding) সঙ্গে বামেদের সংযোগ এবং পরবর্তীতে বঙ্গের বাম-রাজনীতির আখ্যান ও ব্যাখ্যায় কীভাবে তার আলোচনা উঠে এসেছে তা রচনা করতে সাহায্য করবে পরবর্তী অধ্যায়গুলো।

১. ১. অতীত বঙ্গের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রাজবংশীদের জন-পরিধি ও তার আখ্যান

ভারত তথা বঙ্গের জাতি চর্চার ইতিহাসের আদি সংকলন দেখতে পাওয়া যায় ধর্মীয় গ্রন্থে। ধর্মীয় ব্যাখ্যার পরিভাষায় নির্মিত সমাজব্যবস্থার গঠনপ্রণালী সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজের বাস্তবতার মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।[৬] অর্থাৎ ভাবজগতের সাথে বাস্তবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নিম্নশ্রেণি জাতিগুলির মধ্যে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় আদিবাসী সমাজের কথা যারা ব্রিটিশদের চোখে চিহ্নিত হয়েছিল অপরাধ-প্রবণ উপজাতি Criminal Tribe) হিসাবে। এই প্রয়াসে স্পষ্ট যে, উপজাতির আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক কাহিনীকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।[৭] ইতিহাস ও মিথের এই সমন্বয় থেকে রাজবংশী সমাজ ব্যতিক্রম নয়। তাই আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে ‘মিথ’ ও কল্পকথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর ক্রমানুতা বর্তমান রাজবংশী সমাজে নতুন পরিসরের জন্ম দেয়। এই পরিসর কোন ভৌগোলিক চিত্রের মাত্রা নয় বরং বলা যায় রাজবংশী সমাজের দোদুল্যতা (Ambiguity) যা নির্মাণ করে রাজবংশী সমাজের অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতাকে।

বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থায় রাজবংশীদের অবস্থানও দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মূলত আর্য এবং অনার্য প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আলোচনাটি শুরু হয়েছে। আলোচনাটি প্রথমত স্থানকেন্দ্রিক এবং সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জনজাতিগত পরিভাষা যা স্থানের স্বতন্ত্রতাকে উপস্থাপন করে। স্থান, জনজাতি উভয়ের মিলিত স্বরূপ উত্তরবঙ্গের অতীত চর্চা করেছে বঙ্গের নিরিখে কিছুটা প্রায়োগিক দিক থেকে। বিশেষত্ব হল উত্তরবঙ্গের ভূপ্রকৃতি এবং বঙ্গের আদি অধিবাসীর লক্ষণ প্রকাশে অনার্যদের ঐতিহাসিক অবস্থানের সাথে উত্তরবঙ্গে সম্পর্ক অনেকটাই গভীর।

উত্তরবঙ্গ মূলত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলারগুলির পরিসীমাকে কেন্দ্র করে বিবেচিত হয়। পৌরাণিক ভাষ্যে অতীত বাংলার পরিসীমা নির্ধারিত হয়েছে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, সুক্ষ্ম, এই বিভাগগুলি নিয়ে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীর অবস্থানকে ধরে রাজনৈতিক সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে। বাংলার প্রধান তিনটি নদী যেমন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথী দিয়ে সীমা নির্ধারিত হয়েছে। উত্তরে গঙ্গা ও পূর্বে ভাগীরথী দিয়ে চিহ্নিত অঞ্চলকে মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয়। গঙ্গার উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে অবস্থিত বঙ্গভূমিই উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। ভাগীরথীর উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের বাম অব্বাহিকায় স্থিত সমগ্র নিম্নবঙ্গই পূর্ববঙ্গ নামে চিহ্নিত। মহাভারতে হরিবংশে এই বিভাগগুলি জনপদের নামে পরিচিতি পেয়েছিল। বলা হয় মুনিবরের ঔরসে রাজমহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এরা হল অঙ্গ, বঙ্গ, সুজ্মক, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রক। অর্থাৎ অসুররাজ বলি এই সমগ্র জনপদটির উপর রাজত্ব করতেন। অঙ্গ গঠিত হয়েছিল বর্তমানের ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ নিয়ে। বঙ্গ বলতে বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানের

অধিকাংশ অঞ্চল বোঝায়। পুণ্ড্র গঠিত হয়েছিল বর্তমান রাজশাহী, দিনাজপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি নিয়ে।[৮] অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ উত্তরবঙ্গের একটি জনপদ। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রাচীন বাংলার রাজধানী হিসাবে পুণ্ড্রবর্ধনকে চিহ্নিত করেছেন।[৯] খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সোমদেব রচিত 'কথাসরিৎ সাগর' গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন নগরকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী, সমৃদ্ধ ও সজ্জন ব্যক্তিদের আবাস্থল হিসাবে উল্লেখ হয়েছে।[১০] পুণ্ড্রবর্ধন নগরটি অবস্থান করেছিল করতোয়া নদীর তীরে। মহাভারতের যুগে করতোয়া (সদানীরা) পবিত্র নদী হিসাবে মান্যতা পেয়েছে যা উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য নদী বলে ধরা হয়। উত্তরবঙ্গের আর একটি উল্লেখযোগ্য নদী হল তিস্তা। অর্থাৎ এই তিস্তা-করতোয়ার পশ্চিম পাড় থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ বা কামতাপুরের শাসন পরিচালিত হয়েছিল। করতোয়ার পশ্চিমে এবং কোশী নদীর পূর্বপাড়ের অঞ্চলগুলিতে পুণ্ড্রবর্ধনের শাসন কায়েম ছিল বলে মনে করা হয়। প্রাক-আর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত এ অঞ্চলের শাসন কেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড়। আর বাংলার শাসন কেন্দ্র বরেন্দ্র, গৌড় বা আদিনা থেকে আনু: খ্রি: পূ: চতুর্থ শতাব্দী থেকে রাজকার্য পরিচালিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের একেবারে দক্ষিণ সীমায় গঙ্গানদীস্থিত উক্ত বাংলার কেন্দ্র গৌড়, বঙ্গের অনেকটা মধ্যস্থলে অবস্থান করায় মগধ-পাটলিপুত্র সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা মূলত বাণিজ্যিক ও সামরিক জায়গাটিকে উদ্মুক্ত করে।[১১] ফলত বৃহত্তর বাংলার প্রাচীন ইতিহাস উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক বলা যায়। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে রাজতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য উত্তরবঙ্গ যেমন বিবেচিত তেমনি আদি বাসযোগ্য ভূমিস্থান রূপে চিহ্নিত। বাসযোগ্য ভূমিস্থান হিসাবে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের উত্থান অনেক পরে হয়েছে বলে মনে করা হয়। এস সি মজুমদারের *'River Problems in Bengal'* গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে উপেন্দ্রনাথ

বর্মণ বলেছেন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, দিনাজপুরের (পুণ্ড্রবর্ধন) অনেক পরে সৃষ্ট হয়েছে।[১২] আবার নামের প্রাচীনত্ব কথা বললে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ এই নামগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গই সর্বাধিক প্রাচীন।[১৩] স্বভাবতই বলা যায় আদি বাংলার ইতিহাস উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক।

১.২. রাজবংশী পরিচিতি ও ক্ষত্রিয়ত্ব

উত্তরবঙ্গ, পৌরাণিক ভাষ্যে এবং গবেষণায় আলোকে অনার্য সংস্কৃতির সমার্থক বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আর্য ও অনার্যের যৌথ ধারা ক্রমান্বিতভাবে বর্ধিত হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে রয়েছে। সেই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করার উদ্যোগ নিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ বর্মণ। তিনি লেখনীর বিষয় হিসাবে রাজবংশীদের বেচে নিয়েছেন এবং উত্তরবঙ্গ যে আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯৪১ সালে তিনি লিখেন *'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'*। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ভারত পার্লামেন্টের Public Accounts Committeeর চেয়ারম্যান এবং কংগ্রেস রাজনীতির একজন উচ্চপদস্থ সদস্য। তিনি রাজবংশীদের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে পৌরাণিক গ্রন্থ ও তার সঙ্গে ব্রিটিশ আধিকারিকদের লেখনীর উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুণ্ড্রবাসীদের ক্ষত্রিয়চিত গুণ ও কর্মকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন রাজবংশীরা পুণ্ড্র ক্ষত্রিয়। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলে মনু যেভাবে পুণ্ড্রবাসীদের (তা অনুপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) উল্লেখ করেছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন বর্মণবাবু। পাশাপাশি রাজবংশী নামের উৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের ছয়টি গুণ ও স্বভাবের যেমন দাতা, বলবান, হিতকারী, শান্তমন, দেবসেবী ও কৃষিকর্মপজীবী কথা উল্লেখ করেছেন।

লিখেছেন: 'যাহারা রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন, রাজবংশী জাতির এই ছয়টি গুণ পরিস্ফুট'।[১৪] অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্ষত্রিয়ভাবের বর্ণনা বর্মণের লেখাতে উঠে এসেছে। দাতা, বলবান, হিতকারী, শান্তমন এই গুণগুলিকে তিনি ভাবের প্রকাশ বলেছেন। এই জন্যই হয়ত বলেছেন রাজবংশীদের সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার কথা। শেষোক্ত লক্ষণ দুটির ব্যাখ্যাতে তিনি ধর্মীয় বিষয়টি উপর জোর দিয়েছেন। কৃষি কর্মকে 'আপদধর্ম' হিসাবে তুলে ধরার মধ্যে আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের। আর্য সংস্কৃতিতে কৃষিকাজকে অবহেলার জায়গা থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই নিরিখে ক্ষত্রিয় জীবন থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে রাজবংশীরা কৃষিকাজকে পেশা হিসাবে বেচে নিয়েছেন। এই বয়ান ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের জায়গাটাকে উদ্মুক্ত করে। দেবসেবা রাজবংশীদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ বলে মনে করেন। রাজবংশী দেবতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১. গ্রাম্য দেবতা, ২. পারিবারিক দেবতা। গ্রামে যৌথতায় গ্রাম্য দেবতার পূজার রীতি বোধহয় বেশ পুরানো যার রেয়াজ পরম্পরায় বর্তমান লক্ষ করা যায়। মাসান দেবতার পূজা, সন্ন্যাসী দেবতার পূজা এবং মনসা পূজা মূলত গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে কোচবিহারে লক্ষ করা যায়। উক্ত দেবদেবীকে অনার্য দেবতা বলে মনে হয়।[১৫] মাসান দেবতার পাশে 'পাগেলাপীরের ঢিপি' এবং বাড়ির উঠানে 'সত্যপীরের স্থান' হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সম্প্রতির এক দৃষ্টান্ত রাজবংশী সমাজে লক্ষণীয়। গিরিজাশংকর রায় পাগেলাপীর এবং সত্যপীরের পুজার রেয়াজ লক্ষ করেছেন স্বতন্ত্রভাবে।[১৬] সময়ের নিরিখে উক্ত পুজা বর্তমানে পারিবারিক ও গ্রামীণ পুজার আসন গ্রহণ করেছে বলে মনে করেন। মধ্যযুগে বঙ্গে মুসলিম শাসনের ধারা বজায় থাকলেও উত্তরবঙ্গে বিশেষত কামতাপুর বা কোচবিহারে

হিন্দু শাসন উত্তর-উপনিবেশিক কাল পর্যন্ত বিরাজ করত। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন -

> ‘সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও কোচবিহার ও ত্রিপুরা যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ন ভূভাগে বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপে অবস্থান করত এবং শক্তিশালি মুসলমান রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয়েছিল। এই দুই রাজ্যে ফার্সির পরিবর্তে বাংলা ভাষাতেই রাজকার্য নিবার্হ হইত’।[১৭]

উত্তরবঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজের অস্তিত্ব মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয় স্বরূপ। অন্যভাবে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে মুসলমান সমাজের যোগাযোগ এই দ্বান্ধিকতার পরিবেশ ধরে গড়ে ওঠে। তার প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় ইখতিয়ারউদ্দিন বক্তিয়ার খিলজীর অভিযানে (১২০৬)। নদিয়া ও লখনউতি জয়ের দু বছর পর তিনি তিব্বত অভিযানের সঙ্কল্প নেন। কামরূপের উপর দিয়ে তার এই অভিযান স্থানীয় সমাজে এক সঙ্কট তৈরি করে। সঙ্কটের জায়গাটি ধর্মান্বিত হওয়ার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বক্তিয়ার স্থানীয়দের মধ্যে একজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তার নাম রেখেছিলেন আলি বক্তিয়ার।[১৮] সেই থেকে উক্ত অঞ্চলটিতে মুসলিম সংস্কৃতির স্থান পায়। উত্তরবঙ্গে মুসলিম সমাজ আর্বিভাবে জন্য সুফী সাধকদের অবদানকে অনেকাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। জোর করে স্থানীয়দের ধর্মান্বিত করার প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে মনে করা হয়।[১৯] এই ধর্মান্বিত মুসলমানদের একটা বড় অংশ ‘নস্য শেখ’ নামে পরিচিত। বলা হয় এরা বর্তমান রাজবংশীদের বংশধর।[২০] ফলত রাজবংশী প্রশ্নটি অসমস্বত্বের ধারণাকে

প্রকট করে থাকলেও আমরা সীমিত পরিসরের আলোচনাতে নস্যশেখ বিষয়টিতে আলোকপাত করা থেকে বিরত থাকব।

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ রাজবংশীর পরিবারিক দেবতার চিহ্ন হিসাবে বাস্তুদেবতা ও তুলসীর স্থানকে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'উক্ত তুলসীমঞ্চে প্রতিদিন ইস্টদেবতা স্মরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হিসাবে সকলেই করিয়া থাকে'।[২১] প্রত্যেক রাজবংশী পরিবারে তুলসীমঞ্চ এবং সেখানে যাবতীয় পুজানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই থাকার অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন গিরিজাশংকর রায়।[২২] বর্তমান তুলসীমঞ্চে পাশে ছোট্ট একটি মাটির ঢিবি লক্ষ করা যায় যাকে সত্যপীরের ঢিবি বলা হয়। এই পুজার উপকরণ হিসাবে কাঁচা দুধ, মালবক কলা এবং চিনি দেওয়ার রীতি রয়েছে যাকে বলে ছিন্নি।[২৩] এমনকি এই তুলসীমঞ্চে একটি দণ্ডায়মান বাঁশের চূড়ায় লাল ও সাদা রঙের পতাকা উড্ডয়ন হতে দেখা যেত। এই পতাকাটি রাম ভক্ত হনুমান এর প্রতীক ধরা হয়।[২৪] পৌরাণিক কল্পকাহিনীর বাস্তবায়ন আমাদের বুঝতে সাহায্য করে উক্ত অঞ্চলে সমাজ গঠনের প্রভাবকে। অর্থাৎ আমাদের দেশে যে সব তথ্যের সূত্র ধরে ইতিহাস রচনা হয়েছে তার প্রাচীনতম সংকলন রয়েছে ধর্মে।[২৫] রণজিৎ গুহ মনে করেন প্রভু ও অধীনতার সনাতন সম্পর্কের সব বিশিষ্ট মুহূর্ত ধর্মে গ্রথিত রয়েছে কর্তৃত্ব, সহযোগীতা আর প্রতিরোধের নিয়মে। এমন নিয়মের মূলে আছে কিছু ক্ষমতার বিধান, ইতিহাসে তার উচ্চারণ স্পষ্ট। অতীত পরম্পরায় বর্তমানকে উপস্থাপন আদতে উৎপাদন করে নতুন নতুন ঘটনাবলি যা রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠেছে। উদাহরণ হিসাবে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ তারই অভিব্যক্তি বলা যায়। সেই নিরিখে পৌরাণিক কাহিনী পারিবারিক হয়ে ওঠা ও তার প্রচলন ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গে পরিণত করে ব্যবহারিক জীবনে মিশে থাকবে এমনটা

না হওয়ার অসম্ভাবনা কোথায়! আবার রাজবংশী অধ্যুসিত অঞ্চলগুলিতে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা যেমন ‘কুশানগান’ বা ‘যাত্রাগান’ পারিবারিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই গানের শ্রোতাবৃন্দ মূলত রাজবংশীরাই। উক্ত অঞ্চলগুলিতে অন্য কোন বিনোদনের সেরকম জায়গা না থাকায় গ্রামে গ্রামে এই গানের আসর বসত। সেইদিক থেকে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ বা হনুমানের জীবন ধারা তাদের আর্দশায়িত ভাবনার জন্ম দিতে পারে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে জনতা পার্টির প্রভাব উপরিউক্ত আর্দশের প্রতিফলন বলা যায়। আবার কৃষিনির্ভর রাজবংশী সমাজ যে সমস্ত দেবদেবীর কল্পনা করেছেন তা বিশেষত চাষবাসকে ঘিরে অথবা শিবকে কেন্দ্র করে।[২৬] অর্থাৎ আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণ ও তার স্বীকৃতি রাজবংশী সমাজকে পুষ্ট করেছে বলা যায়। অন্যদিকে দেবপূজায় রাজবংশীদের দৈনন্দিন জীবনে যে ঘনিষ্ঠতা উপেন্দ্রনাথ বর্মণ উল্লেখ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বক্তব্যে। তিনি লিখেছেন: কামরূপবাসীরা দেবপূজক ছিলেন তবে বৌদ্ধ ধর্মে তাদের বিশ্বাস ছিল না।[২৭] বর্মণবাবু ‘মিথ ও ইতিহাস’ বা ‘পুরাণেতিহাস’ উল্লেখ করে বলেছেন ধর্মাচরণে রাজবংশীগণ উচ্চবর্ণের আর্য অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। সাংস্কৃতিক পরিচিতির জায়গা থেকে আর্য বা অনার্যের প্রশ্নকে প্রকট করার যে উদ্যোগ উপেন্দ্রনাথ বর্মণ শুরু করেছিলেন তা আমাদের অভীষ্ট নয়; বরং আমাদের আলোচ্য সন্ধর্ভটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে রাজবংশীদের অবস্থানকে।

ক্ষত্রিয়ের গুণ অনেকটাই যোদ্ধা যা বলশালীর সমর্থক। পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব মগধাধিপতি জরাসন্ধের কাছাকাছি ছিলেন। বাসুদেব ও জরাসন্ধ উভয়ে পরাক্রমশালী শাসক হিসাবে বিবেচিত। তার কিছুটা ইঙ্গিত মহাভারতে স্পষ্ট। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অনুসরণ করে দিয়ে বলেছিলেন বহু প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধের

সহায়ক এবং জরাসন্ধ থাকলে বর্তমান রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়।[২৮] উপেন্দ্রনাথ বর্মণ মনে করেন পাণ্ডবদের কাছে বাসুদেবের পরাজয়ের পর থেকে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা ক্ষাত্রচিত উন্নত গুণাবলী থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং জরাসন্ধ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের তুলনায় হীন ছিলেন না। বেদব্যাস জরাসন্ধের ব্যক্তিগত যে গুণাবলী কথা ব্যক্ত করেছেন তার নিরিখে তিনি জরাসন্ধকে ক্ষত্রিয় বলে বিবেচিত করেছেন। বেদব্যাস লিখেছেন--

> 'হে রাজন! বৃহদ্রথপুত্র রাজরাজেশ্বর মহাবল পরাক্রম জরাসন্ধের এই ব্রতের কথা ভুবনবিশ্রুত, যে তাঁহার সকাশে কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে, তিনি অদ্ধরাত্রেও গাত্রোত্থান করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের সম্বোধনা করিতেন'।[২৯]

মহাভারতের যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের থেকে পৌণ্ড্রদের বিচুত্যি উপেন্দ্রনাথের উপরিউক্ত বয়ান অনেকটাই মনু'র 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' অনুরূপ। তাহলে জরাসন্ধ্রের প্রতি অনার্য তকমা পক্ষপাতিত্বের রোষে দুষ্ট। বিজিতের ওপর বিজেতার গুণগান করা অসম্ভব নয় এই কারণে বোধহয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের পক্ষ নিতে দেখা যায়। আর তারই প্রবাহ পরবর্তী পুরাণ কথাতে ধারাবাহিক ভাবে ফুটে উঠেছে। বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থায় কর্ম ও গুণ সহজে অধঃপতিত হতে পারে। এই নিরিখে পৌণ্ড্রদের অবস্থান মহাভারতের যুগে পতিত হওয়া কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ এই পতিত পৌণ্ড্রদের সঙ্গে পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছেন। মহাপদ্মনন্দ দ্বিতীয় পরশুরাম নামে পরিচিত। তার সময়ে পৌণ্ড্রবাসীরা দিনাজপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ছেড়ে রত্নপীঠে আশ্রয় নিয়েছিল। আধুনিক কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুর জেলা রত্নপীঠের অন্তর্গত। প্রাচীন

কামরূপের শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- সৌম্যারপীঠ, কামপীঠ, সুবর্ণপীঠ এবং রত্নপীঠ।[৩০] পৌণ্ড্রদের এই অভিপ্রায়ণ 'পালিয়া' বা পালে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া এই নামে পরিচিতি। তারই নিদর্শন দেখা যায় নৃতাত্ত্বিক রিজলীর 'Tribes and Caste of Bengal' এ। কোচ, রাজবংশী ও পালিয়াদের তিনি এক বংশভূত বলে মনে করেন এবং এদের দ্রাবিড় জাতি উল্লেখ করে মঙ্গোলীয়দের প্রভাব লক্ষ করেছেন।[৩১] পালিয়ে যাওয়া থেকে নতুন জাতির পরিচিতি লব্দ উপাধি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় মর্যাদা প্রাপ্তির অনুরূপ বলা যায়। পুণ্ড্রবর্ধন থেকে মহাপদ্মনন্দের ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য পণ্ডিত রূপনারায়ণ শ্রুতিধরের 'কামতেশ্বর কুলকালিকা' নামক এক অসমীয়া ভাষায় লিখিত গ্রন্থে--

"মহানন্দিসূত নন্দ বৌদ্ধ রাজা সদা মন্দ,
ধ্বংস করে ক্ষত্রবংশ তিনসপ্তবার। সেই গোটা ভূজ-বলে,
যুঝিলেন্ত অবহেলে,
দ্বিতীয় পরশুরাম যিতু অবতার।।
ছিঁড়য়ে গলায় দড়ি ক্ষাত্র চিহ্ন লুপ্ত করি,
প্রাণ ভয়ে ইতি উতি পলান্ত সকলি"।[৩২]

আবার ভ্রামরী তন্ত্রে বলা হয়েছে--

"নন্দীসুত ভয়াত্তীরে পৌণ্ড্রদেশানাদ্ সমাগতা।
বদ্ধণস্য পঞ্চপুত্রা স্বগনৈবান্ধবৈঃ সহ
রত্নপীঠং বিবাসন্তে কালাদ্ বিপ্রসংমাত।
ক্ষাত্রধর্মাদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতা ভুবি"।।[৩৩]

উপরিউক্ত শ্লোকে উপর ভিত্তি করে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ রাজবংশী ও পৌণ্ড্রবাসীদের এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন।

১.৩. অধিকারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ রাজবংশীদের নিজস্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করার পর ক্ষত্রিয়ত্বের অভাবে কিছুটা আচরণের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্ব অভ্যাস সংকোচিত হলেও একেবারে পরিত্যাগ করেননি এমনটাই আভাস লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্যচিত অভ্যাস রত্নপীঠে পুনারাম্ভ করার উদ্যোগ একপ্রকার বর্ণবাদী সমাজের অনুপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শূন্যস্থান তাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা নির্মাণের দিকে নিয়ে যায়। এই নব-নির্মিত প্রস্তুতি উপস্থাপন করে নতুন জাতি পরিচিতিকে। রাজবংশীদের থেকে উদ্ভূত উক্ত পরিচিতি 'অধিকারী'[৩৪] নামে ব্যপ্ত হল। সমাজে এরা 'দেশী ব্রাহ্মণ' বলেই স্বীকৃত। চারুচন্দ্র স্যান্যাল 'অধিকারী'দের 'ঐশ্বরিক ধর্ম সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৫] অর্থাৎ রাজবংশীদেরই একটি অংশ 'অধিকারী' উপাধিতে ভূষিত হল। ব্রাহ্মণের কাজে যার অধিকার আছে তিনিই 'অধিকারী'। যদিও সাধারণ দেবার্চ্চনা ছাড়া বিশেষ পুজার্চ্চনা করতে তাদের দেখা যায় না; বিশেষত দূর্গা পুজা ও সরস্বতী পুজায়।[৩৬] উপেন্দ্রনাথ বলেছেন বেদমন্ত্র পাঠ করে যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করতে তারা সাহস দেখাতো না। সেই জন্য যজ্ঞক্রিয়া যে সমস্ত অনুষ্ঠানে একান্ত প্রয়োজন, সেই সমস্ত ক্রিয়া অচলিত হয়ে গিয়েছিল।[৩৭] এই যুক্তিতে তিনি রাজবংশী এবং ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। যদি রাজবংশী অধিকারীদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের জায়গা থেকে উৎপত্তি হয় তাহলে বলা যায় একটি নতুন জাতি বা ব্রাহ্মণ জাতির উদ্ভবের সম্ভবনা প্রকট করে রাজবংশীরা। জাতির জায়গাটি প্রথমত মর্যাদার নিরিখে সমাজে

নির্ধারিত হয়েছে। কারণ ব্রাহ্মণের অভাবহেতু 'অধিকারী' ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার মধ্যে সমাজের স্বীকৃতি ও তার প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্ত। আবার স্বীকৃতির মধ্যে সামাজিক মান্যতা লাভ করে। সমাজের অনুমোদন বিষয়টি উপেন্দ্রনাথ বর্মণ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন- 'সমাজের মধ্যে সাত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি সকলকে উপবীত দিয়া ব্রাহ্মণের করণীয় কার্যে অধিকারী করিয়া তাহাদের 'অধিকারী' এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল'।[৩৮] সমগোত্রীয় সমাজের কাউকে আকস্মিকভাবে নতুন উপাধিতে ভূষিত করা এবং সেই স্থানে তাকে বহাল রাখার জন্য আব্যশিক ছিল ব্রাহ্মণের ন্যায় সন্মান প্রদর্শন করা। এই নতুন আচরণ একটা সময় মনে হয় অধিকারীকে চাষি জীবন থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ করে তোলে। পূজার্চ্চনা এবং ব্রাহ্মণের কার্যক্রম আত্তীকরণ করার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের পরিবর্তন যা 'অধিকারী'র জীবন চর্যায় প্রতিফলিত। অধিকারীর এই অভ্যাস আয়ত্ব করার মধ্যে সাধারণ রাজবংশীদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া কোন ব্যতিক্রম ঘটনা নয়। এতাবৎ গবেষণায় রাজবংশীদের পেশাগত জায়গাটি মূলত কৃষিকাজ ও চাষবাসকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ফলত চাষির সঙ্গে পুরোহিতের জীবন যে এক ঘরনায় আবর্তিত হয়নি কোথাও; তা সহজে অনুমিত। একে আমরা বর্ণ ব্যবস্থার ক্রমবিন্যাস ও তার কাঠামো বলতে পারি। এই বর্ণ ব্যবস্থায় অধিকারীর অবস্থান দেখা যায় দুটি স্তরে বিভক্ত হতে। যথা - ১. চক্রধারী এবং ২. পত্রধারী-পাত্ধারী-কানতুলসী। অধিকারীর এই অবস্থান ক্রমবিন্যাসে বিভাজিত। প্রতিপত্তি, মর্যাদা এবং কর্তৃত্বের প্রশ্নে চক্রধারীর অবস্থান পত্রধারীর উর্দ্ধে বলে মনে হয়। গিরিজাশংকর রায় বলেছেন চক্রধারী নামক অধিকারীর পুজা করার অধিকার ছিল বংশানুক্রমিক এবং তাঁরা শিষ্য গ্রহণে সক্ষম। অপরদিকে পত্রধারীরা এক পুরুষ পুজা করার অধিকারী।[৩৯] স্থানভেদে এদের নামের

বিভিন্নতা রয়েছে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে চক্রধারী ও পত্রধারীরা অন্য জেলাগুলোতে গোঁসাই বা শুধু অধিকারী নামে পরিচিত। চক্রধারীদের উপাধি বংশানুক্রমিকভাবে অধিকারী হলেও পত্রধারীরা পারিবারিক উপাধি যেমন রায়, বর্মণ গ্রহণ করে।[৪০] উত্তরাধিকার সূত্রে চক্রধারীরা অধিকারী পদে আসীন থাকতে পারে কিন্তু পত্রধারীদের সেই ক্ষমতা অর্জন করা একপ্রকার অবস্থার স্তরায়নের পরিচায়ক। পত্রধারীর এই রূপান্তর বর্ণ ব্যবস্থার গুণগত ধারণার বহিঃপ্রকাশ।

১.৪. রাজবংশী সমাজে অধিকারী সম্প্রদায়ের অবস্থান ও সামাজিক জীবন

জাতি ব্যবস্থার অনুপম বৈশিষ্ট্য যেমন জাতি নিজের পরিসরে উপ-জাতি তৈরি করে তার অনুরূপ কাঠামো অধিকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিহিত। সেই অর্থে অধিকারী সম্প্রদায় রাজবংশী জাতি কাঠামের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ উপ-জাতি যার পরিচিতি প্রকাশ পায় পেশাগত চরিত্রে। পৌরিহিত্য করার জন্য বা ব্রাহ্মণশ্রেণির অভাব বশত রাজবংশীদের মধ্য থেকে এদের উৎপত্তির কথা আমরা জানতে পারি উপেন্দ্রনাথ বর্মণের লেখাতে। উৎপত্তির পরবর্তীতে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও কৌলিন্য বজায় রাখতে বিভাজিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই বিভাজন সামাজিক আচরণে চলে আসে যেমন খাওয়া পরা ও বিয়েসাধিতে। সাধারণ রাজবংশীরা 'অধিকারী'র ঘরে আত্মীয় করার বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করেন। আজও সাধারণ রাজবংশীদের মুখে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোনা যায় *'ঠ্যাং তোলার (অধিকারী) ঘরত সাগাই (আত্মীয়) না করি'*। 'ঠ্যাং তোলা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হতে পারে শৌখিনতা বা অহংকারি। ব্রাহ্মণের পেশাটিকে রাজবংশীরা দেখেছেন শৌখিন হিসাবে। শারীরিক শ্রমের জায়গাটি পুরোহিত সমাজে অনুপস্থিতি থাকায় কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজ তাঁদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ

করে। উৎপাদনের সাথে ব্রাহ্মণদের যুক্ত না থাকার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা রাজবংশী সমাজ খুব ভাল ভাবে নেয়নি। পারিবারিক গল্পগুজবে শুনতে পাওয়া যেত *'কিসসানের গামলা কাম হবে সামলা'* (একজন কিষাণ বা দিনমজুর যত বেশি খেতে পারবে সে তত বেশি কাজ সামাল দিতে পারবে)। আর যদি বাড়ির মালিকের পছন্দমত খেতে না পেত তাহলে বলা হত *'বাপোই তুই তো খাবারে না পাইস কাম করবু কি'*? এর অর্থ হচ্ছে বেশি করে না খেলে শক্ত বা ভারী কাজ করবে কি করে? খাবারের পরিমান অবশ্য বাড়ির কর্তার পছন্দের উপর নির্ভরশীল। বেশী করে খেতে না পারার অর্থ করা হয়েছে ভারী কাজ করতে অক্ষম। শারীরিক পরিশ্রম করতে না পারার কারণে বোধহয় সাধারণ রাজবংশীরা 'অধিকারী' ঘরের মেয়েদের বাড়ির বউ করে আনতে চাইত না। বলা হয়ে থাকে *'উমারল্যার ছাওয়াপোয়ার ফুটানি বেশি'* (অধিকারি বাড়ির ছেলেমেয়েদের বিলাসিতা বেশি)। কৃষিকাজ আসলে শ্রমসাধ্য এবং ফসল তোলার মরশুমে তাদের হাতে কিছু পয়সা আসে যা দিয়ে সারা বছরের খাবার সঞ্চয় করতে হয়। সেই সামান্য পয়সা দিয়ে বিলাসিতা করার উপায় থাকে না। অন্যদিকে বিলাসিতা করার লোক যদি ঘরে আসে এবং তার উপর কাজ কর্ম না করে তবে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবে এমনটা ভাবনা প্রকট হয়। চাষবাসের সাথে যৌথ শ্রমের বিশেষত নারী ও পুরুষের একক সহযোগীতার জায়গাটি রয়েছে। নারী পুরুষের একসাথে চাষ করার কথা উঠে এসেছে একটি কবিতায়। *'হালুয়া ভাইরে'* নামক কবিতাটি তুলে ধরেছে--

'ও তমরা নাঙ্গল ধর জোড়ে

মোর হালুয়া ভাইরে

পাটা নেলান, মাকই নেলান আর নেলান ধান,

ওরে পাটা ভাদই কাটিয়ে তমরা ঘরে.....টাকা আনরে।

হাল বহেন, মই জুরেন

আর বান্ধেন আলি,

ওরে মাইয়ায় ছাওয়ায় বিচন তুলিয়া যান....

কাদবাড়ী রে।............'[৪১]

(শব্দার্থঃ তমরা/তোমরা, নাঙ্গল/লাঙ্গল, হালুয়া/যে জমি চাষ করে, নেলান/ক্ষেতের ঘাস তুলে ফেলা, ভাদই/ ভাদ্র মাস, মাইয়ায় ছাওয়ায়/ চাষির বউ ও সন্তানাদি, বিচন/ ধানের চারা তোলা যা জমিতে লাগানে হয়, বান্ধেন/ তৈরি করা, আলি/ জমির আল, কাদবাড়ী/ কাদা মাটি, ধানের চারা তোলা সময় জমিটা জলমগ্ন থাকে। ফলে জলে বসেই ধানের চারা তোলা হয়)

চাষের কাজে স্বামী স্ত্রী শুধু নয় তাদের সন্তানরাও যুক্ত থাকে। পরিবারে তাই *'ফুটানি'* করার কিছু নেই। অধিকারী ঘরে আত্মীয় করার প্রশ্নটি কৃষিজীবী রাজবংশীদের কাছে তাই সেইভাবে প্রতিভাত হয়নি। অন্যথার জায়গাটি লক্ষ করা যায় *'যতই করুক উমাল্লাক আটে না, উমরা পর খাওয়া'* (অধিকারী পরজীবী, ওঁদের ঘরে সারাক্ষণ অভাব লেগে থাকে।) অর্থাৎ শ্রম না করে অন্যের শ্রম ভোগ করার অভিপ্রায় এতে লক্ষণীয়। যা সমাজ খুব একটা ভালোভাবে নেয়নি। তার প্রতিফলন প্রকাশ পায় এদের সাংস্কৃতিক জীবনে। এই ভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘরের বাইরে ঘটলেও তা পারিবারিক করে তোলায় তাদের আপত্তি ছিল। রাজবংশীদের এই জাতি স্তরোন্নতির প্রক্রিয়াটি বঙ্গের নিরিখে একেবারেই ভিন্ন। সমাজের সার্বিক মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'অধিকারী' নামক জাতিটি। তা অবশ্যই রাজবংশীদের মধ্য অগ্রসর শ্রেণি। পূজার্চ্চনার নিয়মাবলী মেনে চলার মত জ্ঞান না থাকলে সর্বসাধারণের সম্মতি আদায় করা সম্ভব নয়। তবে কখনও আসামী ব্রাহ্মণ বা অনান্যা ব্রাহ্মণদের সাথে

অধিকারীদের সংঘাত সেইভাবে চোখে পড়েনি। এমনকি একই অনুষ্ঠানে অধিকারী ও আসামী ব্রাহ্মণদের পূজা রীতি করতে দেখা যায়। কেউ কারো বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাটাই শ্রেয় মনে করে। যাইহোক, অধিকারীর প্রতি এই সম্মতি ব্রাহ্মণস্তরে উন্নীত করার প্রয়াস। চতুর্বর্ণের ধারণায় শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণের অবস্থান ও তার সাথে অধিকারীর অবস্থান হয়তো অনুরূপ হয়ে না উঠলেও রাজবংশী সমাজে অধিকারীর সন্মান ব্রাহ্মণের তুলনায় খুব একটা কম নয়। এই জন্য অধিকারীর পরিবারে আত্মীয় করার কথা কেউ ভাবতে চাইত না। সমাজে প্রচলিত আছে যে, গুরুকে সেবা করা যায় কিন্তু গুরুর প্রণাম নেওয়া সমাজের অকল্যান হিসাবে প্রতিপন্ন। তাই অধিকারীর মেয়েদের কখনও ঘরের বউ করে নিয়ে আসতে চাইত না। অধিকারীর মেয়ে তো অধিকারীই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। তবে অপরদিকে অধিকারীর ঘরে সাধারণ রাজবংশীদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয়তা লক্ষ করা যায়। অধিকারী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেওয়া অনেকটা সম্মানের বলে মনে হয়। কারণ তা না হলে এবেলায় বিষয়টি সরল কেন? উচ্চবংশের ধারণাটি এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এবং সমগোত্রীয় ভাবনাটি ফুটে ওঠে। নতুবা মেয়ে বিয়ে বিষয়টি অর্থ সাপেক্ষ হওয়ার দরুন যে কোন পাত্রে দান করা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তবে সমাজে একসময় 'কন্যাপণ' প্রচলিত ছিল।[৪২] চারুচন্দ্র স্যান্যাল 'কন্যাপণ' নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কন্যামূল্য থাকার জন্য রাজবংশী ভাষায় এই বিয়েকে বলা হয় *'কইনা ব্যাচা'* – অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে মেয়েকে বিক্রি করা। অন্যথায় বলা হয় *'মুই কইনা ব্যাচায় খাচু'* তার অর্থ 'আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি'।[৪৩] অধিকারী ঘরে কন্যার বিয়ে দেওয়া অধিক পণ পাওয়ার সংযোগ থাকতে পারে। কারণ *'ঠ্যাং তোলা'* কথাটির অর্থ অনেকটা অহংকারি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দের ইঙ্গিত দেয়। সেই অর্থে অধিকারী পূজার্চ্চনা করে আর্থিকভাবে

এগিয়ে গিয়েছিল এমনি আভাষ সাধারণ রাজবংশী পরিভাষায় ফুটে ওঠেছে। বর্তমানে সাধারণ রাজবংশী ও অধিকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কঠোরতা হ্রাস পেলেও তার অবশেষ বিনষ্ট হয়নি। পারিবারিক জীবনের প্রচলিত কথা ও আলোচনায় তার অভিব্যক্তি রয়েছে।[৪৪] এই কাঠামোটি বর্ণ ধারণাকে প্রকট করে। ফলত যদি মহাভারতের যুগে 'অধিকারী'র উৎপত্তি হয়ে থাকে উপরিউক্ত অর্থে, তাহলে মৌর্য যুগে বা তার পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তার সুস্পষ্ট বিকাশ ঘটে থাকবে। নরোত্তম কুণ্ডু *'Caste and Class in pre-Muslim Bengal'* এ দেখিয়েছেন প্রাচীন বাংলার জাতিচর্চা বিষয়টি উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক। তিনি প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে স্থানের নিরিখে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন মূলত তার প্রভাবকে বোঝার তাগিদে। উত্তরবঙ্গে এর প্রভাব যথেষ্ট গভীর এবং প্রথম কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় স্থানে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা আর তৃতীয় স্থানে ঢাকা জেলার কথা বলেছেন। অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন শরৎ চন্দ্র ঘোষাল তাঁর *'A History of Cooch Behar'* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন-

> 'It would also seem that before the Aryans settled in southern and eastarn Bengal, other Aryans were living in the neighbouring kingdom of Kamarupa.[৪৫]

এই প্রভাবকে যদি আমরা গুরুত্ব দেই তাহলে উত্তরবঙ্গ থেকে (বিশেষত দিনাজপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা যা পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত) বর্ণের ধারণাটি বঙ্গের অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা থাকছে। কারণ মৌর্য আমলে মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী লিপিতে পৌণ্ড্রবর্ধনকে উত্তরবঙ্গের প্রধান নগর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৬] কুণ্ডু লিখেছেন-

> 'In all centuries from the period of the Guptas to that of the Senas main abodes of Brahmins were in the extreme northern districts (except Derjeeling) of North Bengal, as the largest number of Copper plates has been discovered from these regions. All these plates are records of lands granted in favour of orthodox Brahmins.'[৪৭]

উক্ত বয়ানের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে অধিকারীদের অবস্থান সমাজে বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় এবং সমাজে তাদের অবস্থান পরম্পরা ধরে আজকের দিনেও প্রচলিত ভাবনার মধ্যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। সাম্প্রতিককালে যদিও পূজার্চ্চনার তুলনায় অনান্য পেশায় অধিকারীদের নিযুক্ত হওয়ার প্রবণতা রাজবংশী ও অধিকারীদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতাকে সহজ করে দিয়েছে।

১.৫. রাজবংশী শব্দের অর্থ

উপেন্দ্রনাথের পরিভাষায় পৌণ্ড্রবাসী ও রাজবংশী একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজবংশী শব্দের উৎপত্তিগত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রাজা বা রাজনের সমার্থক অর্থ হিসাবে রাজবংশী কথাটি উপস্থাপন করেছেন। প্রজাবর্গকে পালন করার কর্তব্য থেকে 'রাজা'র প্রসিদ্ধিলাভ। আবার ব্রাহ্মণকে সকলপ্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার নামই হল ক্ষত্রিয়। অর্থাৎ যিনি রাজা তিনিই ক্ষত্রিয়। ফলত 'রাজন' 'রাজা' 'ক্ষত্রিয়' অভিন্নার্থ এবং 'রাজবংশী' শব্দের অর্থ 'ক্ষত্রিয়ের বংশ। আবার তিনি মনে করেন রাজস্থানের 'রাজপুত' জাতিকেই একমাত্র ক্ষত্রিয় বোঝায়। সেই অর্থে পূর্ব ভারতে রাজবংশী বলতে ক্ষত্রিয় বংশকে বোঝায়।[৪৮] ইংরেজ সরকারের নথিপত্রে বিশেষত ডাব্লু ডাব্লু

হান্টারের *'A Statistical Account of Bengal'* এ রাজবংশী শব্দটির ব্যবহারিক আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন--

> 'Rajbansi is an epthet properly applied to persons of the higher caste, such as Rajputs and evidently been adopted by the Koches to corroborate their cherished tradition that they represent the remains of the old Kshatriya caste'.[৪৯]

কোচরাজরা রাজবংশী শব্দটিকে আত্তীকরণ করে নিয়েছিলেন বলে মনে করেন। কিন্তু রাজবংশী জাতি আন্দোলনের প্রধান বিতর্কের বিষয়টি ছিল রাজবংশী, কোচ নহে। কোচ ও রাজবংশী দুটি স্বতন্ত্র জাতি। এই ছিল আন্দোলনের ভাষা। *'উত্তর-উপনিবেশিক কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থান ও সঙ্কট: পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তরাংশের তুলনামূলক আলোচনা*য় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০] তবে বঙ্গের জাতি নামের তালিকায় রাজবংশী নামের উল্লেখ নেই। উপেন্দ্রনাথের লেখাতে প্রথম রাজবংশী নামটি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্তদের অবস্থান দেখা গেলেও ক্ষত্রিয়ের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন বাংলার পালবংশীয় রাজারা কেউ ক্ষত্রিয় ছিলেন না। গোপাল বা ধর্মপাল বা দেবপাল সম্পর্কে কেউ এমন দাবি করেন নি। দশ-বার পুরুষ রাজত্ব করার পর একজন রাজা ও তার বংশ ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হবে এ কোন আশ্চর্য বিষয় নয়।[৫১] অর্থাৎ রাজ শাসনের জায়গা থেকে ক্ষত্রিয় হয়ে ওঠার প্রবণতা বঙ্গের লক্ষ করা যায়। যা বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার স্তরোন্নতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে প্রকট করে। উত্তরবঙ্গে জাতিচর্চায় নিম্নবর্ণীয় শ্রেণির শাসক হওয়ার বিষয়টি কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। কৈবত্যদের বিদ্রোহী নেতা দিব্য বা দিব্বোক ও তার বংশধরদেরকে

জাতিগতভাবে অনার্য বলা হয়েছে। তাদের এই ক্ষমতা দখলকে রাজনৈতিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জায়গা থেকে দেখার প্রবণতা রয়েছে। আবার কান্তেশ্বরের গোপাল বালকের কামতাপুরে খেন শাসনের সূচনা[৫২] ঘটার বিষয়টি উপরিউক্ত ঘটনার অনুরূপ। অন্যদিকে কোচদের ভূইফোর অবস্থার থেকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা[৫৩] উপনিবেশিক শাসনের যুগে স্বতন্ত্রভাবে রাজতন্ত্র টিকে রাখা তাদের স্বাধীনতার প্রকাশ যা জন্মান্তরবাদের তাত্ত্বিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে উপস্থাপন করে গতিশীল সমাজের চিত্র।

বাংলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুটি জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি অস্তিত্ব সেইভাবে নেই বললেই চলে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে মোট ৪১টি জাতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। শূদ্রদের এখানে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে ব্রাহ্মণরা তাদের স্থান নির্ণয় করেছে। যথা উত্তম, মধ্যম এবং অধম। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংকর শব্দটি। পরস্পরের মধ্যে অবাদ মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ এদের সংকর শূদ্রে পরিণত করে। এদের নামগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

> (১) করণ (২) অম্বষ্ঠ (৩)উগ্র (৪) মাগধ (৫) তন্ত্রবায় (৬) গান্ধিক বণিক (৭) নাপিত (৮) গোপ (৯) কর্মকার (১০) তৈলিক বা তৌলিক (১১) কুম্ভকার (১২) কংসকার (১৩) শাংখিক বা শংখকার (১৪) দাস (১৫) বারজীবি (১৬) মোদক (১৭) মালাকার (১৮) সুত (১৯) রাজপুত (২০) তাম্বলী (২১) তক্ষণ (২২) রজক (২৩) স্বর্ণকার (২৪) সুবর্ণবণিক (২৫) আভীর (২৬) তৈলকার (২৭) ধীবর (২৮) শৌণ্ডিক (২৯) নট (৩০) শাবাক, শাবক, শারক, শাবার (৩১) শেখর (৩২) জালিক (৩৩) মলেগৃহী (৩৪) কুডব (৩৫) চণ্ডাল (৩৬) বরুড় (৩৭) তক্ষ (৩৮) চর্মজীবি (৩৯) ঘট্টজীবি (৪০) ডোলাবাহি এবং (৪১)মল্ল।[৫৪]

উপরিউক্ত জাতি তালিকায় রাজবংশী জাতির উল্লেখ না থাকলেও রাজপুত নামটি পাওয়া গেছে যা থেকে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ এবং ডাল্টু ডাল্টু হান্টার রাজবংশীদের সঙ্গে

একটা সম্পর্ক দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তবে বৃহদ্ধর্মপুরান বাংলার রাজপুতদের পেশা বিষয়ক প্রশ্নে নীরব থেকে গেছেন। ফলত রাজবংশী নামের উৎপত্তি রাজন থেকে করা হয়েছে। যদি বলা হয় বঙ্গে ক্ষত্রিয় নেই একথা সত্যি হলে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ বঙ্গে রাজ রাজ কাহিনী তো একটিও নেই, যা আছে উত্তরবঙ্গে। সেই অর্থে বোধহয় ক্ষত্রিয় শব্দটি বাংলার অভিধানে স্থান পাইনি।

২. বর্ণ ও জাতির ইতিহাসচর্চার ধারা

বর্ণ ও জাতি শব্দদ্বয় অনেকসময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে কাঠামোগত এবং মর্যদার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য লক্ষণীয়। বর্ণ কথাটি হিন্দুসমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সূচক হলে জাতি তার ব্যপ্তির একটি অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত। বিশুদ্ধতা ও সামাজিক মর্যদার নিরিখে কোন জাতি অবস্থান কোথায় হবে তা বোঝাতে বর্ণ কথাটি ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে জাতি বলতে জাতিগুচ্ছের সমষ্টি যা বর্ণের অবস্থান নির্ণয় করতে সাহায্য করে। যাইহোক, এই পন্থাতে বর্ণ তথা জাতি ব্যবস্থা হিন্দুসমাজের অবস্থানকে ক্রমবিন্যাসে প্রকট করে। বর্ণ ব্যবস্থার এই বিন্যাসগত স্তরভেদকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে দেখার ঝোঁক রয়েছে। প্রথমত, মানুষের গুণগত দক্ষতা যা শ্রমের জায়গা থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জন্মগত অধিকারকে গুরুত্বপ্রদানের মাধ্যমে কাজের জায়গাটাকে একটা নির্দিষ্ট পরিভাষায় সীমায়িত করে তার ধর্মীয় আর্দশের প্রভাবকে পরম্পরার সাথে যুক্ত করে সমাজজীবনকে ব্যাখ্যা করে। এই সার্বজনীন আর্দশের পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা মূলত ভাল মন্দ বা শুদ্ধ অশুদ্ধ'র পরিমিতিতে সীমিত যা একপ্রকার জাতির ভাবজগতকে নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট বয়ানে। সময় ও আঞ্চলিকতা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। জন্মগত

প্রশ্নটি বর্ণ ব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য বিষয়। তার ব্যাখ্যায় উঠে আসে শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা বিচার যা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপরিবর্তনীয়। এই নির্দিষ্ট পরিসরে অবস্থান করে বিভিন্ন জাতিসমূহ। তাদের নির্দিষ্ট কর্মদক্ষতা স্ব স্ব জাতির বিশেষ পরিচিতিকে বহন করে। যা প্রত্যেক জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকের থেকে। সেখানে সময় ও আঞ্চলিক প্রভাব জাতির অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। বিশেষ কোন জাতির কর্মদক্ষতা এবং সসীমতার ব্যাখ্যা হয় সার্বিক পরিসরের জায়গা থেকে। ফলত সেখানে ব্যক্তির বা সমষ্টির গুণবাচক ক্রিয়াকর্মের জায়গাটি একপ্রকার অনুপস্থিত থেকে যায়। জাতি নিজস্বতার গড়নের মুল্যকে (value) উপস্থিত করে থাকলেও অপরের দৃষ্টিতে তা নেতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ অপরের সহচর্যে তার মান বদলে যেতে থাকে। একে exchange value[৫৫]র অনুরূপ বলতে পারি। জাতিচর্চার উপরিউক্ত মেথডলজিক্যাল ইতিহাস মূলত 'সার্বিক থেকে বিশেষ' কিংবা 'বিশেষ থেকে সার্বিক' (from universal to particular and its opposite method) প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়। আমাদের আলোচ্য প্রকল্পটি উপরিউক্ত দুই পদ্ধতিগত ব্যাখ্যাকে সামনে না আনলেও তৃতীয় কোন পদ্ধতি যেমন 'বিশেষ থেকে বিশেষ' (from particular to particular) কে প্রাধান্য দেবে। যা জাতির স্ব চরিত্র প্রকাশে সাহায্য করবে।

জাতির অনমনীয়তা জায়গাটি প্রকাশ পায় অস্পৃশ্যতার মধ্য দিয়ে। জাতিবাচক এই ব্যবধান পবিত্র ও অপবিত্রতার নির্ধারক হলেও তৃতীয় একটা মাত্রা উক্ত দুই সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে নির্মাণ করে মিশ্রজাতির ধারণাকে। তৃতীয় এই জাতির আবির্ভাব পবিত্রতার দৃষ্টি বদল না করলেও নতুন নতুন জাতি উদ্ভবে সাহায্য করে। এই নব-নির্মিত জাতি উদ্ভবকে কেন্দ্র করে এক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কটি মূলত

বিবাহগত বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ঘিরে। এক্ষেত্রে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ককে যথাযত গুরুত্ব দেওয়া হলেও নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *'বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ'* এ মনে করেন মিশ্রজাতি সৃষ্টিতে অনার্যদের সঙ্গে অনার্যের পারস্পরিক মেলামেশা প্রধান ভূমিকা পালন করে।[৫৬] পুরান স্মৃতিশাস্ত্রে অনার্যদের আদিবাসস্থান হিসাবে অরণ্যভূমি প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের অবস্থানের নিরিখে তাদের স্থান যে বেশ অনুন্নত এমনটাই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শক্তিসামর্থ্যের দিক থেকে এই মানদণ্ড বিবেচ্য। ক্রমবিন্যাসের নিচেরতলার সঙ্গে উপরতলার মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য জন্ম দিয়েছে ঘৃণামিশ্রিত সংস্কৃতি যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুন করে নির্মাণ করে শোষণের প্রেক্ষিতে। এই অবদমনকে সামনে রেখে বামপন্থীরা জাতি বিষয়টি 'শ্রেণি'র ধারণায় নিয়ে এসেছেন। সেকারণে স্থানের মৌলিকত্বে 'জাতি' প্রসঙ্গটি একপ্রকার তাদের আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। এমনকি ভারতীয় সমাজে জাতি বিষয়টি সমাজের চরিত্রগঠনের এক অপরিহার্য উপাদান[৫৭] তা তাদের বিবেচিত বিষয় না হয়ে বরং দেখানো হয়েছে 'উপরিকাঠামো'[৫৮] হিসাবে। বামপন্থীরা মনে করেন শোষণের অনুপস্থিতির উপস্থিতি পারে জাতি বিষয়টির প্রসঙ্গকে সমাধান করতে। সেজন্য তাদের আলোচনায় বিশেষত বঙ্গের বামপন্থীদের কাছে জাতিচর্চার জায়গাটি সেরকম গুরুত্ব পায়নি।

জাতি কাঠামোর নিচের স্তরে - অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া - অবস্থানকারী ব্যক্তিসমূহের অবস্থান পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বি আর আম্বেদকর। অনুপমা রাও তার *'The Caste Question'* এ এই উদ্যোগকে 'Political Subject'[৫৯] বলেছেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মাহারদের নিয়ে যাওয়ার এক প্রকল্প নির্মিত হয়েছিল সমতার-নিরিখে। সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আম্বেদকরের অবদান অনেকটা

social upliftmentর অনুরূপ বলা চলে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে জাতি চেতনতার ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ করা যায় পঞ্চানন বর্মার 'ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠা'র জায়গা থেকে। আমরা বর্মার সেই উদ্যোগের দিকে লক্ষ রেখে আলোচনায় অগ্রসর হব।

বর্ণ ব্যবস্থায় উক্ত ক্রমবিন্যাস এবং কাঠামোকে ব্যক্তি বা সমষ্টির গুণগত বৈশিষ্ট্যের সূচক হিসাবে বিশ্লেষণ করার আর এক উদ্যোগ রয়েছে। কর্মদক্ষতা এই বিভাজনের প্রধান মানদণ্ড যা হিন্দু সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতা ও উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল মনে করেন। তিনি লিখেছেন –

> 'The expansion of Aryan culture in the different parts of India had put the indigenous people belonging to the tribe in the hills and forests and the chalcolithic settlements in the confrontation with the Hindu society. The chalcolithic settlements were overpowered by the vanguards of Aryan culture and were subsumed in the Hindu society which was definitely benefited by the technological experience of the chalcolithic culture. The tribal in the hills and forest were gradually exposed to the Hindu society. The settlers of Aryan culture had begun to explore the hills and jungles in search of stone for construction and sculpture, precious and semi-precious stones and above all metal. On their parts the tribals may also have established contact with the Hindu settlements for selling their

wares......Contacts with the Hind society decisively affected the life and culture of the tribes to whom the superior technology and the organized system of production and distribution of the Hindus were definitely attractive and irresistible. The impact of the Hindu society changed the methods of production and distribution of the tribes'.[৬০]

আর্য ও অনার্যের এই পারস্পরিকতা হিন্দু সমাজের মৌলিক ভিত্তি, তৈরি করে উৎপাদন ও শ্রমের এক নতুন পরিবেশ। ভিন্নতার জায়গাটি জাতির রক্ষণশীল মানসিকচিন্তার বদল না করলেও একটা স্বাধীনতার জায়গাকে উন্মুক্ত করে। উৎপাদনের সহজতর কৌশল ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া উভয়কে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করে। এই অবাধ- সংযোগ সত্ত্বেও জাতি তার নিজস্ব আদবকায়দা পরিত্যাগ না করে অপরকে নিজের মধ্যে যুক্ত করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে। তা স্ব স্ব জাতির মৌলিকত্বের প্রকাশ বলা যায়। উভয় উভয়ের সংস্পর্শে আসার ফলে আবির্ভূত হয় নতুন পরিবেশ যা গুরুত্ব প্রদান করে নতুন উৎপাদন কৌশল আয়ত্ব করতে। এই পেশাগত পরিবর্তন নতুন জাতি উদ্ভব করে। এই প্রক্রিয়াটি হিন্দু সমাজের চালিকাশক্তি রূপে কাজ করে। স্তরায়নের কাঠামো ও তার প্রসারণ জাতিবাচক যা চতুর্বর্ণের আর্দশকে উপস্থাপন করে। অর্থাৎ বর্ণ তিন প্রকারের হলেও শূদ্রের অবস্থান চতুর্বর্ণের ধারণাকে প্রকাশ করেছে। এই চতুর্বর্ণ ধারণাটাই অনৈতিহাসিক ও অলীক বলে মনে করেন নীহাররঞ্জন রায়। কারণ এই চতুর্বর্ণের বাইরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম ছিল। প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর উপস্তর।[৬১] ধর্মশাস্ত্রকারেরা জোর করে অবাস্তব উপায়ে

চতুর্বর্ণের মধ্যে এদের স্থান দিয়েছে। ফলত আর্য সংস্কৃতি আর্যোত্তর পর্বে প্রবেশ করলে তাদের কর্মকান্ডের অনেকটাই অনার্যরা গ্রহণ করে থাকলেও নিজস্ব অভ্যাস ও প্রথা প্রকরণ ত্যাগ না করে বরং তার বৈধ্যতা ও স্বীকৃতি আদায় করে। অন্যদিকে বর্ণ ব্যবস্থার কর্ম ও গুণকে আত্তীকরণ করে সমাজবিন্যাসের নীচের স্তরে অবস্থান করে। কারণ বর্ণ বিন্যাসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অবস্থান নির্ণীত হয়েছে কর্ম ও গুণকে প্রাধান্য দিয়ে।[৬২] এই গুণ নির্ধারিত হয়েছে শ্রম ও চিন্তা (Transformation of Soul) রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। যা সম্প্রদায়ের কর্মের উন্নতির সম্ভাবনা প্রকট করে। অর্থাৎ হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল মতে, জাতি ব্যবস্থায় একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত বা শ্রেণি স্তরায়নের নমনীয়তা সমাজকে গতিশীল করে তোলার জন্য বংশগত পরিচিতি খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মৌর্যবংশীয় রাজারা বংশগতভাবে বৈদ্য কিংবা শূদ্র হলেও রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র রাজা থেকে ব্রাহ্মণ, মহাভারতের কর্ণ সূতপুত্র থেকে ক্ষত্রিয় অথবা বাংলার পাল রাজারা ক্ষত্রিয়কুলের নয় বলে মনে করেন নীহাররঞ্জন রায়।[৬৩] তাই হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল মনে করেন ‘there was however a strong tendency to resolve to varna divisions into a hierarchical order.’[৬৪]

আবার ‘মিথ ও ঐতিহাসিক’ এই দুই ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে আর্য ও অনার্যের সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। ‘দাস’, ‘দস্যু’- এই সম্পর্কের প্রধান উপজীব্য। আর্যদের নিকট অনার্যদের পরাজয়কে উক্ত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয়দের সাথে বহিরাগত সম্পর্ক ক্রমবিন্যাসের। অনেকসময় এই পৃথকীকরণ শারীরিক বর্ণনাকে ধরে অর্থাৎ গায়ের রঙ ও বর্ণকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। তবে আর্য ও অনার্য এই দুই বর্ণ ঋগ্বেদের প্রথমযুগে উপস্থিত থাকলেও জাতি বিষয়ক

ভাবনা অনেক পরবর্তীকালের বলে মনে করা হয়। জাতি বিষয়টির উৎপত্তি সম্বন্ধে একমাত্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অন্য উপাদানের কোন যোগসাজুয্যতা প্রমাণ করা হয়নি। এর রচনাকাল ঋগ্বেদের বিক্ষিপ্ত বলেও মনে করা হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তে জাতি কথাটির উৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে--

> 'দেবগন এক আশ্চর্য্য প্রকৃতিসম্পূনপুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়েছিল। সেই পুরুষের দেহ থেকে সৃষ্টির তাবদ পদার্থ উৎপন্ন হল। সেই সর্বহুত যজ্ঞ থেকে ঋক সকল ও সাম সকল জন্ম গ্রহন করেছিল। তাহা থেকে অশ্ব সকল ও দুইপাটি দন্ত বিশিষ্ট অপর সকল প্রানী এবং গো মেষ অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হল। এর মুখ হল ব্রাহ্মন, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় থেকে শূদ্রের জন্ম হল'।'[৬৫]

বলা হয়েছে ঋগ্বেদের অনেক পরে এই অংশ রচিত হয়ে ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। মনুর অভ্যুত্থান এবং মহাভারত লেখার বহু পূর্বে এই সূক্ত রচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এর প্রতিফলন দেখা যায় মহাভারত কিংবা মনুসংহিতাতে। তাতে বলা হয়েছে-

> পৃথিবীব্যপী লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু, পদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন।[৬৬]

জাতিভেদ জন্মগত নয়, সংস্কার মাত্র। জাতি বৈশিষ্ট্য ও গুণ ক্রমবিন্যাসের প্রধান উপাদান যা পরস্পরের স্বতন্ত্র বজায় রাখার মাপকাঠি। গুণ ও সক্ষমতা বিচার উক্ত নির্ধারিত পরিমিতির সীমা অতিক্রম করে অন্য স্তরে প্রবেশের প্রচেষ্টা বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার স্বকীয়তার পরিচায়ক। যা হিতেশরঞ্জন স্যান্যালের বয়ানের অনুরূপ।

হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল জাতি ব্যবস্থার অভ্যন্তরে নমনীয়তার জায়গাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চেয়েছেন উভয় উভয়ের সংস্পর্শে আসার এ এক সরল পথের সন্ধান। তার মাধ্যম হিসাবে কৃষি বা চাষবাস প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি জাতি বিষয়টিকে ক্যাটাগরিক্যালি উপস্থাপন করেছেন। হিন্দু সংস্কৃতি প্রসারে কৃষিজীবী মানুষের সান্নিধ্যে ছিল এর একমাত্র অবলম্বন। যার কারণে উভয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এটি একটি বিশেষ মাত্রা বহন করে। আবার আমাদের সমাজ গ্রাম্য সংস্কৃতির দাবিদার হওয়ার কারণে এক বৃহৎ অংশের মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। তারা শূদ্র বলেই সচরাচর সমাজে পরিচিতি পেয়েছে। সেই অর্থে বৈশ্যরা শূদ্রের সমতুল্য। এদের একটি শ্রেণি (Sreni) কৃষিকাজের তুলনায় ব্যবসাকে অধিক শ্রেয় মনে করে বণিক শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। অথবা কৃষির কোন একটি চাষে কেউ দক্ষতা তৈরি করতে পারলে একটা নতুন জাতির জন্ম দিতে পারত। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় পান চাষে বারুইরা বেশ নতুন কলাকৌশল আয়ত্ব করে বারুই জাতির তৈরি করেন। চাষের সাথে যুক্ত থাকায় তারা আদতে শূদ্র পরিচিতিই পেয়েছিল কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তাদের এই উদ্ভুত চিন্তা স্তরায়নে সাহায্য করে। এই পর্বে শূদ্র এবং অতি শূদ্রের ধারণার বিকাশ ঘটে। বিষয়টি আদতে ক্রমোচ্চতার মাপকাটিতে দূরত্ববাচক। উপরের স্তর থেকে নিচের অবস্থান যতটাই তলিয়ে যায় অর্থাৎ শূদ্রদের পরবর্তী স্তরে যেমন চন্ডাল বা পিশাচদের অবস্থানের কথা বলা হয় তারা ইতিহাসে অতিশূদ্র নামে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত কৃষিকাজের স্তরে যে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারত। কারণ আর্য সংস্কৃতি বিস্তৃতি নতুন অঞ্চলে প্রসারিত হলে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা শূদ্রে পরিণত হত। মূলত চাষবাসের কাজেই করত। ফলত শূদ্ররাই জাতি কাঠামোর বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল বলা যায়। তাই বর্ণ চার প্রকার হলেও জাতির সংখ্যা ততোধিক। আধুনিক

পরিসংখানে ভারতে ৩০০০র উপর জাতি সংখ্যা লক্ষ করা যায়।[৬৭] উপনিবেশিক শাসনের শেষদিকে বাংলায় তপশিলি জাতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৮টি।[৬৮] জাতি অবস্থানের অবনমন বা উন্নয়ন নির্ভর করত প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যক্তিবিশেষের পারদর্শিতা ও তার লব্ধজ্ঞানকে ধরে। এই বিষয়টি সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল উঁচুজাত থেকে নিচুজাতের স্তরে। আদিম ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন উপকরণ আত্তীকরণ একপ্রকার আর্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার অর্থ প্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়াই অনার্য জীবনে সামাজিক বৈষম্য উপস্থাপন করে। তৈরি হয় এক দ্বিধাবিভক্ত নতুন পরিসর সেখানে দেখা গেল আর্য সংস্কৃতি সঙ্গে অনার্যদের মান্যতা সমান লয়ে না হয়ে বরং কিছুটা গ্রহণ বা সামান্য বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হতে। এই প্রক্রিয়াই অবশেষে মান্যতা পেল যারা আর্যদের কলাকৌশল আয়ত্ব করে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে গেল অথবা ব্রাহ্মণদের কিছুটা সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেল। এটি তাদের সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধির সূচক। আর যারা তাদের আদিম কৌলিন উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রেখে জীবন-নির্বাহ করত তারা সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উভয়দিক থেকে তাদের নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে রইল বলে ধরে নেওয়া হল। অর্থাৎ এক মানদন্ড তৈরি হল কতটা গ্রহণ বা বর্জন করেছে অপরের (ব্রাহ্মণ) সহচর্যকে। এই উদ্ভূত পরিস্থিতি নব-নির্মাণ করে হিন্দু সমাজের জাতি ব্যবস্থার প্রসারতাকে এবং একই সঙ্গে তার প্রগতিকে এমনটাই মনে করেন নির্মলকুমার বসু।[৬৯] এই গ্রহণ বর্জনের ধারাটি মূলত আর্য সংস্কৃতির প্রশ্নে বিচার্য। সেখানে অনার্যদের সংস্কৃতি কথা উঠে আসতে দেখা গেল না। আমরা আলোচ্য সন্দর্ভে উঠে না আসা সংস্কৃতির ধারাটি ধরে রাজবংশীদের প্রতিরোধের জায়গাটি উপস্থাপন করব যা রাজবংশীর আদি অবস্থানকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং তাদের নিয়ে এতাবৎ হওয়া গবেষণার জায়গাটি কীভাবে বিবেচিত করা হয়েছে তার ভাবনাকে

প্রকট করতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ নব-নির্মিত রাজবংশীদের অবস্থানকে সামনে রেখে বস্তুবাদী ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বা বিচ্ছেদের ব্যাপারে অগ্রসর হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলি। সেকারণে আমাদের আলোচনার প্রারম্ভিক পর্বে রাজবংশী প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

হিন্দু সমাজের জাতি ব্যবস্থার মধ্যে পিছিয়ে থাকা (অর্থনৈতিক ভাবে) জনসমষ্টির মধ্যে এর ফলে গড়ে ওঠে একপ্রকার ঐক্য ও স্বাধীনতার ধারণা। যা প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেকে ধরে রেখে অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হয়ে ওঠার মানসিকতা গঠন করে। একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের এটি একটি অন্যতম উপায়। এই দ্বিবিবিধ সূত্র ধরে হিন্দু সমাজ এমন এক প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠা করে যা ব্রিটিশ পর্বে এসে নতুন ভাবে আবির্ভূত হয়। নির্মলকুমার বসু তার অনবদ্য রচনা *'হিন্দু সমাজের গড়ন'* এ বলেছেন মধ্যযুগে শহরাঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে হিন্দু সংস্কৃতির শিল্পকলার জগতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে থাকলেও গ্রাম্যজীবনে তা প্রায় অখুন্ন ছিল। এমনকি মুসলিম সমাজে বর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব তিনি লক্ষ করেছেন। অভাবনীয় এই সংস্কৃতির পরিবর্তন দেখা গেল ব্রিটিশ সংস্কৃতি আবির্ভাবে। ইউরোপীয় কলাকৌশল আয়ত্ব করার মধ্য দিয়ে একপ্রকার বর্ণ ব্যবস্থার পেশাগত জায়গাটিকে আলগা হতে সাহায্য করে। বর্ণহিন্দুদের প্রথমার্ধে ইউরোপীয়দের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার ঘটনাটি চিরাচরিত প্রথা-প্রকরণ বি-নির্মিত করতে থাকা বিষয়টি আবার বর্ণহিন্দুদের নতুন করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। যাকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসরতা বলে তিনি মনে করেন। এই ঐক্যসাধনে বাঙালিদের 'বাংলা ভাষা' প্রধান উপজীব্য ভূমিকা পালন করে বলে পার্থ চ্যাটার্জি মনে করেন।[৭০] জাতির স্বতন্ত্রতার বিচারে 'ভাষা' প্রধান সহায়ক উপাদান

হিসাবে প্রতিপন্ন হল। ভাষাগত ঐক্য আধুনিক জাতি-নির্মাণ করতে সাহায্য করে। ফলত নির্মলকুমার বসু উক্ত বয়ান তথা ব্রিটিশ যুগে জাতি কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হল এই বোধের আড়ালে যে জাতিবাচক উপাদান সংপৃক্ত ছিল তা তার আলোচনাতে উঠে আসেনি। ইংরাজি ভাষার অভ্যন্তরে বাঙালিদের 'বাংলা ভাষা' তাদের সংঘবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করলেও সেই ভাষার আর তার পুরানো অবস্থায় (Traditional way) না থেকে পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। এই রূপান্তরের জন্য উপনিবেশিক সরকারের বৌদ্ধিক জগত এবং সামাজ্যবিস্তারে তাদের সাংগঠনিক কৌশল ও বুদ্ধিমত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে অনেকটাই ভারতীয় এলিট গ্রুপ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যারা যুক্তির বিচারে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ঠ ছিলেন। যুক্তিবাদের ধারণায় ঐতিহ্যের রূপান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তারা একপ্রকার উপনিবেশিক সরকারের নতুন নতুন টেকনিক ও কলাকৌশলকে আত্তীকরণ করে তা ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এতে সমাজের যা অদল বদল ঘটল তার দ্বারা এক নতুন পরিসর সৃষ্ট হল সেখানে ভাষার আধুনিকরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় তথা বাঙালিদের প্রতিরোধের প্রশ্নটি বিকাশ লাভ করল। নতুন সৃষ্ট পরিসর প্রতিরোধ থেকে ব্রিটিশ বিরোধীতা যেমন প্রকাশ পেয়েছিল তেমনি একইসঙ্গে জাতিয়তাবাদী ভাবনার জন্ম দিয়েছিল বলে মনে করেন সুদীপ্ত কবিরাজ।[৭১] অন্যদিকে নিম্নবর্ণীয়দের সরকারি সুযোগসুবিধা প্রদান এবং জাতির রাজনৈতিক অধিকারকে সংবিধানগত (১৯০৯ সালে মর্লে মিন্টো এবং ১৯১৯ সালে চেমস ফোর্ড সংস্কার আইন) ভাবে অনুসন্ধান করার যে উদ্যোগ ব্রিটিশরা নিয়েছিলেন তা জাতি আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণ ব্যবস্থার আভ্যন্তরিণ কৌলিনবৃত্তির গণ্ডি অতিক্রম করার যে উপায় ইউরোপীয়দের হাত ধরে ভারতে স্থাপন

হয়েছিল তা হিন্দু সমাজের কাঠামোতে একটা বড় রকমের অদলবদল নিয়ে আসে যা জাতি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে। তৈরি হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ধারণা, সম্প্রদায়গত বিভাজনের মধ্য দিয়ে। আবার ব্যক্তি পরিচিতির নিরিখে নব-নির্মিত জাতি ঐক্য বর্ণ ব্যবস্থার স্তরায়নের প্রতি নিম্নবর্ণীয়দের আনুগত্য প্রকাশের এক অন্যমাত্রা বলা যেতে পারে। জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থার ক্রমবিন্যাসে আনুগত্যের আবডালে শোষণ ও অবমাননার লক্ষণগুলির প্রতি প্রতিবাদস্বরূপ আন্দোলনের দাবি ও তার চেতনার বিকাশ হিন্দু সমাজের বাইরে বেড়িয়ে যাওয়ার প্রকাশ নয়, তা বলা যায়। বঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এমনটা দেখা যায়নি। আনুগত্য ও অবমাননা এই দুই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত জাতি কাঠামোকে সিভিকসমাজে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছিল আধুনিক প্রশাসনিক আইনের বিধান। একে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে দেখেছেন নিকোলাস বি. ডার্কস তার *'Caste of mind'* এ। তিনি লিখেছেন --

> 'We now know that colonial conquest was not just the result of the power of superior arms, military organization, political power, or economic wealth- as important as these (Caste) things were'.[৭২]

জাতির রাজনীতিকরণ ভারতীয় 'ঐতিহ্য'কে 'আধুনিক' ধারণার ছাচে নতুন করে উপস্থিত করার অভিপ্রায়। অর্থাৎ 'Identity and identification acquire a 'use value' and become a technology of Governance.'[৭৩] এই সূত্র ধরে বর্ণ হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে পশ্চিমীচিন্তার ফল হিসাবে দেখার জায়গাটি উক্ত পরিসরে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় উপাদান জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত না থাকার বিষয়টির মধ্যে নিম্নবর্ণীয়দের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের গলা মেলানো সমস্বরে

প্রতিধ্বনি নয় বলে তিনি মনে করেন। এমনকি তিনি জাতি বিষয়টিকে দেখেছেন ব্রিটিশ শাসনের ফল হিসাবে। অতীত ইতিহাসে জাতি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিষয়টি নির্মলকুমার বসুর কাছে এই রকমটা নয়। ইংরাজি শিক্ষার হাত ধরে যে সংস্কার আন্দোলন বিশেষত রামমোহন রায়রা গড়তে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাতে দেখা দিয়েছিল বর্ণ ব্যবস্থার নিরিখে নতুন এক জাতি উদ্ভবের সম্ভাবনাকে। বসু নিজের বয়ানে লিখেছেন --

> 'নানক, চৈতন্যদেব অথবা রামমোহন ভেদনিতি বর্জন করিয়া যখন সামাজিক সমতা এবং জাতির পরিবর্তে ব্যক্তির গুণ ও কর্মকে সমধিক মর্যাদা দেবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন শুধু ব্রাহ্মণ নহে, আপামর জনসাধারণ তাহাদিগকে বৃহৎ হিন্দুসমাজের মধ্যে নতুন একটি জাতিতে পরিনত করিয়া মহাপুরুষদের সংস্কারচেষ্টাকে পরাস্ত করিয়াছিল। বৈষ্ণব কে আমরা 'বোস্টম' নামক জাতিতে পরিণত করিয়াছি। শিক ও ব্রাহ্ম সমাজকেও আমরা প্রায় একটি 'জাতি'তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলাম, যাহার বিবাহ একান্তভাবে স্বীয় সমাজের মধ্যে আবদ্ধ'।[৭৪]

প্রতিরোধ (Resistance), ঐক্য (Mobility), এবং স্বাধীনতা (Libarty) একই সঙ্গে যৌথতার যে সখ্যতা গড়ে তুলেছিল বর্ণ ব্যবস্থার ক্রমবিন্যাসের মধ্যে, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক জড়তা এবং আধুনিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অবরুদ্ধ করতে না পারার ব্যর্থতা, জাতি কাঠামোর জায়গাটি অনেকটাই ব্রিটিশ ভারতে অন্যরকম ভাবে উপস্থিত হয় বলে তিনি মনে করেন।

প্রাক-ব্রিটিশ পর্বে ভারত তথা বঙ্গে বর্ণ ব্যবস্থায় জাতি চেতনার চেয়ে সম্প্রদায়গত বিষয়টি অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। জাতি আরোহী পদ্ধতিতে সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তি একদিকে উক্ত ব্যবস্থার নমনীয়তার সূচক হলেও অন্যদিকে সামাজিক এই

স্তরোন্নতি বর্ণ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক অনিশ্চলতা কাঠিয়ে ওঠার সংগ্রাম যা জাতি অবস্থার সঙ্গে ক্ষমতা লাভের বিষয়টি যুক্ত থাকে।[৭৫] ব্রিটিশ পর্বে বঙ্গে নতুন জাতি পরিচিতি ও সচেতনার যৌথ প্রয়াসকে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন বহুত্বের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে যা তার ঐতিহ্যকে অনুসন্ধান করতে থাকে। তিনি লিখেছেন--

> 'In a single caste movement we may find a convergence of various trends reflecting the plurarity of a group that had been united in common action through some shared goals or experiences. It was perhaps only when such a convergence occurred that a community could be constructed, in the sense that its boundaries could be more sharply defined. This usually took place through a complicated process and due to multiple influncees, which brought into shaper focus the commonality among that particular group of people, i.e., their lower ritual status–and this articulated their collective self'. This community then invented its own traditions'.[৭৬]

আধুনিকতাকে আবডালে রেখে, ঐতিহ্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আধুনিক জাতি চেতনার জায়গাটি প্রকাশ পায় বলে তিনি মনে করেন। এই ঐক্যতা যতটা ধর্মীয় ব্যাখ্যার দিকে যায়; সেই তুলনায় সম্পদ বা শক্তি (Wealth & Power) সঞ্চয়ের প্রতি ঝুঁকতে দেখা যায় না। সম্পদ বা শক্তি যদি অনুসন্ধানের প্রায়োগিক বিষয় হত তাহলে আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ব করে প্রগতিশীলতার দিকে ছুটে যেতেন। তার নিদর্শন জাতি কাঠামোতে লক্ষ করা যাইনি। ব্রিটিশ আলোকে জাতি জাত্যাগ্রসরণ (upward caste mobility) পদ্ধতিগত ইতিহাসচর্চায় জাতি বিষয়টি অনেকটাই

আধুনিক হিসাবে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ 'caste is a modern phenomenon'.[৭৭] সেই নিরিখে ইতিহাসচর্চার প্রবণতা মনে করিয়ে দেয় জাতি কাঠামোর দুর্বলতাকে। সরকারি দলিলদস্তাবেজ নির্ভর ইতিহাসচর্চায় তিনি দেখতে পেয়েছেন নিম্নবর্ণীয় জাতি আন্দোলনের দুর্বলতা যাকে তিনি 'প্রতিরোধের সীমাবদ্ধতা' বলে চিহ্নিত করেছেন।[৭৮] তিনি মনে করেন ক্ষুদ্র এই প্রতিরোধ যে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রসারিত করে তা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায় হওয়ার কারণে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর্বে এসে হারিয়ে যায়। একই শব্দের প্রতিধবনি আমরা শুনতে পাই স্বরাজ বসুর গ্রন্থে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র স্বরাজ বসুর গ্রন্থটি মূলত রাজবংশীদের উপর লেখা একটি অনবদ্য গবেষণা। তিনি রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে আলোচনার প্রধান বিষয় করে তুলেছেন। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত এই গ্রন্থটি দেখিয়েছে সমিতি জাতি সচেতনার উদ্যোগ সমগ্র রাজবংশী পরিমণ্ডলে ব্যপ্ত না করে বরং বিষয়টি বিকল্পতার নির্মাণ করে। উক্ত বিকল্পলতার বিকাশকে তিনি পর্যালোচনা করেছেন দুই ভিন্ন দিক থেকে। প্রথমত: নেতৃস্থানীয়দের (Elite group among Rajbanshi) অভিপ্রায় ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন; দ্বিতীয়ত: এই সংগ্রামে নেতা মন্ত্রীরা নিজস্ব অবস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁরা একচুয়াল উদ্দেশ্যকে ভুলে যায়। যার কারণে গ্রাম্য জনগণ জাতি চেতনার জায়গা থেকে বরং শ্রেণি চেতনার (Class conscious) মধ্যে নতুন একটা স্বপ্ন দেখতে পেয়েছিল। তাই তিনি লিখেছেন 'the masses in rural areas of North Bengal had hope for a new rule where there would be no oppression'.[৭৯] অর্থাৎ জাতির মধ্যে বস্তুবাদী ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ করে জাতি কাঠামো নিজস্ব ভাবনাচিন্তার জায়গাটিকে স্থুলতায় নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে করেন তেভাগা

আন্দোলন রাজবংশী জাতি রাজনীতিকে ভেঙ্গে দেয়। রাজবংশী জাতির নেতারা একেবারে এক্ষেত্রে নীরব হয়ে পড়ে এবং শ্রেণি ধারণা লয়ে লয়ে বৃদ্ধি ঘটে। তিনি মতামত রেখেছেন রাজবংশী গরীব কৃষকরা রাজবংশী জোতদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলে।[৮০] এতে তাদের এতদিনের বন্ধন ভেঙ্গে পড়ে। দেশভাগকে আলোচনার প্রধান বিষয় করে তিনি এই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন।

৩. রংপুর সাহিত্য পরিষদ: উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী ইতিহাস অনুসন্ধান

উপেন্দ্রনাথ বর্মণের উপরিউক্ত আলোচনায় রাজবংশী জাতিকে ক্ষত্রিয় আখ্যায় ভূষিত করার যে প্রয়াস দেখতে পাই তার একটা বড় অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র বয়ানে। ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রাজবংশীর জাতির ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯১০ সালে পঞ্চানন বর্মার উদ্যোগে বর্তমান রংপুরে (বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠিত হয় এই 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে পঞ্চানন বর্মার উত্তরসূরি হিসাবে উপেন্দ্রনাথ বর্মণের নাম উঠে আসে। পঞ্চানন বর্মার উদ্যোগে নির্মিত সমিতির কার্যক্রম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হত সমিতির বাৎসরিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। এই নথি (Record) রাজবংশী জাতির অতীত তথা বর্তমানের গৌরব প্রতিষ্ঠার এক নির্দশন বলে মনে করা হয়। এই নথি সংরক্ষিত করার প্রচেষ্টা সমিতির প্রতিষ্ঠা কাল থেকে পঞ্চানন বর্মার আমৃত্যু কাল পর্যন্ত (১৯৩৫) করা হয়েছে। সেই নথিকে সাম্প্রতিক কালে 'বৃত্ত-বিবরণী' নামে আনন্দ গোপাল ঘোষ, গিরীন্দ্র নাথ বর্মণ, নিলাংশু শেখর দাস এবং নির্মল চন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয় কলমে বৃত্ত-বিবরণীকে সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের সাফল্য পরাজয়ের

থেকেও পঞ্চাননের স্বপ্ন জীবনের সঙ্গে তাঁর কর্ম সাধনার অনুপম বিবৃতির নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছে।[৮১]

'ক্ষত্রিয় সমিতি' এবং 'রংপুর সাহিত্য পরিষৎ' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা) এর সম্পর্ক ছিল পারস্পারিক। সাহিত্য পরিষৎ অতীতের মিথ, ইতিহাস ও সাহিত্য পুনরুদ্ধারের যে প্রকল্প তৈরি করেন তার বাস্তবায়নে পঞ্চানন বর্মার ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত। ১৩১২ বঙ্গাব্দে ১১ বৈশাখ সোমবার রঙ্গপর টাউন হলে ২৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় রংপুর শাখা পরিষৎ।[৮২] জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি সম্পাদক, মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরি সভাপতি এবং পঞ্চানন বর্মা সহ-সম্পাদক[৮৩] পদে নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক[৮৪] হিসাবে পঞ্চানন বর্মার নাম পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গকে গবেষণামূলক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করা। মনে হয় এই প্রথম উত্তরবঙ্গ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার এক প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস বঙ্গের বৌদ্ধিক সমাজ নিয়েছিল। সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছিল পঞ্চানন বর্মা। আবার বাঙালি সমাজের সঙ্গে রাজবংশীদের একটা দূরত্ব উপনিবেশিক বাংলায় প্রতিভাত হয়। জাতিবাচক অবস্থানকে নিয়ে এই বৈরিতা। পঞ্চানন বর্মার ওকালতি জীবন এবং উপেন্দ্রনাথ বর্মণের ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চানন বর্মার জীবনীকার উপেন্দ্রনাথ বর্মণ লিখেছেন রাজবংশীদের ব্যবহার্য জিনিস উচ্চবর্ণের মানুষ ব্যবহার করতে ঘৃণা বোধ করতেন।[৮৫] রাজবংশীদের প্রতি উচ্চবর্ণের অশুভ আচরণ অনেকটা পঞ্চাননকে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায় বলে উপেন্দ্রনাথ মনে করেন। তবে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের গবেষণা পরিমণ্ডল পঞ্চানন বর্মাকে দিয়েছিলেন অনেকটা দায়িত্ব ও মর্যাদাসূচক পদ। যা তার রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভিকতাকে বুঝতে সাহায্য করে।

অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা বর্মাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রাজবংশীর অতীত জগতকে অন্বেষণ করতে। ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’ স্থাপনের কয়েক বছর পূর্বে স্থাপিত হওয়া ‘রংপুর সাহিত্য পরিষৎ’ পঞ্চাননকে উত্তরবঙ্গকে বোঝার (understanding) ও আবিষ্কার করার সুযোগ করে দেয়। পরিষদ কামরূপ-কামতা, পৌণ্ড্র-বরেন্দ্র, গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ভাষাকে নিয়ে গবেষণামূলক চর্চা শুরু করেছিলেন।[৮৬] উক্ত বিষয়গুলিতে লেখা প্রকাশিত করেছেন বেশ বিশিষ্ট লেখকগণ যেমন অক্ষয় কুমার মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রভাস চন্দ্র সেন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধায়, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, হরগোপাল দাস কুণ্ডু, পঞ্চানন বর্মা প্রমুখ। প্রসিদ্ধ লেখক ও তার সদস্যমণ্ডলীর একটা বড় অংশ জমিদার, জোরদার, মোক্তার, উকিল এবং সকলেই কমবেশি আর্থিকভাবে এগিয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গ মিলিত হয়েছিল রংপুর সাহিত্য সম্মেলনে। নাগরিক সমাজের একটি আর্দশ পরিবেশ রংপুর হওয়ায়, জমিদার জোরদার ও অনান্য পেশার মানুষের কর্মস্থল রংপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এক অর্থে রংপুরকে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির এক অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত করা যায়। অন্যদিকে পরিষদের সদস্যবৃন্দকে ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালির আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্যবিদ্যার চর্চার যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল তার সাথে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ উৎসাহিত ছিলেন। এই বিদ্যাচর্চার হাত ধরে বাঙালিদের উদ্যোগে নির্মাণ হয়েছিল নতুন নতুন সংগঠন। যেমন ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে’র (কলকাতা) অনুরূপ জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রথম জেলা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার অভিপ্রায় থেকে ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ’র উৎপত্তি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের’ প্রধান উদ্দেশ্য হলেও ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ’ বাংলা ভাষা সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী

জাতির কথ্য ভাষাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। এখানেই উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের তফাৎ চোখে পড়ে। তবে রাজবংশী কথ্য ভাষাকে বাংলার উপভাষা বলেই মনে করা হত।[৮৭] সেই নিরিখে বাঙালি আর রাজবংশী দুই ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব স্বীকার না করার প্রবণতা রাজবংশীদের 'বাঙালি' অভিধাতে ভূষিত করা হয়েছিল। একই সঙ্গে স্থানের প্রশ্নটি এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠার স্থপতি ছিলেন শ্যামপুর কুন্ডী পরগনার সদ্যপুস্করিণীর জমিদার সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি। তিনি **১৩১১** বঙ্গাব্দে **১৬**ই ফাল্গুন একটি প্রস্তাব করেছিলেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদের প্রসার বৃদ্ধি এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ প্রাচীন কাব্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় উহার একটি করিয়া শাখা সভা স্থাপিত হউক'।[৮৮] এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সাহিত্য পরিষদের প্রসার বৃদ্ধি উপলক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ রাজধানী কলকাতা থেকে প্রথম রংপুরে সাহিত্য শাখা স্থাপন করার প্রচেষ্টাকে আমরা বাঙালির উপনিবেশিক জীবনের সঙ্গে রংপুরের কিছুটা মিলগত ভাব লক্ষ করে থাকি। কলকাতার ভদ্রবাবুদের পূর্ববঙ্গের একটা ঠিকানা রূপে রংপুর নির্ধারিত হয়েছিল। এমনকি প্রশাসনিক কাজে রামমোহন রায়কে বহুদিন রংপুরে কাটাতে হয়েছিল। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র রংপুরের সাথে যুক্ত ছিলেন, যে যুক্ত থাকাটা সাহিত্য রচনার এক অনবদ্য ভূমি, সাহায্য করেছিল 'দেবী চৌধুরানী' ও 'আনন্দমঠ' সৃষ্টিতে। রংপুর যেমন উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তেমনি জাতি ও বামপন্থী উভয় আন্দোলনের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। রংপুরের এই ইতিহাস বা তার পরম্পরা সাহিত্য পরিষৎ স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ইংরাজি জানা বাঙালি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত থাকলেও ইউরোপীয়দের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁরা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তার মধ্যে যেটুক নিল তাও সে সাজাবার চেষ্টা করল সম্পূর্ণ নতুন একটা ছকে। সেই ছকেই হল 'জাতীয় ইতিহাস'। এই জাতীয় ইতিহাস রচনার সাথে জরিয়ে রয়েছে জাতীয়তাবোধের ইতিহাস।[৮৯] সাধারণত জাতীয়তাবাদকে পশ্চিমী জগতের দান বলে যেভাবে ভাবা হয়েছে বঙ্গের জাতীয়তাবাদ সেই নিরিখে ভিন্ন তার ব্যাখ্যা করেছেন পার্থ চ্যাটার্জি তার *'Nation and its Fragments'* এ। স্থানের পরিসর এক্ষেত্রে একটা বড় কারণ বলা যায়। স্থানের অবস্থান তথা তার জনসমষ্টির আচরণ সার্বজনীন (Universal) ধারণার বাইরে বেড়িয়ে এসে নতুন করে জনমণ্ডলির ঐক্যতার (Ethinic feeling) পরিবেশ তৈরি করে। এখানেই বোধহয় 'পশ্চিমী ধারণা' থেকে স্থানের স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে তার যে উন্নয়ন তা উক্ত ভাবনার থেকে সমভাবে সংযুক্ত হয়নি। যেমন বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা, উপনিবেশিক কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালি বাবুদের সাংস্কৃতিক পরিচিতির আবরণ উদ্মুক্ত করে বাংলা ভাষাভাষি মানুষের সন্মিলিত করতে সাহায্য করে। আর এর সঙ্গে বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ভাষাচর্চার এই আধুনিকীকরণকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে উদ্মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। কলকাতা-কেন্দ্রিক উদ্যোগকে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'র উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে রঙ্গপুর সাহিত্য সভাকে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রচনার থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে পঞ্চানন বর্মার বিশেষ অবদান পরিলক্ষিত হয়। তিনি বাংলা ভাষার পাশাপাশি রাজবংশী কথ্যভাষাকে লেখনীর ভাষা করে তোলেন। যা বাঙালি থেকে রাজবংশীদের এক আসনে বসিয়ে দেখার প্রবণতাকে

ভেঙ্গে দেয়। পঞ্চাননের এই উদ্যোগ থাকলেও কলকাতার অভিপ্রায় ছিল বাঙালির আদিপত্য বৃহৎ বঙ্গের নিরিখে স্থাপন করা। তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে নীচের বয়ানে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতি ভাষণে বলা হয়েছে –

> ‘বাঙ্গালী যাহাতে হাত দিয়াছে, তাহাতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতি যেরূপ অল্প সময় মধ্যে যেমন বহু বিস্তীর্ণ বঙ্গ সাহিত্য গঠিত করিয়াছে, ও তাহাকে অত্যল্পকাল মধ্যেই যেরূপ শক্তিশালি করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কোন জাতি পারিত কিনা, সন্দেহ। এ সকল কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের শৌর্য্য ও রাজত্বলিপ্সা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া নীরব হইতে পারি না। উত্তরবঙ্গেই মহাস্থান গড়, উত্তরবঙ্গে গৌড় ও বারেন্দ্র ভূমি, উত্তরবঙ্গেই পাল-রাজধানী, উত্তরবঙ্গেই কোচবিহার। এই সকল জনপদের উথান-পতনের ইতিহাস মানব তত্ত্বের অঙ্গীভূতরূপে আলোচিত হয়নি; হইলে বঙ্গ সাহিত্যের এক বিস্ময়কর নবীন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইবে। যে সকল শিলালিপি ও স্তম্ভাদি বঙ্গদেশে আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের’।[৯০]

এই নবীন কাজে হাত দিয়েছিলেন পঞ্চানন বর্মা। শুরু হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে রাজবংশীদের অতীত অনুসন্ধানের তাগিদ। সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজবংশীদের নিজস্ব সংগঠন যা ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’ নামে পরিচিতি।

অন্যদিকে ‘রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ’র সীমানা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সীমিত থাকার কথা উক্ত সংগঠনের নামের বয়ানে স্পষ্ট। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গ তাদের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। উক্ত পরিমণ্ডলে বরেন্দ্র-গৌড়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাচীন উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ সীমায় অর্থাৎ পৌণ্ড্র দেশের দক্ষিণ দিকে গৌড়ের অবস্থান। গৌড়কে প্রাচীন বাংলার রাজধানী বলা হয়েছে। পৌণ্ড্রবর্ধন তার

আদি রাজধানী, যা রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলার রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন। মনে হয় এই ভৌগলিক তথা রাজনৈতিক পরিচিতিকে প্রাধান্য দিয়ে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ গৌড় বা মালদাকে উত্তরবঙ্গের অংশ করে তোলেন প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানে। এই রাজনৈতিক ব্যাখ্যার এক বিশেষ মাত্রা রয়েছে। অনেকসময় কামতা-কোচদের আধিপত্য গৌড়ের কিছুটা অংশ দখল করেছিল। বিশেষ করে কোচরাজ নরনারায়ণের সেনাপতি চিলারায়ের (ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) দূরদর্শী যুদ্ধ করার প্রতিভা গৌড় পর্যন্ত প্রসারিত। সেই নিরিখে গৌড় উত্তরবঙ্গের স্থান বলে বিবেচিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব অনুসন্ধানে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' মুলত 'মিথ' এবং 'ইতিহাস'কে আলোচনার বিষয় করে তুলেছে। যেমন পৌণ্ড্র দেশ,[৯১] প্রাক-জোতিষপুর[৯২] বা মালদার[৯৩] প্রাচীন ইতিহাসে 'মিথ' নির্ভরশীল উপাদানই প্রাধান্য পেয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনায় পুরাণস্মৃতির কথা উল্লেখ করে রাজবংশী প্রশ্নের ও স্থানের অতীত উপস্থাপনের যে প্রচেষ্টা রয়েছে তার অনুপম নিদর্শন লক্ষ করা যায় সাহিত্য পত্রিকাতে। সেই অতীত যে অনেকটা গৌরবের বিষয় এমনটাই প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। প্রচলিত ভাষ্যে উত্তরবঙ্গ, 'পাণ্ডব বর্জিত' দেশ হিসাবে বিবেচিত। তবে প্রাক-জোতিষপুরের সঙ্গে মহাভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। অর্থাৎ কিংবদন্তী তার সদোক্তি প্রকাশে কার্যক্রম হলেও আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ আদিম সময় থেকে ছিল বলে মনে হয়। সেই তুলনায় গৌড়ে ঐতিহাসিকতা অনেক বেশি। উপরিউক্ত লেখনীর একটা বড় অংশ প্রাচীন কালের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্গে অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যেমন 'বাঙলার ইতিহাস নাই'- বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সপ্তম সাম্বৎসরিত অধিবেশনের সভাপতি ভাষণের সমস্ত জায়গাটি জুড়ে

এই প্রশ্নটিকে জোরালো করে তোলে। শরৎ কুমার রায় সভাপতি ভাষণে ব্যক্ত করেছেন--

> "বাঙ্গালীর ইতিহাস নেই, এই অপবাদ বহুকালাবধি প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষাবিজ্ঞানপ্রণেতা মনস্বী বিনয়কুমারের তুল্য ব্যক্তিও এই ১৯১২ সালে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে রাজপুত, শিক ও মহারাট্টার কৃতিত্ব অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর ক্রিয়াশক্তি ও চরিত্রবল, বাঙ্গালীর ঐক্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এখনও বিশেষ ভাবে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাই কি? সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই"?
> ৯৪

এর উত্তরে তিনি বলেছেন- 'এই অঞ্চলে (উত্তরবঙ্গে) চেষ্টা করিলে প্রাচীন বাঙ্গালার বহু পুরাকীর্ত্তির সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে'। একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় রঙ্গপুর শাখা সভার পঞ্চম বর্ষের কার্য্য বিবরণীতে। বলা হয়েছে 'কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণ ও রঙ্গপুর শাখা পরিষদের সভ্যবৃন্দ একসূত্রে গ্রথিত এবং একক্ষেত্রেই দণ্ডায়মান'।[৯৫]

১১ আষাঢ়, ১৩১৬ বঙ্গাব্দের অধিবেসনের সভাপতি ভাষণে বলা হয়েছে--

> 'উত্তরবঙ্গ চিরদিনই সাহিত্য আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এইখানেই ভট্ট দিবাকরাত্মজ কুল্লুক ভট্ট, মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট, নব্য ন্যায়তত্ত্ব-বিকাশ-ভাস্কর গদাধর ভট্টাচার্য্য, উদীচ্য চট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ, রত্নমালা ব্যাকরণের রচয়িতা পুরুষোত্তম, ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম, অধিক কি, জগদ্‌বিখ্যাত 'মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ভক্ত চূড়ামণি নরোত্তমদাস, গোবিন্দ মিশ্র প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনায় জগতকে চিরকৃজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও এই প্রদেশেই

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, সাহিত্যালোচনায় জীবনপাত করিয়াছেন। আর এখনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ, কুন্ডীর ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, নলডাঙ্গার ভূম্যাধিকারী শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী, শ্রীমান রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, মৌলবী তসলীম উদ্দিন আহম্মদ প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহিত্যালোচনায় জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইহারা সকলেই উত্তরবঙ্গের। আর, এই উত্তরবঙ্গেই সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা অতি অল্পদিন মধ্যেই সাহিত্যালোচনায় এবং সাহিত্যিক অধ্যাবসায়ের শ্রম স্বীকারে যশস্বী হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গ প্রাচীন দেশ। ইহার উচ্চ ভুমি, ইহার সীমা সংলগ্ন পর্ব্বতমালা, ইহার বিবিধ শাখা ভুক্ত মানব ও ইতর প্রানী, ইহার উদ্ভিজ্জ,- এ সকলই এই প্রদেশকে নানাবিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। এই প্রদেশে মানবজাতির “মংলয়েড়” শাখা ভুক্‌ত জনগণের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যগণ বসবাস করিতেছেন। এই প্রদেশের পার্ব্বত্যগণ “নিগ্রয়েড” এবং সম্ভবতঃ দ্রাভিডিয়ান শাখা ভুক্ত। কখন বা শত্রুভাবে, কখনও বা মিত্র ভাবে, এই বিভিন্ন শাখাভুক্ত মানবের সংস্রব, সংঘর্ষ ও নৈকট্যবশতঃ উত্তরবঙ্গ উৎসাহে, অধ্যাবসায়ে দৃঢ়তায়, ও কর্ম্ম কুশলতার এক বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। সংস্রবে ও নৈকট্যে পরস্পরের জ্ঞানের আদান প্রদানে পরস্পরকে জ্ঞানশালী করিয়া তুলিয়াছে, সংঘর্ষে পরস্পরকে আক্রমণে বা আত্মরক্ষায় বিবিধ যুদ্ধ কৌশলের উদ্ভাবনায় শৌর্য্যে বীর্য্যে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কখন বা সকলকে শান্তি সাম্রাজ্যের ছায়াতলে আনিয়া তাহাদিগকে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য প্রভৃতি কলা কৌশলে ভারত বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহাই উত্তরবঙ্গের উন্নতির মূল কারণ। এ কারণ আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি, তাই ইহাকে স্মৃতিপথে জাগাইয়া দেওয়া অসঙ্গত নহে। এই কারণ অল্পাধিক পরিমানে সমস্ত বঙ্গদেশেই ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে।

কিন্তু সমতল ক্ষেত্রে ও পার্ব্বত্য দেশে প্রভেদ অনেক, অপরাপর জাতির নৈকট্যে ও দূরত্বে প্রভেদ অনেক,-তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তাই উত্তরবঙ্গ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এ গৌরব ইহাকে চিরদিন মহিমান্বিত করুক'।[৯৬]

উত্তরবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বঙ্গের আদি ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস উপরিউক্ত বয়ানে যেভাবে উঠে এসেছে তার প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়েছিল বাঙালিদের হাত ধরে। উত্তরবঙ্গ এবং বঙ্গকে একই আসনে বসিয়ে দেখার প্রবণতা থাকলেও বঙ্গের বাংলা ভাষা ও তাদের কর্তৃত্বের প্রতিফলন দিয়েই লেখনীগুলি প্রকাশ পেয়েছে। ফলত বঙ্গে বাঙালি ব্যাতিত অন্য কেই থাকলেও তার অবস্থান বাঙালির তুলনায় হেয় করে তুলে ধরার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। এই অভিপ্রায়কে বদল করতে না পারলেও পঞ্চানন বর্মা বঙ্গের অভ্যন্তরে রাজবংশী একটি আলাদা সত্তা তার বিষয়টি সাহিত্য তুলে এনেছিলেন। এই সময় থেকে শুরু হয়েছিল বাঙালি আদিপত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের তাগিদ। যা উত্তরবঙ্গে উত্তর-উপনিবেশিক কালে বৈরিতার জন্ম দিয়েছিল।[৯৭] আলোচ্য পর্বের আলোচনায় শোষণ বা বঞ্চনার জায়গাকে প্রকট না করে বরং বঙ্গের জাতীয়তাবোধের বাইরে উত্তরবঙ্গে এক ভিন্ন ধারায় ইতিহাস রচনার সূচনা করেছিলেন পঞ্চানন বর্মা, তা আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠেছিল রাজবংশীদের দৈন্দনিন জীবনের ঘটনাবলী যা তিনি প্রবন্ধ বা গল্প আকারে কিছুটা সাহিত্য পত্রিকাতে উপস্থাপন করেছেন।

বঙ্গের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা যেমন অতীতেকে স্বর্ণযুগের আখ্যায় ভূষিত করে তার গৌরবগাথার স্বপ্নকে বর্তমানের সামনে হাজির করে নতুন করে মূল্যায়ন করতে চায়; তারই অনুরূপ ভাষ্য বিকাশ লাভ করেছে

পরিষদের মাপকাঠিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত বচন 'বাঙলার ইতিহাস নেই'- আদতে কি সে সময় বাংলার ইতিহাস ছিল না! এই কথাটি মনে হয় একেবারে অবাঞ্ছনীয়। তাঁর সময়ে বাংলার ইতিহাস রচনা হয়নি এমনটা বলা যায় না, তবে সেই ইতিহাসে বাংলার গৌরবের কথা নেই।[৯৮] অর্থাৎ উপনিবেশিক পর্বে বাংলার ইতিহাস রচনায় একটা ঝোঁক উক্ত ভাবনার প্রতিফলন হিসাবে ব্যক্ত হয়েছে। কলকাতা-কেন্দ্রিক এই ইতিহাসচর্চার প্রসরতা উত্তরবঙ্গে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ'কে সামনে রেখে নিয়ন্ত্রিত করার হয়েছিল। সেই নিয়ন্ত্রিত রেখা পথে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে বাঙালির গৌরব প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ আদতে বাংলার জাতীয় ইতিহাস রচনার অভিপ্রায়। এই অভিসন্ধি বাংলার আদিপত্য অপর জাতির উপর বসানো হয়েছে। যাকে ধরেই জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে। আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যের উপস্থিতিতেও হারিয়ে যায় না। পরম্পরায় ধরে তা কিছুটা বেচে থাকে। যেমন রাজবংশীরা এখন নিজস্ব আদবকায়দা বা রীতিনীতি ব্যবহার করে যা তার স্বতন্ত্রতার প্রকাশ। বিশেষত তাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা ভাষার থেকে আলাদা বলে অনেকে মনে করেন।[৯৯] বিভিন্ন আর্দশ বা প্রভাবে তার আদিমতা নষ্ট হলেও একেবারে হারিয়ে যায় নি। রাজবংশী জাতির এই প্রথা-প্রকরণ তার সমাজের অঙ্গ, যা সংস্কৃতি নির্মাণে সাহায্য করে। যা বর্তমান কামতাপুরি/রাজবংশীভাষা বলে বিবেচিত, পঞ্চানন বর্মার মতে তা 'কামতাবেহারি ভাষা'।[১০০] তার উপর গান, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্য পরিষৎ এ স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ইতিহাস, দার্শনিক তত্ত্ব সহ বিভিন্ন বিষয়ের অনুসন্ধান। এই ত্রিবিবিধ ধারার সমন্বয়ে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন পঞ্চানন বর্মা। রাজবংশী সমাজের দৈনন্দিন প্রথা প্রকরণ যা প্রচলিত কথায় (Tales), গানে, কিংবা

গল্পে ওঠে এসেছে তা লিপিবদ্ধ করার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন রংপুর সাহিত্য পত্রিকা। এই উদ্যোগে তৈরি হয় রাজবংশী সমাজের আর্কাইভস।

৪. রাজবংশী জাতীয়তা ও পঞ্চানন বর্মা

রাজবংশী সমাজে পঞ্চানন বর্মা 'ঠাকুর'[১০১] হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর অভিধা প্রাপ্তির সংগ্রাম নিছক জ্ঞান বা টেকনোলোজির সমর্থক না হয়ে বরং এক অগছল ভ্রান্তির থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে স্বতন্ত্রভাবে বোধ নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠেছে। এই বোধের মাত্রাকে বাঙালিয়ানা বা পশ্চিমী ঘরনার মধ্য থেকে বিচার করার মানসিকতা নিয়ে যদি ভাবা হয় তাহলে পঞ্চানন বর্মাকে বিনির্মাণ করতে সাহায্য করে। এখানেই তার লিডারশীপের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। এখন আমরা দেখতে চেষ্টা করব কীভাবে তিনি রাজবংশী প্রশ্নটিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনার থেকে ভিন্ন করে উপস্থাপনা করেছিলেন।

বর্তমান উত্তরবঙ্গের জাতি রাজনীতির প্রসঙ্গটি যেভাবে পার্টি পলিটিক্স' এ যুক্ত হয়েছে তা পঞ্চানন বর্মার স্বতঃফূর্ত ভাবনার বিকাশ বলা যায়। জাতি বিষয়টিকে তিনি দুই দিক থেকে ভিন্নভাবে বিবেচিত করে রাজবংশী চেতনার অনুভূতিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। ভিন্ন বিষয় দুটি গুরুত্ব স্থাপন করে কীভাবে এক সংঘবদ্ধ মানসিক অনুভূতির জন্ম দেওয়া যায়। 'ক্ষত্রিয়' নামক ভাষ্যটি এই রকমের একটি মাত্রা যাকে তিনি দিয়েছেন নতুন ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে রাজবংশীদের যুক্ত করে রাজবংশী প্রশ্নটিকে নিয়ে গেছেন জাতি রাজনীতির জায়গায়। ক্ষত্রিয় জাতিবাচক শব্দটি সমাজের একটি প্রাচীনতম স্তর বিশেষ যা জাতি ব্যবস্থার উপরতলার বর্ণের ধারণাকে উপস্থাপিত করে। এই ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে রাজবংশী জাতি চেতনার নব-

নির্মাণ করার একটা সুবিধা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই পথে রাজবংশীদের যুক্ত হওয়ার পরিধি অনেকটা ব্যপ্ত না হলেও[১০২] একটা সাংগঠনিক রূপ পেয়েছিল। যা সংগঠন ও জাতি স্তরোন্নতির ভাবাবেগকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। ক্ষত্রিয় কথাটি জাতি কাঠামোর দ্বিতীয় অবস্থানকে বোঝালেও রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় অবস্থানকে দেখেছিল ব্রাহ্মণদের উপরে।[১০৩] তাদের নতুন করে এই ব্যাখ্যা রাজবংশী ঐক্যবোধের সহায়ক হয়েছিল। 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র এই সাংগঠনিক ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও বৈধতা উভয়েই প্রাপ্ত করেছিল। তার ফলে সামাজিকভাবে রাজবংশীদের পরিচিতি কিছুটা স্থানীয় পরিসর অতিক্রম করে। অনুরূপভাবে রাজনীতির জনপ্রিয় পরিসরে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছিল **১৯১৯** সালের নির্বাচনে। এই দুই কার্যক্রম রাজবংশী সংস্কৃতিকে স্থানীয় পরিসর থেকে তার প্রভাবকে বাইরের সমাজে উদ্মুক্ত করতে সাহায্য করে।

পঞ্চানন বর্মা দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন রাজবংশী প্রশ্নটির কিছু নিদর্শন যা তার অবস্থানকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। প্রচলিত কথা কাহিনী হয়ে ওঠেছিল তার আলোচনার প্রধান বিষয়। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিষয় হলেও তিনি প্রথম রাজবংশী বা উত্তরবঙ্গের স্থানীয়দের ভাষাকে উল্লেখ করেন স্বতন্ত্রভাবে। 'কামাতাবেহারি ভাষার' নামকরণের জায়গা থেকে তিনি বলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন "আমাদের সমাজে ব্যবহিত শব্দগুলো 'পাণিনি ধাতু' নিস্পন্ন সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ"।[১০৪] *'নাদিম পরামাণিকের পাঁঠা'* নামক একটি গল্পের উপস্থাপনাকে ধরে বলতে চেষ্টা করেছিলেন এই সমাজের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিমত্তা, তথা রাজনীতিবিদ্যা, রাজ্যমত্তা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের সমর্থের কথা।[১০৫] অর্থাৎ সমাজের প্রচলিত গল্প কাহিনী হয়ে ওঠেছিল সমাজ পরিচালনার আর্দশ। বঙ্গের জাতীয়তাবাদ যেমন তার

অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠার লক্ষ মাত্রা রেখে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এবং পরবর্তীতে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ' কাজ করতে শুরু করেছিলেন ঠিক অনুরূপভাবে পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী জাতিবোধ নির্মাণ করেছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তিনি মনে করতেন 'কামতাবিহার বঙ্গদেশের সহিত সর্ব্বদা পৃথক থাকিয়া সর্ব্ববিষয়েই উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ সেই কামতারই অঙ্কে স্থাপিত হয়েছিল'।[১০৬] বাঙালির জাতীয় চেতনায় যাতে রাজবংশী জীবন মিলে মিশে একাকার না হয় তার জন্য তাকে 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'র পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পদ ছেড়ে দিয়ে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' তৈরি করতে হয়েছিল। তাই ক্ষত্রিয় সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য একটি ছিল 'জাতীয় জ্ঞানভাণ্ডার ও ইতিহাস'[১০৭] রচনার প্রস্তাবনা। জাতীয় ইতিহাস রচনা শৈলীর জন্য উপাদান সংগ্রহের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছেন। কীভাবে রাজবংশী জাতীয় ইতিহাস লেখা সম্ভব তার রূপরেখাটি হল- ক. পরম্পরাগত পরাণী কথা, খ. রূপ কথা, গ. কিংবদন্তী, ঘ. কথা ও ছিল্কা, ঙ. দেশের পূর্ব্ব কীর্ত্তির চিহ্ন বিবরণ ও তদ্বিষয়ে পরম্পরাগত সংবাদ, চ. পূর্ব্ব চিহ্নের ও পূর্ব্ব ঘটনার নির্দশনের সংগ্রহ।

উক্ত প্রস্তাবিত আলোচনায় বলা হল তথ্যগুলি ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। সংগ্রহ করে একত্র করতে পারলে ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়, জ্ঞানভাণ্ডার সংগৃহীত হয়। এই কাজটি করা কতখানি গুরুত্বপুর্ণ তা ব্যাখ্যা করলেন পঞ্চানন বর্মা সমিতির প্রস্তাবিত পরিসরে। এখানে তিনি বর্তমানের নিরিখে অতীত অনুসন্ধানের পদ্ধতিগত ইতিহাসের ধারণা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। অতীত ও বর্তমানের সংযুক্ত কথোপকথনের মধ্য নিহিত ভাবকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, বর্তমান সমাজের প্রচলিত চিহ্নগুলির মমার্থের জায়গা থেকে। সেখান

থেকে টেনে নিয়ে আসলেন রাজবংশী সমাজের প্রচলিত শ্লককে। যার অর্থ এবং ভাবাদর্শ প্রকাশ করে অতীত গৌরবকে। সেই অতীতের উত্তাধিকারী হিসেবে তাদের অবস্থান আজ কোথায় তা তাঁর মনে এক বিস্ময়ের জন্ম দেয়। তিনি লিখেছেন--

> ‘আমরা এখন গৌরবহীন, দীনবেশী। আমাদের দেশেরও বর্তমান গৌরবের কিছু নাই। কিন্তু আমাদের কতগুলি চিন্তা, ভাবনার, কথা আছে। সেগুলি যেন একালের এদেশের বা এ অবস্থার নয়। আমাদের দেশের কতকগুলি ভগ্নচিহ্ন আছে। সেগুলিও একালের বা এ অবস্থার নয়। চিরাগত সেই ভাব চিন্তা ও কথা অভ্যাসক্রমে পুনঃপুনঃ উদিত হইয়া পুর্ব্বকালীয় মহোজ্জল জ্ঞানের কথা টানিয়া আনে। এদেশের সর্বত্র পরিদৃষ্ট বিপুল ভগ্নাবশেষ পুর্ব্বকালীয় উজ্জ্বল গৌরবের বিপুলা কীর্ত্তির কথা বলিয়া দেয়; প্রাচীন উদ্ভস্বর মাহাত্ম্যের কথা ভাবাইয়া পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া দেয় এবং ব্যাকুল অন্তরে পূর্ব্বাপর কালের অবস্থার তুলনা করাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ায়’।... আমাদের সমাজে ব্যবহৃত ‘কুপিস’, ‘চান্দরী খাওয়া’ প্রভৃতি অন্যান্য সমাজে ব্যবহৃত কথাগুলি আলোচনা করিলে বোঝা যায়, এই সমাজ অতি পরাকালীন এবং অতি পুরাকাল হইতে আপনার নিজস্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই শব্দগুলি অন্য সমাজে ব্যবহৃত নহে; বা সাম্প্রতিক সংস্কৃত বা ভাষা কাব্যেও ইহাদের ব্যবহার দেখা যায় না; অথচ এই শব্দগুলো পানিনী ধাতু পাঠে পঠিত ‘পিস গতৌ’ ‘চদির মাগে’ ইভি ধাতুর নিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ’।[১০৮]

ঐরূপ – “জার জেক্‌না জাতের ক্ষোয়।
আগুনে না ছোবে জলে না ধোয়”।[১০৯]

অর্থাৎ জাতে যতটুক বৈশিষ্ট্য তা কোন প্রকারে ধ্বংস হয় না। এমনকি আগুন কিংবা জলে ধুলেও নষ্ট হয় না। তাঁর মতে -

'এই ছিল্কার অন্তর্গত 'ছোবে' শব্দ ছুভ্ ধাতু নিষ্পন্ন। এবং 'ক্ষোয়' পদটি 'ক্ষি' ধাতু নিষ্পন্ন; এইগুলি শব্দ অন্য সমাজে অব্যবহৃত এবং আমাদের সমাজে ব্যবহৃত, সমাজকে সংস্কৃত ভাষী আর্য্য সমাজের অতি প্রাচীন কালীয় অংশ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়'।[১১০]

ঐরূপ - "আশা সে পরম দুখ।
নি আশা পরম সুখ"।।[১১১]

উক্ত দার্শনিক অভিব্যক্তি রাজবংশী সমাজের অবস্থানকে অনেকটাই উর্দ্ধে নির্মিত করতে সাহায্য করে। পঞ্চানন বর্মা লিখেছেন...এই সম্বন্ধ নির্ণয় তত্ত্ববেত্তা প্রকৃত পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণার ফল ও পরম সাধনালভ্য ধন। এই ছিল্কাটি সুতরাং জাতীয় পূর্ব্ব জ্ঞান গৌরবের নির্দশন বলে তিনি মনে করেন। আবার তিনি লিখেছেন-

'প্রনাম কালে প্রণত পুত্রাদির প্রতি প্রণম্যা মাতৃ স্থানীয়াদের আশির্ব্বাদ – "বাপ মোর ভালে থাক; যতগুলি তোর মাথার চুল, অতগুলি তোর পরমায়ু হউক। তোর আশা সব্বাঞে করুক, তুঞি জনি কারোএ আশা না করিস" পুরুষপরম্পরা পৌরূষদৃপ্ত উন্নতশিরা শালপ্রাংশু মহাভুজ ক্ষত্রিয়গণের আকাঙ্ক্ষার ও ভাবেরেই উদ্ভাবন করিয়ে দেয়। পুত্রাদি দীর্ঘ জীবন লাভ করুক, কিন্তু সেই দীর্ঘ জীবন হীন বা ছোট জীবন না হয় কিন্তু পৌরুষোজ্জ বিপুল কীর্ত্তি, শরণাগত পালক অপরের নিকট অনবনম্য, নিজ মহিমায় পরমভাস্বর অদম্য অটল প্রান প্রকৃত ক্ষত্রীধর্ম্মা হউক'।[১১২]

তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এক নতুন সংস্কৃতি যা অন্যের কাছ থেকে নেওয়া বা চুরি করে নিজের করে চালিয়ে নেওয়া রাজবংশীদের সংস্কৃতি নয় বরং এক অন্যমাত্রার পরিবেশ সৃষ্টি করে রাজবংশীরা, যার কীর্তি তথা গৌরব বাংলার বিষয় নয়। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে বিভিন্ন রাজবংশের স্বাধীন শাসন কামতাপুরকে কেন্দ্র করে

পরিচালিত করার ক্ষেত্র, সেখান থেকে তিনি ক্ষত্রিয়ের অনুসন্ধানকে একদিকে জাতি রাজনীতির দিকে টেনে স্বতন্ত্রতার জায়গাকে উদ্ভাসিত করেন যা বাঙালি অতীত ঐতিহ্যের অনুরূপ নয়।

রাজবংশী সমাজের অভ্যন্তরে প্রভাবিত জীবনধারার কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি জোর দিয়েছিলেন উক্ত সমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নটিকে, যা তাঁর জাতিবোধ নির্মানের দ্বিতীয় স্তর বলে বিবেচিত। যা আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যকলাপ এবং জাতি চেতনা বিকাশের কাজে এসেছিল। এই উদ্যোগ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমার্থক নয়। সাধারণভাবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যেমন আমাদেরকে কেরানীবৃত্তি শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করেছিল তেমনটা এক্ষেত্রে হবার পরিস্থিতি প্রকাশ পাইনি। সেকারণে এমন এক শিক্ষার কথা উল্লেখ করলেন যা আত্ম-নির্ভরশীল সমাজ গঠনে প্রক্রিয়াকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। এর ফলে রাজবংশী সমাজে একপ্রকার পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ পঞ্চানন বর্মার হাত ধরে প্রসার লাভ করেছিল। বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে রাজবংশী সমাজ যেমনটা ভেবেছিলেন তার কিছু কিছু নির্দশনের কথা প্রচলিত সমাজে আজও আমরা শুনতে পাই। ঠিক একইরকম কথার অনুরণন লক্ষ করা যায় ক্ষত্রিয় সমিতির বয়ানে ‘আমার যে ধন সম্পত্তি আছে তাহাই চালাইয়া ফিরাইয়া খাইলে তাহারা সুখস্বাচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বৃথা কেন অর্থ ব্যয় করিতে যাইব?.... আমার ছেলে আবার কোথায় চাকরি করতে যাইবে’। এর প্রত্যুতরে পঞ্চানন বর্মা বলেছিলেন-

> ‘চাকুরি করিবার জন্যই যে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রয়োজন তাহা কেহ মনে করিবেন না। বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞান ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, বিদ্যাশিক্ষাই জাতির উন্নতির মূলভিত্তিসরূপ। বিদ্যার গুনে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, আর বিদ্যাশিক্ষা অভাবে লোক

পশুতে পরিনত হইয়া নানারুপ কার্য্যে আসক্ত হইয়া পড়ে। বিদ্বান ব্যক্তিদের পৈত্রিক স্থাপিত ধনসম্পত্তি না থাকিলেও নিজ বিদ্যা ও জ্ঞান বলে তাঁহারা সহজে ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করিতে পারে। আর অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তিরা পিতার অর্জিত অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পত্তির উত্তাধিকার হয়েও কেবলমাত্র মূর্খতার দোষে পৈত্রিক সম্পত্তি একেবারে ছারখার করিয়া ফেলে। তাই বলি ভাই সব! বন্ধু সব! আপনাদের সকলের নিকট করজোড়ে শতশত বার বিনীতভাবে বলিতেছি, আপন আপন সন্তানসন্ততিদিককে বিদ্যাশিক্ষা করাইবেন। তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থ যদি সর্ব্বস্ব নিঃশোষিতও হয়, যদি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও ছেলেপিলেকেও লেখা-পড়া শিখাইতে হয় তাহাও করিবেন। তথাপি তাহারদিককে মূর্খ করিয়া রাখিবেন না। তাহাদের মুর্খ করিয়া রাখিলে আপনাদের ভাবি উত্তাধিকারীগনকে ভবিষ্যেতে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব আপনারা আপন আপন ছেলেদিগের লেখা-পড়ার প্রতি অবশ্য অমনোযোগী হইয়া তাহাদের কষ্টের কারণ ও আমাদের জাতির অবনতির কারণ হইবেন না...'।[১১৩]

অন্যদিকে ক্ষত্রিয় সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন, ২০ আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল, এ শ্রীযুক্ত রায়কত জগদীন্দ্রদেব শিক্ষামুলক প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন--

'বর্তমান সময়ে দেশে যে শিক্ষার ধারা প্রচলিত তাহা মানুষের গুন ফুটাইয়া চেতনা আনে না। তোলা অপেক্ষা আশঙ্কা তাহার দোষগুলি অধিক ফুটাইয়া তোলে। শক্তি বাড়ান অপেক্ষা শক্তি অধিক হ্রাস করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রিই হোক আর পাঠশালার সামান্য লেখা পড়া শিক্ষাই হোক, শিক্ষিত বালক বা মানুষটাকে দূর্বল পরাপেখি অভিমান ভর করিয়া তোলে। লেখাপড়া শিখিলেই ধারনা যেন পরের চাকরি করিতে হইবে; পরের চাকরি ছাড়া যেন তার আর পৌরুষ নাই। লেখাপড়ার কাজ ছাড়া অন্য কাজ করা হয়ত লজ্জার ও অপমান। সে পরের আশ্রিত বা পরের অন্নে পালিত হইয়া থাকিবে তথাপি কৃষি বা স্বাধীন বৃত্তির অন্য

> কাজ দ্বারা নিজের অন্ন জোটাইতে চেষ্টা করিবে না; ইহা যেন হীনতা। যাহারা কৃষি বা স্বাধীন বৃত্তিদ্বারা ধনার্জ্জন করিতেছে তাহারদিককেও শিক্ষার অভিমান ভরে হীন জ্ঞান করিয়া থাকে।... অধিক আর কি বলিব সরল জীবন সরল ভোজন, সরল চিত্ত সরল ভাষা সরল ব্যবহার এবং স্বাভাবিক জ্ঞান ও শক্তির সরল ভাবে উৎকর্ষণ এবং আত্মশক্তির উদ্বোধন; জগতের উপকার সাধন ভগবানের মতি ও ভক্তি এবং তৎপ্রতি গতি ইহাই প্রকৃত শিক্ষা, ইহাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব'।[১১৪]

উপরিউক্ত শিক্ষা বিষয়ক বয়ান দুটি একে অপরে পরিপূরক না হলেও উভয়ই রাজবংশীর সামাজিক অবস্থান বিবেচিত করে তাঁদের ভাষণ উত্থাপন করেছিলেন। শিক্ষার প্রতি রাজবংশীর অনীহা প্রকাশ দূর করার একটা উদ্যোগ একে বলা যায়। অন্য দিকে শিক্ষার অন্তরালে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এতে লক্ষণীয়। আবার সরলভাবে জীবনযাপন করা, পর উপকারে এগিয়ে আসা যেমন প্রকৃত মনুষ্যত্বে পরিচায়ক তেমনি নিজের কাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার আগ্রহ একধরনের শিক্ষা যা রাজবংশী সমাজে স্থিত বলে তিনি মনে করেন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাদের কতটা দূরত্ব ছিল তা একটি সরকারি পরিসংখ্যান লক্ষ করা যাবে। ১৯১১ সালের জনগণনায় দেখা গেল ১০০০ জনের মধ্যে মাত্র ৫১ জন শিক্ষিত।[১১৫] এই পরিস্থিতির থেকে রাজবংশীদের উত্তরণের যে সংবদ্ধ পরিকল্পনা পঞ্চানন বর্মা তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে নিহিত ছিল নতুন করে কোন কিছু শেখার (Learning) আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যা বর্ণ ব্যবস্থার কর্ম, গুণ এবং তার প্রতিরোধকে বুঝতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে বলা যায়, রাজবংশী সমাজে প্রচলিত কথা কাহিনী বা বিভিন্ন গল্পগুলো যেভাবে বংশপরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়েছে তার মমার্থ উপলব্ধি করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 'রাজবংশীরা নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত নন'।[১১৬]

অনুরূপ প্রতিস্বর ধ্বনিত হয়েছে পঞ্চানন বর্মার *'নাদিম পরামানিকের পাঠা'* শীর্ষক গল্পটিতে। শিক্ষামূলক ভাষণে তিনি বার বার মূর্খ কথাটি ব্যবহার করেছেন। মূর্খ থেকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস নিছক শিক্ষিত নয় বরং একটা ব্যবস্থার সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত করা যা রাজবংশী সমাজ বরাবরেই বিচ্ছিন্ন ছিল। আধুনিকতার সঙ্গে রাজবংশী সমাজকে যুক্ত করার এই প্রয়াস পঞ্চানন বর্মার দুরদর্শিতার পরিচায়ক। পঞ্চানন বর্মার পশ্চিমী শিক্ষাই শিক্ষিত। পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে স্থানীয় পরিসরের আচরণকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতি কার্যক্রমের মধ্যে। রাজবংশী সমাজের যে চালচিত্র প্রকাশ পেল তার সাথে অন্য সংস্কৃতির বোঝাপড়া ফারাক বুঝতে এই স্বতন্ত্রতার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজবংশীদের সঙ্গে প্রকৃতির (Nature) গভীর বোঝাপড়া তাঁদের মধ্যে ভাব জগতের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। ভাওয়াইয়া সংস্কৃতি তারই এক অনুপম নির্দশন। প্রকৃতির সঙ্গে নীরব ভাবে কথোপকথনের সম্পর্ক ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে প্রাধান্য পেয়েছে। পশু পাখির সাথে এমন কি 'হালের গরু' বা 'মহিষ'কে নিজের সাথী মনে করে তার সঙ্গে কথোপকথন[১১৭] যখন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে তখন তা আর যাইহোক তাকে সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত করা যায় না। প্রচলিত অর্থে সম্পত্তির ধারণা ও তার অভিব্যক্তি এক্ষেত্রে ভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। একটি উদাহরণের সাহায্য বিষয়টির আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। রাজবংশী সমাজে প্রায়শই, দিক চিহ্নিত করে জমি বা মাটির (ভুন) পরিমান নির্ণয় করার বড় রেয়াজ ছিল। উত্তর বা দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে চোখ রেখে - যতদূর দেখা যায় – হাত নাড়িয়ে বলা হত *'এইল্লা হামার ভুইন'* (এগুলো আমাদের জমি)। কত খানি জমি এর মধ্যে রয়েছে তা বলা শক্ত। বর্তমানে কিছুটা মজার ছলে ছেলেপুলেদের ঠাট্টা করতে দেখা যায় *'বায় আমচন কতলা তাক্কু গারল্লু*

(কোন ব্যক্তির নাম নতুন করে দিয়ে বলা হচ্ছে আপনি কত বিঘা জমিতে তামাক লাগিয়েছেন)। এর উত্তরে আমচন বলেন *‘উত্তর পাক্ষান গাড়া হইল’* (উত্তর দিকের সব জমিতে চাষ হয়েছে)। *‘কালি থাকি পচিমোত ধরিমো’* (কাল থেকে পশ্চিম দিকের জমিতে চাষ শুরু হবে)। এই কথোপকথনেও জমির পরিমান কতটা রয়েছে তার নির্দিষ্ট ভাষা নেই, রয়েছে শুধু দিক চিহ্ন। হয়ত সে নিজেও জানে না বাপ কাকার কতটা জমি আছে। প্রজারা নিজে জমি মাপ করে কোন নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিত না। অনুমানের ভিত্তিতে খাজনা দেওয়া হত।[১১৮] যা তার উদাসীনতার প্রকাশ ধরা যেতে পারে। এই উদাসীনতার পশ্চাতে জমি জরিপ না করার কথা বলা যেতে পারে। এখানে প্রজাস্বত্ব বন্টন হয়েছে মৌখিকভাবে। জোতের নিশানা প্রাকৃতিক সীমাদ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। কত জোতদার কি পরিমান ভূমি দখল করে আছে এবং মোট জমির রাজস্ব কত এই সব তথ্য পাওয়া যায় নি।[১১৯] ব্রিটিশ আমলে এর কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল কিন্তু গ্রাম সমাজে পূর্বের রেয়াজ থেকেই যায় যা আজও কিছুটা বিদ্যমান। উদাসীন ভাবনার প্রচুর উদাহরণ রাজবংশী সমাজে লক্ষণীয়। যেমন ভাওয়াইয়া গানের নায়ক কোন দেবদেবী বা মহাপুরুষ নন বরং মৈশাল, মাহুত বন্ধু, মাঝি, গাড়িয়াল, সাধু, কিংবা বৈদ্যের নাম ওঠে এসেছেন। অন্য অর্থে এদের বলা যেতে পারে ‘বাউদিয়া’[১২০] যারা বাউন্ডুলে, এলোপাতারি ঘুরে চলেন ঠিকানা স্থির না করে। উদ্দেশ্যহীন জীবন যদি সমাজের নায়ক রূপে প্রতীয়মান হয় তাহলে তার প্রভাব পারিবারিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে বলা যায়। রাজবংশী সমাজের এই শৈল্পিক অধ্যায় পরিবার বা পারিসরিক কাঠামোতে অপরিচিত নয় বরং রাজবংশী সমাজ সঞ্জাত। আর একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। এক ব্যক্তি সকালে ওঠে কাজে যাবেন কিনা তা ঠিক করেন তার ঘরে কতটা খাবার আছে তার উপর

নির্ভর করে। অর্থাৎ চালের হাঁড়িতে পা ঢুকিয়ে দিয়ে দেখবে চাল আছে কিনা ! যদি চাল থাকে তো কে আর কাজে যাবে?[১২১] উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট যে ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের চিন্তাচেতনা কতটা নীরব। এই মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধ্যানধারণা পঞ্চানন বর্মাকে বোধহয় বিচলিত করে তুলেছিল। সে জন্য তিনি বলেছিলেন--

> 'বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। পশুগনের যেমন হিতাহিত জ্ঞান নাই, মানবগণেরও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার অভাব হইলে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে না। আমরাও তেমনি শিক্ষার অভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অজ্ঞাত পশুবত হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের ঘৃণাভাজন হইয়া পড়িয়াছি।...ভ্রাতৃগণ! আপনারা বহুদিন হইতে ঘুমাইতেছেন, এখন চেতন হউন, চেতন হইয়া আপনাদিককে ভাবিয়া দেখুন আপনারা কে ? আপনারা কালে কত পূজনীয় ছিলেন, আর বর্তমানেই বা কত হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা আপনাদের সমকক্ষ ও নীচ ছিল তাহারাও আপনাদিককে অতিক্রম করিয়া উন্নতির উচ্চতর সোপানে উপস্থিত হইতে চলিয়াছে। তাহারা যে শিক্ষার দিব্যালোকে আপন গন্তব্যপথ আলোকিত করিয়া আমাদের অপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে আমরাও যদি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরন করি, বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিতে পারি, তবে অবশ্যই আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব'।[১২২]

অপরের নিরিখে নিজের অবস্থান উপলব্দি করার প্রয়াস যদি আভ্যন্তরিণ সমাজব্যবস্থার প্রতিরোধ শক্তির সঙ্গে মর্যদার প্রশ্ন সংযুক্ত হয়, এই চেতনার সঞ্চারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আশার (Hope) প্রবণতা তৈরি হয়। যার আবডালে লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যৎকে জানার এক নতুন উন্মাদনা। উদাসীনতার পর্ব পেরিয়ে জীবন সুরক্ষার বিচারে রাজবংশীদের নির্দিষ্ট একটা ছত্রতলে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন পঞ্চানন বর্মা। তাই তিনি ক্ষত্রিয় সমিতির তৃতীয় বৎসরের ১৩১৯র অধিবেশনে বলেছিলেন- 'আদর্শ স্থাপনের

জন্য ক্রিয়ার অভ্যাসকে শিক্ষা বলে'।[১২৩] অর্থাৎ নতুন জগতের কাজকর্মকে অভ্যাসে পরিণত করার উপর জোর দেন। বহিজগতের সাথে সংযোগস্থাপন এবং একই সঙ্গে রাজবংশী ব্যক্তি জীবনের রূপান্তরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা পঞ্চানন বর্মার রাজনৈতিক চেতনার দূরদৃষ্টিতার পরিচায়ক বলে মনে করা হয়।

৬. রাজবংশী সমাজ পরিবর্তনে ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্যোগ

রাজবংশী সমাজের মধ্যে রূপান্তর নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন বর্মা। আদিসমাজ ও সংস্কৃতির থেকে কীভাবে সমাজে রূপান্তর তথা উন্নয়নের প্রশ্নটি যুক্ত করা যায় তার দিকে সমিতি ও তার কার্যক্রমকে পরিচালনা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পঞ্চানন বর্মার এই উদ্যোগের সঙ্গে আধুনিক জাতি রাজনীতি প্রসঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। অবস্থানরত সমাজকে (Existing Society) রাজনীতিকরণ, নতুন করে জাতি পরিচিতি নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠে। এই প্রয়াসে সম্প্রদায় থেকে নতুন জাতি প্রাপ্তির অভিধা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে বর্মার অবস্থান জনমানসে প্রকট হয়েছিল। অর্থাৎ রাজবংশী প্রশ্ন এবং পঞ্চানন বর্মার অবস্থান এই দুইয়ের সংযোগসাধন এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বিষয়টি এক ও অভিন্ন, কিন্তু তা কিছুটা ভিন্নতাকে উপস্থাপন করে। কেননা, বর্মা সচেতন রাজবংশী জাতি নির্মাণের কারিগর। অন্যদিকে, রাজবংশী সম্প্রদায় অবচেতন ভাবে সুদীর্ঘকালের (Primitive stage) অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলত এই দুইয়ের উদ্দেশ্য বা লক্ষ এক না হলেও বর্মার ছোটবেলার জীবন রাজবংশী সংস্কৃতির মধ্যে পুষ্ট হয়। তাঁর এই অবস্থান এবং নতুন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গভীর বোঝাপড়া আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। তাই আলোচনার শুরুতে এই সংযুক্তকরণের বিষয়টি বর্মা কীভাবে

উপস্থাপিত করেছেন সেদিকে আলোকপাত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হতে তা কতটা সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল তার একটা আভাস ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে আলোচ্য অধ্যায়টি।

পঞ্চানন বর্মা শুধু উত্তরবঙ্গে নয়, সে সময় উত্তরপূর্ব ভারতের একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব[১২৪] যার নেতৃত্ব পেয়েছিলেন রাজবংশী সমাজ তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গবাসী। তিনি বড় হয়ে ওঠেছিলেন রাজবংশী সমাজে। তাঁর ছোটবেলার জীবন এবং শিক্ষিত হয়ে ওঠার পরবর্তী চিন্তাভাবনা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানের শূন্যস্থান পূরণ করতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সাহায্য করেছে সমৃদ্ধ করতে তাঁর গ্রাম্য জীবনকে। গ্রাম জীবনকে নতুন করে দেখা অর্থাৎ চক্রাকারে জীবনকে অনুধাবন ও তার থেকে সৃষ্ট অনুভূতি জন্ম দিয়েছিল নতুন সম্প্রদায়ের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে। সমষ্টির এই বোধ- যা রাজবংশী নামে পরিচিত- তাকে তিনি দিতে চেয়েছিলেন আধুনিকতার নিরিখে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। তিনি আধুনিক আদব কায়দায় সমাজকে রূপান্তরিত করতে সমাজে একটি চিহ্ন দেগে দিয়েছিলেন। যা 'ক্ষত্রিয় সমিতি' নামে পরিচিতি। তিনি এই নিদর্শনকে সমগ্র সমাজের মানদণ্ডের বিচারে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিকতার ধাঁচে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র সংগঠন যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি সমিতির বাৎসরিক কার্যকলাপ তিনি লিখে রেখেছিলেন 'বৃত্ত-বিবরণী'তে। সমিতি প্রতিষ্ঠা, সংগঠন গড়ে তোলা এবং সমিতির কার্যবিবরণী লিখিত আকারে প্রকাশ করার এই ত্রিবিবিধ কার্যক্রম বর্মার আধুনিক শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ[১২৫] বলা যেতে পারে। এর মধ্যে রাজবংশী সমাজের আচরণ এবং নব প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের ধারণা কীভাবে সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়েছে এবং তাদের সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের মৌলিকতা জাতি ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত। ফলত জাতির নিজস্ব ভাবনাই হল তার প্রতিরোধ। প্রতিরোধ ও তার সম্ভাবনার নিরিখেই জাতির ইতিহাস গড়ে উঠে। অন্যের নিরিখে জাতি ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার যে ঝোঁক লক্ষ করা যায় তার মধ্যে এক তুলনামুলক আলোচনা চলতে থাকে। যার ফলে দেখা যায় এক জাতির আদব কায়দা অন্য জাতির কাছে হেয় বা অবহেলার বিষয় হয়ে উঠতে। অবহেলা বা বঞ্চনার কথা না বলে বরং দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কোন কোন সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলি সমাজ গঠনে সাহায্য করেছে এবং তা কিরকম সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে গেছে। প্রথমে রাজবংশী সমাজের বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে আলোচনায় অভিনিবেশ করা হয়েছে।

রাজবংশীদের প্রচলিত সম্পত্তির ধারণাকে যা আধুনিক সম্পত্তির ধারণার সঙ্গে একাকার না হলেও জাতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার রূপান্তর ঘটানোর একটা উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পঞ্চানন বর্মা কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যকলাপকে ধরে। 'উদাসীন' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্পত্তিকে পরিমিত করার যে প্রতিচ্ছবি রাজবংশী সমাজে ফুটে উঠেছে, ক্ষত্রিয় সমিতি যেখানে চেষ্টা করেছে কীভাবে তার বাইরে রাজবংশী সমাজকে নিয়ে যাওয়া যায়। সমিতির এই কার্যক্রমকে নিম্নে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.১. সম্প্রদায় থেকে জাতি প্রাপ্তি

রাজবংশী প্রশ্নটি আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ তার পিছনে পঞ্চানন বর্মার আজীবন সংগ্রাম ও ত্যাগের প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। যদিও তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হরমোহন খাজাঞ্জি, রংপুরের রাজবংশী জমিদার। ১৮৭২ সাল থেকে জনগণনা করার প্রশাসনিক কার্যক্রমে হাত দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার।

জনগণনার তালিকা প্রকাশ হলে রাজবংশীদের অবস্থা হেয় করে প্রতিপন্ন করা হয় বলে খাজাঞ্জি বাবুরা মনে করেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। এই পর্বে পঞ্চানন বর্মা তাঁদের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগদান করেন। সেই আন্দোলনের পরিভাষা মূলত 'ক্ষত্রিয় সমিতি' জায়গা থেকে জোরালো হয়ে ওঠেছিল। পঞ্চানন বর্মা ১৯১০ সালে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর শহরে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির উন্নতির প্রশ্নটি 'ক্ষত্রিয় সমিতি'তে রাখা হয়েছিল যা রাজবংশীদের সংঘবদ্ধ করতে এবং আন্দোলনের ব্যপ্তিতে কাজে আসে। সেই উদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায়টি ব্রিটিশ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নীতিতে লক্ষণীয়। জাতপাতের বিষয়টিকে শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করলে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যাইহোক, বর্মার কার্যক্রম একদিকে স্বতন্ত্র রাজনীতির জন্ম দিলেও তার উৎস নির্মাণে রাজবংশী ঐতিহ্য ও পরম্পরাই হয়ে ওঠেছিল এই নতুন রাজনীতির প্রধান উপজীব্য। এই সংস্কৃতিতে যে উপাদানটি লক্ষণীয় ভাবে অনুপস্থিত তা হল আধুনিক শিক্ষা। কারণ হিসাবে বলা যায় আধুনিক শিক্ষার প্রতি স্থানীয়দের ছিল অবহেলা বা অবজ্ঞা।[১২৬] একটি পরিসংখ্যান লক্ষ করলে তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। কোচবিহারে ১৯৭১ সালের জনগণনায় মোট জনসংখ্যার শিক্ষিতের হার ছিল ২১.৯৯%। পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে তা ৩৩.০৫%। পুরুষ ও নারীর অনুপাত হল যথাক্রমে ৩১.৪৩% ও ১১.৭১%।[১২৭] পঞ্চানন বর্মার জাতি আন্দোলনের প্রারাম্ভিক পর্বে (১৯১১র জনগণনা) এই পরিসংখ্যানটি ছিল ৭.৪%।[১২৮] ষাট বছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৭.৪% থেকে ২১.৯৯% এ। পঞ্চানন বর্মার আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় সমাজকে যুক্ত করার প্রয়াস এতে লক্ষণীয়। অন্যথায় দেশভাগ পরবর্তীতে একটা বড় অংশের লোকজন কোচবিহারে বাসস্থান গড়ে তোলেন। যার একটি অংশ শিক্ষিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সমাজের বৃহত্তম অংশের

মানুষ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকার বিষয়টিকে বর্মা আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে রাজবংশী ঐতিহ্যের সমন্ধ স্থাপনার মধ্য দিয়ে জাতি রাজনীতির ক্ষেত্রটি তিনি শুরু করেন। যাকে আমরা বলতে পারি পঞ্চানন বর্মার চিন্তার যৌথতা। আদি থেকে আধুনিক চিন্তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন রাজবংশী 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র। নিয়ে এসেছিলেন নতুন নতুন অভ্যাস যা একপ্রকার তাদের ব্যবহারিক জীবনকে দোদুল্যতার ছকে নির্মাণ করে। রাজবংশী সমাজে এই উদ্বিগ্নতার জায়গাটি বিশেষত লক্ষ করা যায় পঞ্চানন বর্মার উপনয়ন সংস্কৃতি গ্রহণ[১২৯] বা বর্জনকে সামনে রেখে। একদল রাজবংশী সমগোত্রীয় বলতেন 'আমাদের চৌদ্দপুরুষ গেল এমনভাবে এখন তার পৈতা নিয়ে কি হবে?[১৩০] তবে নতুন অভ্যাস আয়ত্ব করা অর্থাৎ নতুন চিন্তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে একপ্রকার অনুশীলন করার অর্থ প্রকাশ পায় যা জাতি ব্যবস্থার স্তরোন্নতির এক নতুন অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই উদ্ভূত সাংস্কৃতিক পরিবেশে পঞ্চানন বর্মা যৌথ প্রয়াস দেখিয়েছিলেন 'ক্ষত্রিয় সমিতি'কে সামনে রেখে। 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র অভ্যন্তরে ও বাইরে বিশেষত রাজবংশী পরিবার পরিজনে নতুন অভ্যাস আয়ত্ব করা ও পরিশেষে তাকে ব্যবহারিক করা অর্থাৎ শিক্ষিত করে তোলার মধ্যে উক্ত সমাজ একটা আশার (Hope) আলো দেখেছিলেন। এই পথটি নির্মাণে রাজবংশী আচার আচরণের কিছু কিছু যৌথতার নির্দশনকে তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আবার 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন তাতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর জোর দেবার প্রবণতা লক্ষণীয়।[১৩১] পঞ্চানন জীবনীকার উপেন্দ্রনাথ বর্মণ *ঠাঁকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত*তে উল্লেখ করেছেন পঞ্চানন বর্মার সমিতির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাটি বা তাকে নেতা হিসাবে বেছে নেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল

সভাকক্ষে উপস্থিত সদস্যের অনেকাংশের সমর্থন নিয়ে।[১৩২] 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র ভাষণে পঞ্চানন বর্মার একটি উক্তি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জনসমাবেশে কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন--

> '...স্বজাতির মঙ্গল সাধনেই সকলের উদ্দেশ্য; সকলেই সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছি। আত্মমত বলবত করার জন্য চেষ্টা সুতরাং উচিত নহে। আমার মান ও অপমান ত্যাগ করিয়া, রাগ ও দ্বেষ ছাড়িয়া, সকলের মঙ্গল একমাত্র ভাবিয়া, নিরপেক্ষভাবে, ধীর স্থির, নির্ম্মল চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোচনা করিব। যে মতটি সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া, সকলের অথবা অধিকাংশের নিকট প্রতীয়মান হইবে, তাহাই আত্মমত, তাহাই সমাজের আকাঙ্ক্ষিত মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিব। ক্ষুদ্র 'আমার' মতটি বৃহৎ 'আমার' সমাজের মতটীতে ডুবাইয়া দিব। ক্ষুদ্র আমার মতটী বৃহৎ আমার অর্থাৎ সমাজের (মতে) উপহার দিব...।'[১৩৩]

উপরিউক্ত বয়ানে লক্ষ করা যায় প্রকল্প নির্মাণে কিংবা বিষয়কে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে ভিন্ন মতকে যথাযত গুরুত্ব দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান জাতীয় তথা রাজ্য রাজনীতির পরিভাষায় যে আক্রমনাত্মক মনভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র পরিভাষা একরৈখিক নয় বলে মনে হয়। ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টিবাচক ভাষ্যের মধ্যে নিজের অবস্থাকে স্থান দেওয়ার পদ্ধতিগত আচরণ পঞ্চানন বর্মা সৃষ্ট নতুন কমিউনিটিতেও তা লক্ষণীয়। যৌথতার এই নিদর্শন রাজবংশী সমাজজীবনে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভাত। আমরা আলোচনার সুবির্ধাতে তার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকব আলোচ্য অধ্যায়ে।

'ক্ষত্রিয় সমিতি'র একটি অঙ্গ ছিল 'মণ্ডলী ব্যবস্থা'।[১৩৪] সমিতির কাজকর্ম ও তার প্রভাবকে যথাযতভাবে গ্রাম সমাজে বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষে তা স্থাপন করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, মণ্ডলী ব্যবস্থার একটি অন্যতম কার্যক্রম ছিল গ্রামকে নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেজন্য সমিতি'র সভ্যরা 'সমাজ শৃঙ্খলা'[১২৫] নামে মন্ডলীকে পরিচিতি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমিতির একটি উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক দপ্তর হিসাবে 'মণ্ডলী' বিবেচিত। সেকারণে সমিতির প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে 'মণ্ডলী'র গুরুত্বকে আলোচনার জায়গায় আনতে দেখা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন যেসকল স্থানে 'মণ্ডলী' স্থাপন হত, তার ঘটনাবলীর কথা প্রকাশ পেয়েছে বৃত্ত-বিবরণীতে।[১৩৬] 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র প্রায় সূচনা পর্ব থেকে মণ্ডলী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সমিতির ভাব ও আর্দশকে প্রচারের মাধ্যম করে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন করার প্রচেষ্টা করেছিল। সমিতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে রংপুর শহর জড়িয়ে থাকলেও সেই রকমভাবে তার শাখা প্রশাখা দূরবর্তী শহরগুলিতে না থাকলেও বিশেষত জলপাইগুড়ি শহরে বোধহয় প্রথম শাখা গঠিত হয়েছিল। সেই অর্থে গ্রামে তার বিকাশ মণ্ডল ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হয়েছে। স্বরাজ বসু তার অনবদ্য গবেষণা প্রকল্পে মণ্ডলী ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করেছেন তিনটি বিভাগীয় (Category) পর্বে। মহামণ্ডলী, মণ্ডলী এবং অন্তরমণ্ডলী- এই তিন বিভাগ স্থানের নিরিখে বিন্যস্ত। মহামণ্ডলী মহকুমা শহরে, মণ্ডলী এক, দুই বা ততধিক গ্রামকে নিয়ে এবং অন্তরমণ্ডলী কয়েকটি পাড়াকে নিয়ে কাজ করত। মণ্ডলীদ্বয়ের এই ক্রমবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন 'ক্ষত্রিয় সমিতি'। স্বরাজ বসু এই চেনমাপিক সংযোগকে ক্ষত্রিয় সমিতির ভাবনা প্রচারের মাধ্যম বলে মনে করেন।[১৩৭] তবে যোগাযোগের এই পন্থা নিছক ক্ষত্রিয়ত্ব ভাব-প্রচারের জন্য নয়, বরং বলা যায় সমষ্টির সঙ্গে মিলিত হওয়ার এই প্রয়াস সমিতিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প উপস্থাপনে সাহায্য করেছিল। এতাবৎ গবেষণায় রাজবংশীদের অর্থনৈতিক জীবন সমন্ধে অর্থাৎ জীবিকার প্রধান উৎস হিসাবে কৃষিকাজকে উল্লেখ করতে দেখা যায়।[১৩৮]

তবে উন্নত বা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ছিল না বলে আর্থিকভাবে সমাজ সমৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ করা যায়নি। তাদের চাষবাস নির্ভর জীবনযাত্রা ছবি এতটাই অভাবের ছিল তা বামপন্থী কর্মীদের পর্যন্ত বিব্রত করে দিয়েছিল। বিব্রত হওয়ার কথা এজন্যই বলা হয়েছে, শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্ন মাথায় রেখে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া লোকজনদের সাথে মিশতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করত। তা সত্ত্বেও অভাবের ছবিটা তাদের কাছে ছিল অন্যরকম। সেই নিরিখে মণিকুন্তলা সেন তাঁর আত্মজীবনী *'সেদিনের কথা'*তে লিখেছেন --

> 'জলপাইগুড়ির একটা গ্রাম। অতি দরিদ্র কৃষক এলাকা। আমি মেয়ে হয়েও ঘরে ঢুকতে পারছি না- বস্ত্রাভাবে মেয়েদের এমনই অবস্থা। ছেলেরা একটা লম্বা কাপড়ের ফালিকে লেংটি হিসাবে ব্যবহার করে কোনমতে লজ্জা ঢাকে। ভাবলাম খুব খাঁটি জমিন পেয়েছি- এখানে আমাদের কথায় ফল হবে। ওরা রাজবংশী'।[১৩৯]

এখানে আর একটি আর্থিক দৈন্যতার নির্দর্শন উল্লেখ করা হল। উপরিউক্ত বয়ানের অনুরূপ এই ভাষ্যতেও দারিদ্রতা মাপকাঠি হিসাবে পোশাক পরিচ্ছদকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে--

> 'রাজবংশী পুরুষরা পড়ত ছোট ধুতি। কুটুমবাড়িতে যাওয়ার সময় এরা জামা কাঁধে নিয়ে যেত। এই জামা গ্রামে দুই তিনটে থাকত। যখন যে কুটুমবাড়িতে যেত, সেই জামা কাঁধে নিয়ে যেত। জামা কাঁধেই ফেলা থাকত। কুটুমবাড়িতে গিয়ে সেই জামাকে ভালো স্থানে রাখত এবং বাড়ি ফেরার সময় সেই জামাকে কাঁধে নিয়েই বাড়ি ফিরত। জুতো নিয়ে যেত হাতে করে। জুতো সব বাড়িতে ব্যবহার হত।...পরিবারের একজন জুতো কিনলে সারাজীবন চলে যেত'।[১৪০]

অভাবে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতা রাজবংশী সমাজে কম নয়। সামগ্রিক অর্থে তিনবেলা ভরপেট না খেয়ে থাকার এমন একটা পরিবেশ তৈরি

হয়েছিল মনে হয়েছিল এটা স্বাভাবিক জীবন।[১৪১] অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোথাও যেন একটা আত্মীক সম্পর্ক থেকে গিয়েছিল এবং আর্থিক সঙ্কটকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা দারুণ উপায় হিসাবে উদাসিন মানসিকতা অবলম্বন করে জীবন কাটাত। এই রকম জীবন শৈলীকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ে আসার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে আর্থিক বুনিয়াদকে নতুন ভিত্তির উপর স্থাপন করা। মনে হয় এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল মণ্ডল-ভিত্তিক সমিতির প্রসরতার মধ্য দিয়ে। মণ্ডলসভা প্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজকে বোঝার বিষয়টি সমিতির কার্যকলাপকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন করার জায়গা তৈরি হয়েছিল। ফলত তাদের দৈনিক জীবনের অভাব এবং সেই দারিদ্রতাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে জীবন নির্বাহ করার প্রবণতাকে স্তব্ধ করার উপায় হিসাবে সমিতি উপস্থাপন করে ‘ধনভান্ডারের রূপরেখা’। সমিতিতে আধুনিক হিসেব নিকেশের খতিয়ান এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা অনেকের কাছে রাজ্য বাজেটের অনুরূপ মনে হয়েছে।[১৪২] নিখুঁতভাবে প্রত্যেক অধিবেশনের আয়ব্যয়ের তালিকা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলার শিক্ষা বোধহয় এই প্রথম রাজবংশী সমাজ শিখেছিল পঞ্চাননের হাত ধরে। শিক্ষণীয় বিষয়টি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে সমষ্টিবাচক ভাবনার দিকে মনযোগ নিবেশ করে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের নিরিখে আধুনিকতার প্রবেশদ্বারের মধ্যে ব্যক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও সমিতির কার্যকলাপে তার বিপরীতমুখী (Paradism) প্রবণতার জন্ম দেয়। সমিতি ধনাগমের বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে এসেছিলেন উপরিউক্ত সাদৃশ্যতাকে মান্যতা দিয়ে। সমিতি লিখেছেন --

'সমাজে ২/৪ জনের কিছু ধন থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে সমাজকে ধনবান বলা যাইতে পারে না। সমাজের দুই চারিজন ব্যতীত অপর সকলের ধন থাকিলে সমাজকে ধনবান বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাও সমাজের প্রকৃত ধনাগম নহে। সমাজের লোকেরা নিজে ও অপরের জন্য ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, সামাজিকগণ পরস্পর মিলিয়া যদি এরূপ উপায় স্থির করিতে ও শিক্ষা দিতে পারেন, তবেই সমাজের প্রকৃত ধনাগম হয়।...কিন্তু যদি সুচিন্তার দ্বারা স্থিতীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ধনগমোপায় থাকে এবং তাহা অবলম্বন করিয়া ধনাপার্জ্জন করিবার শিক্ষা ও অধ্যাবসায় সমাজে থাকে, তবে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা ব্যক্তিসমূহের ধননাশ কখনও হইতে পারে বটে, কিন্তু সমাজের ধনাগম অবিরতগতি ও অবিনাশী থাকে।...ধন অপেক্ষা ধন উপার্জ্জনের ক্ষমতাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ধনার্জন সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাহারাই পরামর্শ করিয়া এ সম্বন্ধে উপায় অবধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ধনার্জ্জন ও ধন রক্ষা উভয় বিষয়ে শিক্ষা আবশ্যক'।[১৪৩]

উক্ত বয়ানে সম্পত্তি সম্বন্ধে সমিতির ভাবনা যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কীভাবে সম্পত্তি উপার্জন ও তার সংরক্ষণ করা যায় তার উপর আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছে। এর জন্য এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাকে (Learning) অগ্রাধিকার দিয়েছে। সম্পত্তি এখানে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের অর্থাৎ সকলের কথা ভেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সম্পত্তির যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাতে পৈত্তিক সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির যত না গুরুত্ব পেয়েছে তার তুলনায় কীভাবে সম্পত্তি সৃষ্টি করা যায় সমষ্টির চিন্তার মধ্য দিয়ে সে বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। সে চিন্তাই যদি শিক্ষার বিষয় হয় তাহলে তার দ্বারা সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির আয়োজন হতে পারে– এরকম ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র সমাজের চিন্তাকে একত্র করে সম্পত্তি বৃদ্ধির আয়োজন একপ্রকার যৌথতাকে স্থান দিয়ে তিনি রাজবংশী কৃষক সমাজকে

সমিতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। যা সমগ্র সমাজকে এক বিশেষ দিকে অনুধাবিত করতে সাহায্য করে।

আকস্মিকভাবে সম্পত্তি সম্বন্ধে বর্মার উদ্বিগ্নতা এবং সেখান থেকে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে সমিতির ভাবনাকে জনসন্মুখে প্রকট করেছিলেন। অনুপূর্বের অধ্যায়ে রাজবংশী লোকজনদের সম্পত্তিকে নিয়ে যে ভাবনাচিন্তার করার ক্ষেত্র লক্ষ করা গেছে তার লক্ষণ হিসাবে উদাসীন সমাজজীবন মানদণ্ডের ভূমিকায় এসেছে। বাউদিয়ার জীবন ভাওয়াইয়া গানের মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটতে থাকলে তার সুর তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জনশূন্য প্রান্তরে। সেই নির্জন জীবনের সঙ্গী হয়েছে বনজঙ্গল, নদী নালার বিভিন্ন সৌন্দর্য, সবুজ মাঠ বা খা খা জনশূন্য প্রান্তর এবং সঙ্গে তার গরু বা মোষের পাল। অর্থাৎ রাখালিয়া জীবনসমাজে প্রতীয়মান হয়েছে দৃষ্টান্ত রূপে। রাখাল এখানে সৃষ্টিশীলতার প্রতিক রূপে দণ্ডায়মান। সমাজ তাকে চিহ্নিত করেছেন 'বাউদিয়া' নামে। তার আর এক পরিচয় আমরা পাই 'বাথান সংস্কৃতি'র[১৪৪] নায়ক রূপে। যিনি গরু মোষ চড়িয়ে বেড়ান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, সেখানেই তার দিনরাত, ভয়ঙ্কর বিপদকে সামনে রেখে - বন জঙ্গলের বন্য পশুর আক্রমণ - খাবার জোটে কিংবা জোটে না তবুও যেন তিনি হয়ে উঠেছেন সমাজের প্রেরণা রূপে। মোষ চড়িয়ে বেড়ান বলে তিনি মৈশাল। তিনি সকলের প্রিয়। এই জনপ্রিয়তাই বোধহয় সমাজে প্রতীয়মান হয় 'মৈশালবন্ধু' নামে। তাকে ঘিরে রচিত হয় পালা গান ও নাটক। ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ১৯৫৩-৫৪ সালে 'মৈশালবন্ধু' নামে একটি নাটক রচনা করেন। ঐ সময়ে নাটকটি কোচবিহারের খাগড়াবাড়ী নাট্য মঞ্চে অভিনীত হয়। লোককথাকে নাট্য রূপে রূপান্তরিত করার নেপথ্যে ছিল এক অন্য জীবনশৈলীকে উপস্থাপিত করার অনবদ্য মানসিকতা। নাটকটিতে সমাজজীবনের

বিভিন্ন অধ্যায় যেমন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক প্রবাহকে ঘটনাক্রমে বাম ঘরনার[১৪৫] জায়গা থেকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লোককথার এই পটভূমির ইতিহাস নেই, রয়ে গেছে বর্তমান সমাজে তার কিছু লক্ষণ যা বংশ পরম্পরায় চলে আসে কিংবদন্তীর মধ্য দিয়ে। অতীত ও বর্তমানের সংযোগসাধন ব্যক্তিসত্তার এই অস্তিত্ব আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে রাজবংশী সমাজ বিবর্তিত ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লেখক লেখনীতে রাজবংশী সমাজের ছড়া, ছিল্কা এবং প্রবাদ ব্যবহার করে সমাজের আদিরূপের আভাস কিছুটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সমাজের আদিম কাঠামোটি বুঝতে আলোচনার সুবির্ধাতে ‘মৈশালবন্ধু’ নাটকটির সাহায্য নিতে হয়েছে। ‘মৈশালবন্ধু’র নামে ভাওয়াইয়া গান, পালা গান এমনকি নাটক হিসাবে সমাজে সমাদৃত হলেও বহুদিন এই গ্রন্থটি লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গিয়েছিল। নৃপেন্দ্র নাথ পাল, হাজরাপাড়া, কোচবিহার, ১৯৮৫ সালে গ্রন্থটিকে সম্পাদিত করেন। তিনি নাটকটি সম্বন্ধে লিখেছেন-

> ‘সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনার যে বিকাশ ঘটেছিল তা লেখক ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বাধীনোত্তর কোচবিহারে কৃষক পরিবারের মধ্যে গণ-চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পরিস্কার ইঙ্গিত এই নাটকে রয়েছে। নিজের অধিকার বিষয়ে সোচ্চার হওয়ার মানুষিকতা...জমির ফসল নিয়ে ভাগ, চাষী ও মালিকের বিরোধ...চাষীর দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়েছে। একই সঙ্গে কোচবিহারের গ্রাম্য পরিবেশ, বড় লোকের বহু বিবাহের রীতি, সাধারণ লোকের জীবন যাত্রা, মৈষালের জীবন কথা, বিধবা মেয়ে ঘরে থাকলে মা বাবার মানষিক অবস্থা, বিবাহ ব্যবস্থা, এবং টাকা দিয়ে মানুষের মন কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন’।[১৪৬]

লেখাটি পাঠ করলে– শ্রেণিসংগ্রামের ভাবনার জায়গাটি বাদ দিলে - যে নিরেট ইমেজ প্রতিস্থাপিত হয় তা রাজবংশী সমাজের আদিরূপের একটি গড়ন। কথা ও চরিত্র উভয়েই রাজবংশী হলেও কোথাও যেন শ্রেণির ধারণা তাদের ভিন্ন করে তুলেছে। আমরা আলোচ্য অংশের আলোচনায় ভিন্নতার প্রসঙ্গকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং দেখতে চেষ্টা করব মৈশাল কীভাবে জীবন র্নিবাহ করতেন। তার পথ চলার ছন্দে বিরাজমান থাকত অন্যরকম ভঙ্গী যা তথাকথিত রাজবংশী সমাজ থেকে আলাদা হয়ে ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন বলে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।[১৪৭] এমনও হতে পারে খুদার জ্বালা নিবারণ করার জন্য গ্রাম ছেড়ে জনশূন্য প্রান্তরে প্রকৃতির সঙ্গে আপন মনে কথা বলে সময় অতিবাহিত করার অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। লোক জনমানসের অন্তরালে এই সংস্কৃতির ভিত প্রসারিত হলেও আব্বাসউদ্দিন প্রথম আধুনিক সমাজের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন। তাই তাঁকে ভাওয়াইয়া সংগীত জগতের সম্রাট বলে অভিহিত করা হয়। প্রথমে আমরা মৈশালের জীবন চর্চার দিকে অভিনিবেশ করব। কেননা তার জীবন চর্চার মধ্যে সমাজের আদিমতম রূপ ও সংস্কৃতি লক্ষ করা যায় তেমনি এক বিকল্প আর্থিক বিষয়ের অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে।

৫.২. রাজবংশী সমাজে আদিমতার চিহ্ন

মৈশালের সংসার জীবন এবং মোষ নিয়ে বাথানে বাথানে যাযাবর ধরনের জীবন এই দুইয়ের প্রেক্ষাপট ঘিরে রচিত। রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক সংস্থানের এটি একটি বিকল্প পন্থা। কেননা, কৃষিকাজ বহির্ভুত পশুপালন ভিত্তিক অর্থনীতির ধারা এতে প্রতীয়মান। সংসার ছেড়ে মোষ, গরু নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো মধ্য দিয়ে মৈশাল জীবনের পর্বগুলি সৃষ্ট। রাজবংশী জীবন চর্চার এটি একটি দুঃসার্হসিক অধ্যায়। বনের জীবন থেকে বাড়ি ফেরার অনিশ্চয়তা যেমন রয়েছে তেমনি জীবনকে চ্যালেঞ্জে

রেখে বেচে থাকার এটি আর একটি পর্ব। অন্যদিকে পরিবারকে ছেড়ে থাকার যন্ত্রণা নিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। আনুষঙ্গিক এই পর্বগুলির থেকে সৃষ্ট হয়েছে বিরহ ও বেদনার এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপ।

এই ভিন্নভাবে ভাবার পরিধি উদাসীনতার নজীর হলেও নিজের কর্মের বিচ্ছুতি নয় বরং কর্মের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সাথে নিযুক্ত রাখা। এই জীবন ধারাকে কীভাবে শ্রমের ধারণায় আলোচনা করা যায়? গভীর জঙ্গলে (ব্রজেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নাটকে চিলাপাতা ও পাতলাখাওয়া অরণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন) মোষ চরিয়ে চরিয়ে জীবন কাটানো স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে সমাজের ছন্দ থেকে হারিয়ে হাওয়া বন মানুষের প্রতিচ্ছবি। তাঁরা যে বন মানুষ নন এবং সমাজের সঙ্গে এক গভীর বোঝাপড়ার সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যায় নীচের বয়ানটিতে--

> ‘দোতরার কথা যখন তুল্‌লু, তখন শোনেক ইয়ায় তো আর এ যুগের জিনিস নোয়ায়, আগের কালের মইষালের হাতের তৈয়ারী। ভাওয়াইয়া গান আর দোতরা মইষালে তৈয়ার করিছে। দোতরার মিলন সুরের খীরোল ডাঙ্গের মায়ায় এই বনুয়া মানুষ গুলা বাঁচিয়া আছি। না হইলে কুন্‌দিনে বনুয়া মানুষ হয়া গেইলং হয়।...দোতরায় আমার জীবন। দুইবেলা না খাইলেও চলে, কিন্তু দোতরা ছাড়া মইষাল এক দণ্ডও বাঁচির পারে না’।[১৪৮]

উপরের বয়ানটি দুই মৈশালের মোষ চড়াতে চড়াতে একটি আলাপ বা নিজের সম্বন্ধে সংলাপ। এই সংলাপে দোতরার সাথে মৈশালের সম্পর্ক ও ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তিগত স্থলের আভাস ফুটে উঠেছে। দোতরার ব্যবহার তাঁকে বন্যদের থেকে আলাদা করেছে এবং খাবার না খেলেও চলে কিন্তু দোতরা না হলে তাঁর চলে না। এই বক্তব্যে যেমন দারিদ্রতার ছাপ রয়েছে এবং যেই চাপ কাঠিয়ে ওঠার মাধ্যাম হিসাবে দোতোরা ও ভাওয়াইয়া গান বিকল্পতার জায়গা দখল করেছে। রাজবংশীরা বন মানুষ

যে নন তা আমরা বুঝতে পারি তাদের ঘরবাড়ি স্থান নিবার্চনকে কেন্দ্র করে। 'রাজবংশীরা ঘন সন্নিবিষ্ট বন বস্তিতে বসবাস করেছেন এমনটা দেখা যায় না। দেখা যায়, এঁরা জমি বা জোতের মাঝখানে ঘর বেঁধে বাস করতেই চিরকাল অভ্যস্ত এবং এখনও তাই করছেন। এঁরা গৃহ নির্মাণ করেন এইভাবে – 'বর্হিবাটি, ভিতরবাটি, দেবদেবীর স্থান, রান্নাঘর, গোয়ালঘর'।[১৪৯] বাড়ি নির্মাণে একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে যা অনেকটাই আধুনিক ভাবনার প্রকাশ বলা যেতে পারে। আবার মৈশালের বনের জীবন ও তার ভাওয়াইয়া গানের সুর গ্রাম্য সমাজকে বিচ্ছিন্ন রাখেনি। তার গান শুনে গ্রাম্য এক রমনী উত্তর দিচ্ছেন--

'কোন বা দ্যাশে বাড়ী তোমার, কিবা তোমার নাম
নদীর পাড়ে দোতরা বাজে কেনে বা করেন গান?
কেমন তোমার বাপো মাও, কেমন তোমার হিয়া,
এ হেন গাবুর বয়সে নাই করান কি বিয়া?

এর উত্তরে মৈশাল গান ধরছেন-

কোন বা দ্যাশে বাড়ী আমার, কিবা আমার নাম
এতগুলা ভাল মন্দ, পুছির কিবা কাম'?[১৫০]...

এই সংলাপের মধ্য দিয়ে উভয়ের পরিচয় এবং শেষে তাঁদের সম্পর্ক প্রেমের পরিণতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে থাকে। মৈশালের এই জীবন কাহিনী ঘিরে মৈশাল সম্পদায় সৃষ্ট হয়েছিল। অজানা পথ পাড়ি দেওয়ার এই দুঃসার্হসিক জীবনের অপর নাম মৈশাল, গাড়ীয়াল বা মাহুতবন্ধু বলা যেতে পারে। যেমন আসামের গোয়াল পাড়ায় মাহুতবন্ধু, রংপুরে গাড়ীয়ালবন্ধু আর কোচবিহারে মৈশালবন্ধু সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিল।

দূর্ভিসহ পথে জীবন পরিচালিত করা এবং তার সঙ্গে নির্লিপ্ত জীবন কাটানোর বেড়াজালকে ভেদ করতে সমিতি আধুনিক সম্পত্তির ধারণাকে এজন্যই বোঝহয় প্রায়োগিক বিষয় করেছিলেন। অন্যথায় সমিতি সমাজের পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। সমাজের শূন্যস্থান পূরণের দাবি সমিতির ভাষ্যে মেটানোর অকুতি প্রকৃত অর্থে অন্য কিছুর আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানায়। আদিম সমাজের কাঠামোটিকে সমিতির ছত্রতলে জায়গা করে দেওয়ার এটি একটি অন্যতম প্রয়াস। যেমন ছোট ছোট কাপড় না পড়া, মহিলাদের হাটে বাজারে না যাওয়া, পণ প্রথা বন্ধ করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতি।[১৫১] এই স্থানান্তরণ নিয়ে আসে এক নতুন কমিউনিটির ধারণা। অর্থাৎ সংবদ্ধভাবে অতীত পুনরুদ্ধারকে সামনে রেখে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যে দূরত্ব তার ব্যবধানের আবডালে নব-নির্মিত করতে থাকে ঐক্যতার প্রশ্নটি। এই জোয়ারের মধ্যে সমিতি নিয়ে এসেছিলেন আধুনিকতা, গণতন্ত্র, ঐক্য এবং নতুন উৎপাদনের সম্পর্ককে। এই যৌথ-প্রণালী ও তার ক্রিয়াকলাপের হাত ধরে আধুনিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিকভাবে, সমিতিতে ধনভান্ডারের প্রস্তাবনা এসেছিল সাংগঠনিক কাজ কর্ম পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা মেটানোর তাগিদে।[১৫২] তবে সমিতি যত বয়স বেড়ে পূর্ণ পরিণতির পথে এগোছিল অর্থ জোগানের পুরানো কায়দা[১৫৩] সঙ্গে সমিতি অভিনব প্রকল্প পরিকল্পনার দিকে নজর দিয়েছিলেন। সম্প্রদায়কে স্বনির্ভরশীল করে তোলার অর্থে বা আধুনিকতার মাপকাঠিতে সমাজকে রূপান্তরিত করার তাগিদে সমিতি কৃষি বাণিজ্য শিল্প বিষয়ে উন্নতি সাধন[১৫৪] বা ধনাগম ব্যবস্থা-কৃষি[১৫৫] কিংবা বাণিজ্যের প্রকল্প[১৫৬] বাঙ্গা ও চরকা[১৫৭] এবং শেষে কোম্পানী প্রতিষ্ঠা[১৫৮] উদ্যোগ নেন। কৃষি বাণিজ্য শিল্প বিষয়ে উন্নতি সাধন প্রকল্পের লক্ষণীয় আলোচনার বিষয় ছিল সেকেলে চিন্তা ভাবনা পরিত্যাগ

করে আধুনিক উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার কৃষি ক্ষেত্রে আগমন এবং তার থেকে উদ্ভূত অভিজ্ঞতাকে collectively ব্যবহার করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। কেননা, পুরানোর বদলে নতুনকে ব্যবহার করার পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের ভয়। সেই ভয়কে অতিক্রম করার উপায় হিসাবে অথবা নতুন যন্ত্র বা বীজ ব্যবহার করার গুণাবলী সমিতি প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন আলোচনা চক্রে। উদাহরণ হিসাবে দেখানো হয়েছে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সিংহ গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগের নির্দ্দেশ মত ৭ কি ৮ কাঠা জমিতে সুমাত্রা তামাক চাষ করেছিলেন। সেই তামাক বিক্রি করে পেয়েছিলেন ২৪৪ টাকা। সেখানে দেশী তামাক চাষ করলে বড় জোর ৪০ টাকা হত।[১৫৯] চাষের এই লাভাংশের জায়গা থেকে অথবা ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকে সমষ্টির অভিজ্ঞতায় পরিণত করার প্রয়াস নতুন জাতির ধারণাকে উদ্ভূত করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ধনাগমের এই উপায় রাজবংশী সমাজের স্তরন্নতির সূচক বলা যায়। শিল্প এবং বাণিজ্যের উভয় ক্ষেত্রে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়।

৬. রাজবংশী জাতি প্রতিরোধ

রাজবংশী সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং অগ্রগতির ভূমিকায় কতগুলো স্বনির্ভর প্রকল্প লক্ষ করা যায়। মনে হয় বহুদিন এই সমাজ বর্হিজগতের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেকারণে সমাজ পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টির দিকে নজর রাখতে হয়েছিল। দৈনন্দিন জীবন চলার পথে রাজবংশীদের এই আবিষ্কার রাজবংশী সমাজকে অনেক ক্ষেত্রে স্ব নির্ভর করে তুলেছে। এই সব কর্ম প্রয়াসকে আমরা জাতি প্রশ্নের প্রতিরোধ বলতে পারি। এই প্রতিরোধ ভাঙ্গতে বামপন্থীদের তেভাগার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তাদের রাজবংশী সমাজে

অনুপ্রবেশের পূর্বে লক্ষ রাখব জাতি প্রতিরোধের প্রশ্নটিকে যা বুঝতে সাহায্য করবে শ্রেণির জায়গাটাকে।

এতাবৎ হওয়া গবেষণাধর্মী আলোচনায় এবং লেখনীতে দেখা যায় রাজবংশী সমাজে আর্থিক ক্রমবিভাজন থাকলেও সামাজিক জীবনে এই ব্যবধান নেই বললে চলে। গরিব, ধনী, জমিদার, জোরদার, প্রজা, মৈশাল, মাহুত, গাড়িয়াল, অধিকারী সকলের গোত্র এক ও অভিন্ন।[১৬০] আর্থিক বৈষম্যের বিষয়টি বোধহয় অনেক পরে জায়গা করে নিয়েছিল। এই সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল না, শোষক শোষিতের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অন্যত্র যে বর্ণ-ভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল সেরূপ সমাজও গড়ে ওঠেনি।[১৬১] এখনও এমন কিছু গ্রাম রয়েছে যা রাজবংশীদের দ্বারা গঠিত। 'অন্যের' উপস্থিতি না থাকায় জাতি প্রশ্নটি কি বা জাতি চেতনার বিষয়টি নিয়ে তাঁদের ভাবতে হয়নি। যাইহোক, চাষবাস হল জীবিকার প্রধান অবলম্বন। সেই চাষবাসকে কেন্দ্র করে জমিদারি বা জোতদারি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই জোতদারি ব্যবস্থার মধ্যে আধিয়ারী প্রথার জন্ম। তবে জমিদার থেকে জোরদার সকলেই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত। সেই অর্থে সকলস্তরে মানুষের সামাজিকতায় একটা সমতার জায়গা ছিল। এই সমতা-ভিত্তিক জীবনের চিত্র পেশা থেকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতীয়মান। সামাজিক জীবনের এই অভ্যাস অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। কেননা জাতি প্রশ্নটি সবসময় ধর্মীয় ভাবনাকে ধরেই বিকশিত হয়েছে। এছাড়াও 'কামতাপুরি/রাজবংশী ভাষা' এই সমতার আর এক মানদণ্ড যা সমভাষি মানুষের ঐক্যবন্ধনে ভুমিকা পালন করে। সেই অর্থে রাজবংশী কোন একক ব্যক্তির পরিচিতি না হয়ে সম্প্রদায় বাচক হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে সেই ভাষা হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজবংশী অনুষ্ঠানের (বিশেষত রাজবংশী পরিচালিত) বা রাজনৈতিক আন্দোলনের

প্রধান বিচার্য বিষয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি অঙ্গ হিসাবে ভাষার দাবি রাজবংশীরা যদিও করে আসছেন বিগত শতকের ৭০র দশক থেকে। সেকারণে স্বতন্ত্র ভাষা দাবি নতুন নয় বরং ভাষাকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত করার প্রয়াস এক ভিন্ন পরিমন্ডল রচনা করতে সাহায্য করে। আমরা মূলত 'ভান্ডানী পুজা' ও তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে তার বিকাশ ও ব্যপ্ততার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে রাখব। যা আধুনিক রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বুঝতে সাহায্য করবে।

৬.১. ভান্ডানী পুজা ও ভাষাগত সম্প্রদায়

বর্তমান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 'ভান্ডানী পুজার' রেয়াজ লক্ষ করা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে মাথাভাঙ্গার (কোচবিহার জেলা) 'ভান্ডানী পুজা' প্রসঙ্গকে সামনে রেখে দেখানো হয়েছে এক ভাষাভাষি মানুষ পুজাকে কেন্দ্র করে কীভাবে তার অতীত পরম্পরাকে সামনে নিয়ে আসে। প্রতিবছর দূর্গা দেবীর বিসর্জনের পর-দিন এই পুজা শুরু হয়। চারুচন্দ্র স্যান্যালের *'The Rajbansis of North Bengal'*, গিরিজাশঙ্কর রায়ের *'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা পার্বন*; দীপক *রায়ের 'উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক দেবী ভান্ডানী*; বা মাথাভাঙ্গা ভান্ডানী কমিটি, পুজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর একটি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করেন 'ভান্ডানী পুজা সংখ্যা' নামে, তাতে লক্ষ করা যায় ভান্ডানী দেবীর 'ইতিহাস' নেই, আছে সে সম্পর্কে একটি বা দুইটি 'মিথ'। বলা হয়েছে দূর্গা দেবীর বিকল্প হিসাবে ভান্ডানী দেবীকে রাজবংশীরা বন্দনা করেন। কখন বনদেবী বা লক্ষ্মী (ভাণ্ডার) দেবী হিসাবে ভান্ডানী উপস্থাপিত হয়েছেন।[১৬২] রাজবংশী সম্প্রদায়ের যুবদের একটি শিক্ষিত অংশ এই পুজোর প্রধান উদ্দোগতা। প্রধানত '*সোদর*- একটি সামাজিক সংস্থা- ও *'মাথাভাঙ্গা পঞ্চানন স্মৃতিরক্ষা সমিতি'* তত্বাবোধনে ভান্ডানী পুজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। পুজাকে কেন্দ্র করে তিনদিন ধরে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাজবংশী প্রশ্নকে সামনে রেখে বিভিন্ন আলোচনা সভা বসে। সেখানে বিভিন্ন বিশিষ্ট অধ্যাপক, গবেষক, লেখক, প্রাবন্ধিক, কবি এমনকি কখন কখন রাজবংশীদের নিয়ে গড়ে উঠা আঞ্চলিক দলের নেতা এবং ক্ষমতাসীন শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা তাতে আমন্ত্রিত হন। অপরদিকে গোটা উত্তরবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশ এবং নেপাল থেকে বিভিন্ন শিল্পীদের আগমন ঘটে।[১৬৩] এক বর্নাঢ সাংস্কৃতিক মেলা আরাম্ভ হতে দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমাগমে মাথাভাঙ্গা এই তিন দিন অন্য চেহারা নিয়ে আর্বিভূত হয়। এই অন্যতাকে পুজা কমিটি বলে থাকেন 'চাঁদের হাট'।[১৬৪] এরা মুল স্রোতের পার্টি বা দলের সমর্থক হলেও এই প্লাটফর্ম রাজবংশী সহমর্মিতা তাঁদেরকে 'ইমোশনাল কমিউনিটি'তে[১৬৫] পরিণত করে। অন্যথায় '*সোদরে*র অভিপ্রায় রাজবংশী অতীত তথা সংস্কৃতিকে ভান্ডানীর মঞ্চে এমনভাবে উপস্থাপিত করা যাতে আগত দর্শকদের নস্টালজিক করে তোলে।[১৬৬] *'হারে যাওয়া'* (লুপ্ত) সংস্কৃতিকে রাজবংশীদের সামনে নতুন করে উপস্থাপন এবং তার ইমেজকে এমনভাবে প্রতিফলিত করে, মনে হয় অতীতের পুনঃআর্বিভাব সেই অতীত ফিরিয়ে দিয়েছে। কোথাও যেন নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আত্মসন্তুষ্টি সকলের মুখে চোখে আভাসিত হয়। অর্থাৎ হটাৎ করে রাজবংশী সত্তার উপস্থাপন (মঞ্চে) যা তার অতীতকে স্মরণ করতে সাহায্য করে। আবেগঘন আবেদনে ভরিয়ে তোলে মঞ্চ। সেখান থেকে বলতে শোনা যায় (পরস্পরের আলোচনায়) *'হামার দেশী ভাষায় কতা কওয়া দরকার*[১৬৭] অর্থাৎ রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষায় কথা বলা উচিত। অন্যথায় মঞ্চের থেকেও দেশি ভাষায় বক্তিতা দেওয়া, অভিবাদন জানান এবং আনুষঙ্গিক পর্বগুলি পরিচালিত হতে দেখা যায়।[১৬৮] ফলত একপ্রকার তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা, ভাবের আদান প্রদান করা, দীর্ঘদিন পর পরিচিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়া,

তাদের সাথে মন খুলে কথা বলার একটা পরিসর হয়ে উঠে। এটি ভারাক্রান্ত মনের জটিলতার জট খুলে হালকা হওয়ার প্রকাশ যা তার শরীরগত ভাষার ভঙ্গীতে (Body language) আন্দোলিত হয় যাকে রাজবংশী জাতীয়তা বলা যেতে পারে। সেখানে 'আবেগ এবং নিজস্ব ভাষার ব্যবহার' রাজবংশীদের এক গোলার্ধ বাংলা ভাষাভাষি মানুষদের অভ্যন্তরে। বর্তমান উত্তরবঙ্গের প্রাত্যহিক জীবনে উভয়ের (রাজবংশী ও অনান্যদের) ভাষায় বাংলার প্রাধান্য থাকলেও উক্ত পরিসরে রাজবংশী সমচ্চারিত কন্ঠের গুঞ্জন বয়ে চলে। জাতি, ভাষা ও তার সংস্কৃতিকে ঘিরে রাজবংশীদের এই কার্যক্রম যেন তার আদিমতার অস্তিত্ব অনুসন্ধানে এক অন্য পদক্ষেপ। ভাষাকে রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়ে এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস রাজবংশী জাতিকে 'ভাষাগত সম্প্রদায়' গঠনের দিকে নিয়ে যায়। এগিয়ে গেলেও কোথাও যেন বিশ্বায়নের আঙ্গিকে জড়িয়ে ফেলে। অন্যথায় কমিটির সদস্যদের চালচলন, পোশাক পরিচ্ছদ, ভাবনাচিন্তায় স্ববিরোধী ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। রাজবংশীদের এই এলিট গ্রুপটি তার আচরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ রাজবংশীদের থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে। স্বরাজ বসু এই গ্রুপকে বিবেচনা করেছে 'অনুপস্থিত রাজবংশী' হিসাবে। তিনি লিখেছেন-

> 'This advance group among the Rajbansis whom we may refer to in the absence of a better term as the Rajbansis 'elites', followed the upper caste Hindus of the region in dress, lifestyle, marriage customs, and religious practices. Discarding their traditional clothes, both men and women dressed in the fashion of the upper castes in society. In this group there were now also restrictions on the movement of women who were not allowed to work in the field, or go to market to sell goods, nor were

they mermitted to tolk freely to unknown men either at home and outside. So far asmarriage customs were concerned, except phul biha i.e. the regular form of marriage; all other irregular forms were prescribed for them. Widow re marriage was not allowed either'.[১৬৯]

এই চিহ্ন মনে দাগ কাটলে পরস্পর পরস্পরের থেকে কিছুটা বিভাজিত হয়ে পড়ে। অথচ এদের পুর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত করেছিল কীভাবে স্থানীয় উপকরণ ও পন্থাকে অবলম্বন করে যৌথভাবে একটি স্ব-নির্ভরশীল জাতি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই স্ব-নির্ভরতার কিছু নির্দশন ও তার ব্যাখ্যার জায়গা থেকে আমরা আলোচনা অভিনিবেশ করব।

৬.২. স্ব-নির্ভর জীবন ধারণ পদ্ধতি ও পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক

প্রথমত: রাজবংশী সমাজ গড়ে ওঠেছে গ্রামীণ পরিবেশকে ঘিরে। শহর থেকে অনেকটা দূরে অথবা শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে। স্ব-নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার পশ্চাতে স্থানের অবস্থান বিশেষ ভূমিকা রাখে। উত্তরবঙ্গের ভূপ্রকৃতি ও চাষের জমি যেমন উর্বর তেমনি প্রত্যেক বছর বন্যা জমিকে নতুনত্ব করে তুললে অনায়াসে ফসল ফলান সম্ভব হত। এর পাশাপাশি বনাঞ্চলের উপর তাদের লব্দ অভিজ্ঞতা একটা বাড়তি সুবিধে এনে দিয়েছিল। তার দু একটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল। রাজবংশীরা স্থানীয় উপায়ে তেল প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কার করেছিল। কেরোসিন তেল বা মাটিয়া তেল পাওয়া না যাওয়ায় এর পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করতেন 'এ্যান্ডা তেল'।[১৭০] আধুনিক সাবানে বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতেন 'ছ্যাকাপাড়া' বা 'ছেকাপাড়া'।[১৭১] এই ক্ষারকীয় জল দিয়ে বিশেষ ধরনের খাবার বানানো হয়। ছেঁকা বা ছ্যাকা জাতীয় (সোডা) এক ধরনের খাবারের চল এই সমাজে রয়েছে।[১৭২] বাজারি

জুতা রাজবংশী সমাজে আসার আগে তাঁরা 'খড়ম' নামে এক ধরনের জুতা ব্যবহার করতেন। 'খড়ম' তৈরি করা হত বাঁশ বা কাঠ দিয়ে।[১৭৩] আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি রাজবংশী সমাজে অনুপ্রবেশের পূর্বে ভেষজ গাছপালা ব্যবহার করতেন রোগ নিরাময় করতে। অর্থাৎ গাছপালার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল গভীর। সামান্য জ্বর সর্দি বা কোথাও কেটে গেলে বিভিন্ন গাছের শেখর বাকরের সেখ দিয়ে তার নিরাময় করতেন। শুধু মানুষজন নয় বরং পশুপাখিদের চিকিৎসায় ব্যবহার করতেন স্থানীয় উপায়।[১৭৪] এছাড়াও বস্ত্র বানানো থেকে মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং বাড়ির ব্যবহারিক বিভিন্ন জিনিসপত্র নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারত।[১৭৫] অন্যদিকে পারিবারিক সম্পর্ককে বন্ধুত্বমুলক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য 'সখা ধরা' 'সখি ধরা' 'মিত্র পাতানো' 'পানিছিটা' 'বাপ দায় দেয়া বা ধর্ম বাপ বানানো'র বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করত।[১৭৬] 'ধর্ম বাপ' বা 'ধর্ম বেটি' বানানো রীতি কবে থেকে রাজবংশী সমাজে শুরু হয়েছে তা সঠিক ভাবে বলা না গেলেও অনুমান করতে পারি রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক অতিকথন উক্ত সমাজকে প্রভাবিত করেছিল যা অনূপূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রামায়ণে লক্ষ করা যায় বাল্মিকি সীতাকে 'ধর্ম পুত্রী' বলে স্বীকার করেছিলেন। এমনকি কোচরাজ পরিবারে এই প্রথার চল দেখতে পাওয়া যায়। উপনিবেশিক পর্বে, ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের সঙ্গে কোচরাজ পরিবারের এক পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে সুবাদে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মহারাজ নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ধর্ম মা' বলে সম্মোধন করতেন এবং রাণীর সন্তান বলে নিত্যেন্দ্রনারায়ণ সম্পর্ক তৈরি করেন।[১৭৭] অর্থাৎ এক পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেজন্য নিত্যেন্দ্রনারায়ণের নাম রাখা হয়েছিল ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ। সাহেব পরিবারের সদস্য হওয়াতে পদবীতে তার ছাপ পড়ে।

কোচরাজ পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পর্কের জায়গাটা ছিল ‘Ethnic Identity’ মধ্য দিয়ে। সেকারণে সেখানে রাজ আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। বিপদে মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা যেমন রামায়ণ বা রাজ পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য তার প্রভাবকে আত্তীকরণ করার জায়গাটি রাজবংশী সমাজে বিকাশ লাভ করে কুষান যাত্রা বা পালা গানের মধ্য দিয়ে। বর্ষার মরশুম শেষ হতে না হতেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে যেত এই বিনোদনের উৎসবগুলি। লব কুশের জীবন কাহিনী থেকে রাম সীতার জীবন দর্শন, লক্ষ্মণের ভাতৃত্ববোধ এই যাত্রা বা পালা গানের মধ্য দিয়ে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে তৈরি হয়েছে পিতামাতা প্রতি শ্রদ্ধা, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের অটুট বন্ধন এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। ঘর বাড়ি বানানো থেকে বিভিন্ন হিসেব নিকেশে রামায়ণ বা মহাভারতের প্রভাব এতটাই প্রবল যে রাজবংশীদের তার অনুরূপ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।[১৭৮] রাজবংশীদের এক একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমগোত্রীয়দের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে। গ্রামগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জোতের মাঝখানে। যিনি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করতেন তাকে ‘গিরি’ বা ‘দেওয়ানি’ বলে মানা হত (মুঘল যুগের দেওয়ানি নয়)। তবে ‘গিরি’ বা ‘দেওয়ানি’ উভয় ক্ষেত্রে পুরুষ প্রধানদের কথা উঠে আসলেও নারীর নাম আমরা দেখতে পাই না। অনেকে মনে করেন দেওয়ানি পদটি ছিল বংশানুক্রমিক।[১৭৯] গিরি তার আত্মীয়স্বজনদের ডেকে এনে বসতি তৈরি করে দিতেন। আত্মীস্বজনরা ‘প্রজা’ নামে পরিচিত হতেন।[১৮০] পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে এই সমাজে জোতদার জমিদার প্রজা সকলেই কৃষক। অন্যদিকে তাঁরা আত্মীয় এবং একই গোত্রে অবস্থান করে। সামাজিক বন্ধনে, গোত্রে এবং পেশাগত জায়গাটি পারস্পারিক সম্পর্ক এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল

যেন 'অপরে' ধারণাই অনুপস্থিত ছিল। উক্ত অঞ্চলে সেই অর্থে বর্ণের ধারণাও বঙ্গের নিরিখে বিকাশ লাভ করেনি।

একটা 'বন্ধুত্বমূলক' সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প রাজবংশী সমাজকে করে তুলেছিল অতিথিপরায়নশীল। অতিথিকে রাজকীয় কায়দায় আপ্যায়ন করার রীতি আজও সমাজে বর্তমান। কেননা, কোচবিহার ছিল রাজশাসনের দেশ। রাজার প্রজারা রাজকীয় বিষয়টি অনুকরণ করবে এমনটা বলা যেতে পারে। বাড়িতে কেউ এলে পান সুপারির বাটা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। পরে চা পান থেকে খাবারের ও ব্যবস্থা করতে দেখা যায়। বিশেষ করে খাবারের সময় কেউ এলে তাকে না খাইয়ে ছাড়া হত না। একটা সময় দেখা গেছে দুপুরবেলা বাড়ির কর্তাকে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। রাস্তার কাউকে যতক্ষণ না বাড়িতে ডেকে এনে খাইয়েছে ততক্ষণ কেউ অন্ন গ্রহণ করতেন না। বাড়ির কর্তা না খেলে অন্যরা খেতে পারতেন না। রাজ আমলের কোচবিহারের এক দারোগা বাবু তাঁর চাকরি জীবনে গল্প বলতে গিয়ে বলেছেন-

> কোচবিহার রাজ্যে পুলিশের চাকরি করতে আসতেন বাইরের থেকে অনেকে। তাদের বেতন কম ছিল। কিন্তু যেটুক বেতন পেতেন সবটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কারণ তাদের খাবারের জন্য চিন্তা করতে হত না। কেননা, কোন না কোন বাড়িতে তাদের খাবার জুটে যেত। বিশেষত দুপুর বেলায় একজনকেও থানায় পাওয়া যেত না।[১৮১]

বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে গ্রামের প্রায় সকলে এসে তাদের সাথে আলাপ জুড়িয়ে দিত। মনে হয় বাড়িতে একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে অনেকেই আত্মীয়দের সঙ্গে খাবার দাবার খেয়ে তারপর বাড়ি ফিরত। অন্যদিকে, আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার বিষয়টি ছিল অনেকটাই অনুরূপ। যাকে রাজবংশীরা 'সাগাই খাওয়া' বলত। *'সাগাই খাওয়া'*র যাবার আগে সেই বাড়িতে প্রায় সপ্তাখানেক ধরে চলত আনন্দের

উৎসব। সাগাই বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত করতে হত বিভিন্ন উপকরণ। এখন যেমন বাজার থেকে কিছু একটা কিনে নিয়ে যাওয়া হয় সে সময় তারা নিজেরাই হাতে বানিয়ে নিত মুড়ি, চিড়ে, মোলা (মোয়া), দই বা বাড়ির আবাদ করা বিভিন্ন ফল ও ফসল। মুড়ি চিড়ে বানানোর জন্য বা অনান্য জিনিষপত্র তৈরি করার জন্য যে সময়টুক লাগত, সেসময় বাড়িতে চলত আনন্দের অন্য এক মেজাজ, মনে হয় একটা নতুন কিছু হতে চলেছে। যার বাড়িতে যাওয়া হত সে বাড়িতে কয়েকদিন আগের থেকে দেওয়া হত খবর। *'সাগাই'* আসবে এই কথা শুনতেই তাদের বাড়িতে চলত খুশির জোয়ার। *'সাগাই'* কি খাবে তার জোগারযাম থেকে বাড়িঘর ঠিকঠাক করার প্রস্তুতি চলে। বেশিরভাগ বাড়ি তৈরি হত খড় ও বাঁশ দিয়ে। ফলত প্রত্যেক বছর ঘর সারাই করতে হত। কাজ করার যেন একটা অন্য আনন্দ শরীরের মধ্যে আভাসিত হয়। দুই বাড়ির আনন্দ যেন দুই গ্রামের হয়ে উঠত। এই পারস্পরিক গভীরতার স্পন্দন রাজবংশীদের করে তুলেছে সহজ সরল, ধর্মপরায়ণ এবং সৃষ্টিশীলতার এক প্রতীক। রাজবংশী জাতির আতিথেয়তার প্রসঙ্গটি এতটাই আন্তরিক যা উত্তরবঙ্গকে এক অন্যমাত্রা প্রদান করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় উত্তরবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি বড় উৎস হল এই অতিথিপরয়ণতা। ভগবানের ধারণায় (Concept of God) যেমন আর্য সংস্কৃতি, অনার্য সংস্কৃতি (মাষান পুজা[১৮২]) এবং মুসলিম ধর্মের সত্যপীরের পুজা এই তিন ধর্মের ভাবধারাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজবংশী সমাজ। এই বহুমুখি ধর্মের প্রভাবের মধ্যে থেকে তারা সরলতাকে অবলম্বন করেছেন যা তাদের হিংসা বা দ্বন্ধ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এ জন্যই বোধহয় দেশভাগ পরবর্তীতে উদ্বাস্তু আগমন ও ধীরে ধীরে নতুন করে তাদের জীবন সংগ্রাম পর্বে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার নজীর উত্তরবঙ্গে দেখা যায়নি।

৬.৩. পরিবার-কেন্দ্রিক জীবনে একতার নজীর

কোন বিষয়কে - সামাজিক বা পারিবারিক যাইহোক - আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করার প্রচেষ্টা রাজবংশী সমাজ কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা যেতে পারে। আলোচনার বৈঠকখানা ছিল 'ডারিঘর' বা উঠোনে আগুনের কুন্ডু সাজিয়ে (শীতকালে) তার চার পাশে গোল করে বসে চলত শলা পরামর্শ। অনেকটা ইউরোপীয়দের বৈঠকখানার মত একটা ব্যবস্থা। একে রাজবংশীরা 'আগুন পোয়া' বলে। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির মতে 'In the winter after leaving the bed some time spent inside the house in smoking round a fire...'[১৮৩] পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করে সিদ্ধান্তের দিকে যাওয়ার প্রচলন ছিল। এই রেয়াজকে মনে হয় পঞ্চানন বর্মা ক্ষত্রিয় সমিতির সভায় নিয়ে এসেছিলেন। ফলত তার সমিতিতে সম্পাদক পদে আসিন হওয়ার বিষয়টি ছিল সভার উপস্থিত সকলের সমর্থন নিয়ে। এমনকি সমিতির আদর্শ ও ভাবনার একটা বড় জায়গা যে যৌথ ভাবে পরিচালিত হতে দেখা যায় তার আদিমসত্তা লুকিয়ে রয়েছে রাজবংশী সমাজে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় তিনি তাকে মানদণ্ডের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণে অতি অল্প সময়ে ক্ষত্রিয় সমিতিকে রাজবংশী জনমানসে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। আদিম ও আধুনিকতার মধ্যস্তরে পঞ্চানন বর্মার অবস্থানকে একদিকে রাজবংশীরা জাতির পিতা ন্যায় মর্যাদাপূরণ ভূমিকায় আসন করে দিয়েছিল আর অন্যদিকে যা, তাকে তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের থেকে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাহায্য পেতে সাহায্য করে।[১৮৪]

৬.৪. হাউলি প্রথা

সমষ্টিগত ভাবে (Collectively) সমাজকে নিয়ে ভাবনার একটি বড় দৃষ্টান্ত হল প্রচলিত প্রথা-প্রকরণ যা এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যেন যৌথতার অর্থ বহন করে। আলাদা করে নয় বরং সমষ্টিকে নিয়ে ভাবনার জায়গাটি প্রকাশ পেয়েছে। সেই অর্থে রাজবংশী বিষয়টি সমষ্টিবাচক শব্দের অনুরূপ বলা যেতে পারে। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবনযাপন করার অর্থ যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় তাঁদের জীবন চক্রে, তবে কৌম জীবনের চিহ্ন সেখানে নেই। রাজবংশীদের প্রথা-প্রকরণের পরম্পরা বা বংশানুক্রমিক ঘটনা প্রবাহের একটি লক্ষণ সমাজে *'হাউলি'* দেওয়া বা নেওয়া নামে জনমানসে প্রচলিত। অন্য অর্থে একে বলা হয়ে থাকে 'ঢোকা দেওয়া' যার অর্থ সাহায্য করা। একে অপরের পাশে নিঃশর্তে পাশে দাঁড়ানো। বিনিময়ের ধারণাতে নয়, পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে। মানবিকতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন একে বলা যেতে পারে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে লক্ষ করা যাবে একজনকে সাহায্য করতে গ্রামের একটি অংশ নিঃশর্তে একসঙ্গে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ান। এই পাশে থাকা মানসিকতার অপর নাম রাজবংশী সমাজে *'ঢোকা দেওয়া*। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, মনে করুন, গ্রামের কোন ব্যক্তির বাড়িঘর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এই বিপদ দেখে গ্রামের মানুষ নীরবে এসে একে একে কেউ বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটছে, কেউবা ঘরের বাঁশ কেটে খুঁটি বানাছে, কেউবা ঘরের মাপঝোক নিচ্ছে। গ্রামের দু একজন মহিলা এসে তাঁদের জন্য খাবার বানাচ্ছে। সবাই মিলে যেন এক মহান কার্য উদ্ধারে সামিল হয়েছে। দেখতে দেখতে ঘরগুলো আবার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরছে। এই জন্য রাজবংশী সমাজে একটি প্রবাদ রয়েছে *'দশে মিলে করি কাজ তাতে নাই কোন লাজ'* (লজ্জা)। এতে একটা অন্য রকমের ছবি প্রতিভাত হয়

সমাজের বুকে। অনুরূপ আর একটি প্রথা-প্রকরণ হচ্ছে 'গাতা দেওয়া'। একসঙ্গে চার পাঁচটি পরিবারের কৃষক মিলিত হয়ে কাজ করে। হাল চালানো থেকে পাট নিড়ানি কিংবা ধান কাটা থেকে পাট কাটা সব কাজ যৌথভাবে সম্পন্ন করে থাকেন। আজ এক জনের ত কাল অন্যজনের। কাজের একঘেয়েমিতা কাঠিয়ে ওঠার এক অন্যতম মাধ্যম।[১৮৫] 'হাউলি' দেওয়ার বিষয়টির দিকে তাকালে অনুরূপ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। 'হাউলি' দেওয়া বা নেওয়ার প্রসঙ্গটি জড়িয়ে রয়েছে চাষ আবাদকে জুড়ে। মরশুম ভিত্তিক চাষ যেমন 'কোষ্টা কাটা' (পাট কাটা), ধান কাটা বা লাগানো ক্ষেত্রে 'হাউলি' দেওয়া বা নেওয়ার জায়গাটি জড়িয়ে রয়েছে। মনে করুন, এক ব্যক্তির একসঙ্গে ১০ থেকে ১৫ বিঘা জমির ধান পেঁকেছে। একসঙ্গে এতগুলো জমির ধান ঘরে তোলা একার পক্ষে বেশ কঠিন। তখন তিনি 'হাউলি' নেন। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ গিরি তাঁর বাড়ির কাজের লোকদের বা নিজের ছেলেপুলেদের বলতে থাকেন *'হাউলি ন্যাওয়া খায় রে, সবাইকে খবর দ্যাও'*। গ্রামের ছেলেপুলে বা যারা বেশ কাজ করতে সমর্থ তাদের নির্দিষ্ট দিনে আমন্ত্রণ দেওয়া হয় ধান কাটার জন্য। গ্রামের দু একজনকে বললে তারা আবার তাদের পরিচিতদের বলেন *'অমুক দিনে অমুক ফল্লা হাউলি নিচে*'। তারাও আমন্ত্রণ পেয়ে নির্দিষ্ট দিনে কাজে যোগদান করেন। একটা চেন মাফিক আমন্ত্রণ পর্ব চলতে থাকে। দিন নির্দিষ্ট থাকে কারণ অন্য গিরিকেও 'হাউলি' দিতে হবে। পরপর হাওলি দেওয়া চলতে থাকে মরশুম পর্যন্ত। নিদির্ষ্ট দিনে সবাই সকাল সকাল গিরির বাড়িতে উপস্থিত হতে থাকে। চা পান খেয়ে ধীরে ধীরে কাজে অংশ নেয়। এমনকি গিরির ছেলেপুলে বা বাড়ির অন্য পুরুষরাও তাদের সাথে কাজে যোগ দিয়ে থাকেন। যদিও তাঁরা অন্যসময় বাড়ির কাজ করেন না। কাজের লোক দ্বারা মাঠ ভরে ওঠে। তাদের দেখে গ্রামের অনেকেই এসে কাজে যোগ দেয়, বিনা

আমন্ত্রণই। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাজ দেখার জন্য ধানের খেতের আলে জমায়েত করে। ধান কাটার ফাঁকে ফাঁকে চলে বিভিন্ন গল্পগুজব, ইয়ারকি ঠাট্টা, বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচনের ব্যাখ্যা।[১৮৬] তা শুনে ছোটদের খিল খিল হাসি আর বড়দের কাজ করার মধ্যে আনন্দের ছায়া প্রকাশ পায়। সব মিলিয়ে এক অন্য পরিবেশ বিরাজ করে। এমন দেখা গেছে, যে 'হাউলি' দিতে এসেছে তাঁরও এক বা দু বিঘা জমির ধান পেঁকেছে। তাড়াতাড়ি ধান না কাটলেই নয়। এমত অবস্থায় দেখা গেছে গিরির ধান বেলায় বেলায় কাটা হলে আবার সকলে মিলে তাঁরও জমির ধান কেটে দিচ্ছে। তবে তাদের সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা গিরির বাড়িতেই হত। কিন্তু কেউ যে অসন্তুষ্ট হয়েছিল এমনটা নয়। কারণ পরের দিন তারা আবার অন্যের বাড়িতে 'হাউলি' দিতে বের হয়েছে। কার বাড়িতে কোন দিন 'হাউলি' দেওয়া হবে তার যেন একটা অলিখিত লিষ্ট থাকত। এরা যে সকলে পরের দিনে 'হাউলি' দিতে গিয়েছিল এমনটাও নয়। যারা গেল না সেই জায়গায় আবার অন্য কেউ এসে যোগ দিচ্ছে। পালাবদলের মধ্য দিয়ে কাজগুলি চলতে থাকত। এক বিস্ময়কর দায়বদ্ধতার রীতির প্রচলন চালু করেছিলেন রাজবংশীরা। বিনা মজুরিতে অন্যের কাজ করে দেওয়ার নজীর বঙ্গে বোধহয় আর কোথাও নেই। সময় এবং শ্রমের দাবি এখানে কোথায়? যদিও বামফ্রন্ট সরকার আলোচ্য পর্বে ক্ষমতাশীল। বেশি পুরানো দিনের কথা নয়। ১৯৯৭-৯৮ বা ২০০০ সনের স্মৃতি। বাম সরকারের ৩৪/৩৫ বছরের শাসনের একেবারে শেষদিকে এই রকম ব্যবস্থা রাজবংশী সমাজে লক্ষণীয়। দু-এক জন রাজবংশী - যারা শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করে - তাদের সাথে কথা (এই বিষয়ে) হলে একে তারা বলে থাকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হিসাবে। একে সাধারণ কৃষকদের ঠকিয়ে নেওয়ার একটি পন্থা বলে মনে করেন।[১৮৭] বিশিষ্ট অধ্যাপক সুগত বসু তার *'বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়*

বাংলার কৃষি-সমাজের কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগত বিন্যাস' নামক শিরোনামে *'হাউলি'* প্রথার নাম উল্লেখ করেছেন। রাজবংশী সমাজের প্রথা-প্রকরণে *'হাউলি'* অবস্থান সম্পর্কে তিনি বেশ যে সজাগ 'হাউলি'র নামোল্লেক তা বুঝতে সাহায্য করে। তিনি উত্তরবঙ্গের ভূমিব্যবস্থার যে বয়ান দিয়েছেন তা পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার জায়গাটি জোতদারি ব্যবস্থা ও তার অনুসঙ্গ সম্পর্ক ঘিরে। জোতদারের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব এবং আধিয়ারের উপর একচেটিয়া প্রভাব চাষিদের আর্থিক জীবনে এক দুস্তর বৈষম্য প্রকট করে যা পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই দৈন্যতার মাপকাঠি তিনি নির্ণয় করেছেন জোতদার বা গিরির সঙ্গে আধিয়ারের সম্পর্কের মধ্যে। তিনি লিখেছেন-

> 'এরা (আধিয়ার) বেশিভাগ গরীব চাষী, এবং আর্থিক অনটনের মাসগুলিতে জোতদারাই এদের সাহায্য করত। এরা কি ফসল বুনবে তা জোতদারেই ঠিক করে দিত, এবং জোতদারের খামারেই এদের উৎপাদিত শস্যের ভাগ বাঁটোয়ারা হত। এর থেকে বোঝা যায় যে এদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল।...আধিয়ারদের জোতদারদের ওপর নির্ভরশীলতা সব জায়গায় সমান ছিল না। তার বেশি কম ছিল।...এমনকি এরা জোতদারদের 'আধি' জমিতেই ঘর বেঁধে থাকত। রংপুরে ও জলপাইগুড়িতে যে সব আধিয়ার এইভাবে জমির সাথে বাঁধা পড়ত তাদের অবস্থা প্রায় ভূমিদাসের মতো হয়ে দাঁড়াত। জোতদারের খামারে বিনা পারিশ্রমিকে আধিয়ারের কাজ করতে হত বলে ''হাউলি'' প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল'।[১৮৮]

বসুর উপরিউক্ত 'হাউলি' নিয়ে অনুব্যখ্যা বামপন্থার অনুরূপ বলা চলে। জোতদার ও আধিয়ার মধ্যেকার শোষণমূলক সম্পর্ক এবং পারিশ্রমিকের বিষয় সামনে রেখে তার যে ব্যাখ্যা তিনি রেখেছেন সেখানে জাতি প্রশ্নটি উহ্য রেখে দ্বন্দ্বমূলক সমাজ নির্মাণের

উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ আধিকারিকদের প্রতিবেদন নির্ভরশীল তথ্য সূত্রের প্রতি অতিরিক্ত আশ্রয় নিতে গিয়ে চাষির প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা বা তার যে চেতনা সে বিষয়ে আলোকপাত করার আগ্রহ দেখা যায়নি। আপাতদৃষ্টিতে 'হাউলি' প্রথা বাইরের থেকে পর্যবেক্ষণ করলে শোষণের চিত্র প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু তার ভূস্থানিক সম্পর্কের সঙ্গে আধিয়ার এবং গিরির জাতিগত যে বিন্যাস সেখানে আধুনিক শ্রমের প্রশ্নটি কীভাবে রাজবংশী ভেবেছিলেন তা খুব সহজে বলা কঠিন। কেননা, অনুপূর্বের আলোচনায় রাজবংশীর সম্পত্তির ধারণার যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাতে একপ্রকার শ্রম বিষয়টি অনুপস্থিত ছিল। অন্যথায় 'হাউলি' প্রথার আভ্যন্তরিণ গঠন প্রণালীর বিন্যাসগত জায়গাটি লক্ষ করলে প্রতিভাত হয় সহযোগীতামূলক আবেদন যার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ না হয়ে বরং বন্ধুত্বমূলক বা আত্মীয়তার বাঁধন দৃঢ় করে। এটিকে লেনদেন বা ক্রয় বিক্রয়ের জায়গা থেকে উপস্থাপন করলে শোষণের একটি প্রক্রিয়া মনে হতে পারে। 'হাউলি' ত রাজবংশী সমাজে আনন্দ উৎসবের একটি পর্ব। গিরি বা জোতদার আধিয়ারকে বলে দিচ্ছে কি করতে হবে আর হবে না- তার অর্থ যদি প্রজা প্রভুর সম্পর্কের জায়গা থেকে ধরা হয় তাহলে তার যে আত্মীক বন্ধন সেটা ভেঙ্গে পড়ত। শোষণ বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজবংশীদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লক্ষ করা গেছে রংপুরের ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেই নিরিখে অন্যায়ের প্রতিকার করার কোন প্রতিধ্বনি জোতদারদের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গে দেখা যায়নি। কেননা, গিরিকে প্রজারা পিতার ন্যায় মনে করেন এবং আপদে বিপদে গিরি তাদের রক্ষার করতেন। শুধু গিরি বা জোতদার নন, রাজবংশী পরিবেশে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাকে এক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

যে সময়ের হাউলি প্রথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্বে। এসময় ত জোতদারি ব্যবস্থা টিকে ছিল না। 'হাউলি' যদি শোষণের একটি প্রক্রিয়া হত তাহলে তার অস্তিত্ব টিকে থাকার কথা নয়, বিশেষত জোতদারি ব্যবস্থার পরবর্তী জীবনে। এই পর্বে সকলেই গরিব কৃষক। গরীব হলেও, এরা পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই জায়গায় হাউলি প্রথার গুরুত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে 'কৃষকের নিজস্ব চেতনা'র জায়গাটি কথা বলা হয়।[১৮৯] যে চেতনা জায়গা থেকে তাদের প্রতিরোধ শক্তি অর্থাৎ তার আন্দোলনের ভাষা বিকাশ লাভ করলেও কৃষকের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা তাদের লেখনীর বাইরে থেকে যায়। রাজবংশী কৃষক অভিজ্ঞতা সেই নিরিখে ইতিহাসে জায়গা করে নিতে না পারায় শ্রমের দাবি সঙ্গে 'হাউলি' প্রথাকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। এই যুক্ত করার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের তেভাগার লড়াইকে দেখানো হয়েছে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তেভাগার সংগ্রাম কি কৃষকদের স্বতঃফূর্ত্ব লড়াই নয় ? এই সকল প্রশ্নের অনুসন্ধান আরাম্ভ করার পূর্বে আমরা আলোচনা করলাম রাজবংশী প্রতিরোধের প্রশ্নটি। একই সঙ্গে পঞ্চানন বর্মার আধুনিক জাতি গঠনের প্রয়াসকে। এই উদ্যোগে সমাজ রূপান্তরের চিত্র যেমন আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তেমনি আদিমতার বিশেষত্ব থেকে যায় রাজবংশী সত্তায়। এতে সমাজের কিছু কিছু অংশে সংস্কার এসেছে কিন্তু তার আদিমতা হারিয়ে যায়নি। এর পরবর্তীতে রাজবংশীরা শ্রেণির ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হতে শুরু করেছিল। দেখা যায়, ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়ি কিংবা রংপুর জেলাতে কৃষক সংগঠন গঠিত হতে।[১৯০] অর্থাৎ পঞ্চানন বর্মার মৃত্যুর তিন বছর পর। আর তেভাগার লড়াই শুরু হয়েছিল ১৯৪৬-৪৭ সালে। বর্মার মৃত্যুর এক দশক পরে। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রেণির ধারণা

রাজবংশী সমাজ কীভাবে আয়ত্ব করে নিল ? আবার যারা রাজবংশীদের মার্কসীয় ধারণার অনুশীলন দিতে গিয়ে নেতারা রাজবংশীদের ভাষা বুঝতে পারতেন না।[১৯১] তাহলে কীভাবে তার অনুশীলন চলত ? এই সব প্রশ্নের অনুসন্ধান করবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. W.W. Hunter: *A statistical account of Bengal*, vol x, (London, Trubner & Co., 1876); H.H. Risley: *The Tribes and Castes of Bengal*, vol 2, (Calcutta, Bengal Secreraríat Press, 1891).

২. Jogendra Nath Bhattacharya: *Hindu Caste and Sects, An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system.* (Calcutta, Thacker, Spink and Co. 1896); Sunity kumar Chaterji: *Kirata Jana Kriti*, (Calcutta, Asiatic Society, 1951); নিহাররঞ্জন রায়: *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ*, (কলিকাতা, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, ১৩৫২)।

৩.(https://thewire.in/inpolitics/bjp-bengal-elections-amit-shah-koch-rajbanshi-tmc-greater-cooch-behar) সম্প্রতি (২০২১) পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন রাজনীতিতে সরাসরি জাতি প্রশ্নটিকে দলাদলির মধ্য দিয়ে ভোট প্রচারে নেমেছিলেন। সেখানে রাজবংশী প্রশ্নটি ততধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে নেমেছিলেন রাজবংশীদের ভোটের দিকে তাকিয়ে। কোচবিহারের মাটিতে দাঁড়িয়ে ১১.০২.২০২১ তারিখে ঘোষনা করেছিলেন যদি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করে তাহলে রাজবংশীরা পাবে নারায়ণী (সেনা) ব্যাটালিয়ন অর্থাৎ প্যারা মিলিটারি ফোর্স, চিলা রায়ের নামে সেনা ট্রেনিং সেন্টার, ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে পঞ্চানন স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ এবং ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজবংশী সংস্কৃতি নির্মাণ। এই অভিভূত করা প্রচার বুঝতে সাহায্য করে ভোট রাজনীতিতে রাজবংশীদের গুরুত্বকে।

8. Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook Kuch Bihar, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011, pp. 15, 32 & 33.; Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook Jalpaiguri, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011, pp. 16 & 17.; Census of India, 2011, West Bengal Series 20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook North Dinajpur, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011, pp. 17 & 26.; Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook South Dinajpur, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011, pp. 16 & 24.

৫. Samir Kumar Das: 'Living the Absence, The Rajbanshi of North Bengal', (*Mumbai, Tata Institute of Social sciences, TISS working Paper No. 5*, March 2015), p. 4.

৬. রণজিৎ গুহ: 'একটি অসুরের কাহিনী', গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): নিম্নবর্গের ইতিহাস, *(কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮)*, পৃ. ৬৭-৬৮।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৮. শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ: *গৌড় কাহিনী*, (কলিকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৭), পৃ. ১-২।

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা, দিব্য প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ২৪।

১০. ধনঞ্জয় রায়: *উত্তরবঙ্গ: উনিশ ও বিশ শতক*, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ৭৬।

১১. সুকুমার দাস: *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস,* (কলকাতা, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৮২), পৃ. ৮।
১২. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* (জলপাইগুড়ি, ১৯৪১), পৃ. ২১।
১৩. আনন্দ গোপাল ঘোষ: *উত্তরবঙ্গের নামের সন্ধানে,* (শিলিগুড়ি, এন. এল. পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. Xvii
১৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* (জলপাইগুড়ি, ১৯৪১), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
১৫. গিরিজাশংকর রায়: *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ,* (কলকাতা, দেশ প্রকাশনা, ২০১৫)।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১৮।
১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার: *বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ)*, (ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭), পৃ. ৪২৮।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২১।
১৯. বজলে রহমান: *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ,* (কলকাতা, শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশন, ২০০৮), পৃ. ১৯।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।
২১. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* (জলপাইগুড়ি, ১৯৪১), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
২২. গিরিজাশংকর রায়: *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. XXXVI.
২৩. আমার রাজবংশী সমাজ ও পরিবারে বড় হয়ে ওঠার প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা।
২৪. গিরিজাশংকর রায়: *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. XXXVII.
২৫. রণজিৎ গুহ: 'একটি অসুরের কাহিনী', গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): নিম্নবর্গের ইতিহাস, *(কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স)*, ১৯৯৮, পৃ. ৬৭।
২৬. গিরিজাশংকর রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. XXIV.
২৭. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর হিন্দুর বর্ণভেদ,* (কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২) পৃ. ৫৭।
২৮. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* (জলপাইগুড়ি, ১৯৪১), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।
৩১. অশোক বিশ্বাস: *বাংলাদেশের রাজবংশীঃ সমাজ ও সংস্কৃতি,* (ঢাকা, বাংলা একাদেমি, ২০০৫), পৃ. ২৪।
৩২. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* চতুর্থ সংস্করণ, (কলকাতা, নিউ ভারতীয় প্রেস, ২৭ই মাঘ ১৪০১), পৃ. ৭।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
৩৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* (জলপাইগুড়ি, ১৯৪১), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩৫. চারুচন্দ্র স্যান্যাল: *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী,* তৃপ্তি সান্ত্রা (অনুবাদ), (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭), পৃ. ২৬৩-২৬৪।
৩৬. গিরিজাশংকর রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. XXVII.
৩৭. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
৩৮. গিরিজাশংকর রায়: প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২।
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
৪১. হরিমোহন রায়: *বেকার* (কবিতার বই), (জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০০), পৃ. ২৭।
৪২. ধনঞ্জয় রায়: *উত্তরবঙ্গের সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন,* (মালদা, নর্থ ইষ্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ. ৮।
৪৩. চারুচন্দ্র স্যান্যাল: *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮২।
৪৪. রাজবংশী পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।
৪৫. Sarat Chandra Ghoshal: *A History of Cooch Behar, from the earliest times to the end of eighteen century A.D.*, (Cooch Behar, The State Library Press, 1949), p.16.
৪৬. Norottam Kundu: *Caste and Class in pre-Muslim Bengal,* Studies in Social History of Bengal, Doctoral Thesis, (London,University of London, 1963), p. 13.
৪৭. Ibid, p. 82.
৪৮. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* চতুর্থ সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৪৯. W.W. Hunter: *A statistical Accont of Bengal*, Vol– x, *Op.Cit.* p. 348.
৫০. বিমল চন্দ্র বর্মণ, *উত্তর উপনিবেশিক কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থান ও সঙ্কটঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তরাংশের একটি তুলনামূলক আলোচনা*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এম ফিল (কলকাতা, আন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ২০১১)।
৫১. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর হিন্দু বর্ণভেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
৫২. রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী: *গোসানীমঙ্গল*, নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পা): দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, ১৯৯২)।
৫৩. Rup Kumar Barman: *From Tribalism to State*, Reflections on the emagence of Koch-kingdom, (early fifteen to 1977), (Delhi, Abhijeet Publications 2007).
৫৪. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর হিন্দু বর্ণভেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯১।
৫৫. Partha Chaterjee: *Nation and its Fragments, Colonial and Postcolonial Histories*, (New Jersey, Princeton University Press, Princeton, 1993), p. 175.
৫৬. নীহাররঞ্জন রায়: বাঙ্গালীর হিন্দু বর্ণভেদ, প্রাগুক্ত, ১৩৫২।
৫৭. Nicholas B. Dirks: *Caste of Mind, colonialism and the Making of Modern India*, (New Jersey, United Kingdom, Princeton University Press, 2001), p.3.
৫৮. Partha Chaterjee: *Nation and its Fragments, Colonial and Postcolonial Histories*, *Op.Cit*, p. 173.
৫৯. Anupama Rao: *The Cate Question, Dalits and the politics of Modern India*, (Himalaya, Mall Road, Ranikket Cantt., Parmanent Black, 2009), p. 1.
৬০. Hitesranjan Sanyal: *Social Mobility in Bengal*, (Kolkata, papyrus, 1959), p. 15.
৬১. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর হিন্দু বর্ণভেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৬২. Hitesranjan Sanyal: *Op.Cit.*, pp. 11-12.
৬৩. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালীর হিন্দু বর্ণভেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
৬৪. Hitesranjan Sanyal: *Op.Cit.*, p. 12.
৬৫. দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য: *জাতিভেদ*, (কলকাতা, পি সি চক্রবর্তী এন্ড ব্রাদার্স, ১৩২৫), পৃ. ২০-২১।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।
৬৭. Hitesranjan Sanyal: *Op.Cit.*, p. 17; ক্ষিতিমোহন সেন: *জাতিভেদ*, (কলকাতা, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, ১৩৫৩), পৃ. ৩৯।
৬৮. Rup Kumar Barman: *Partition of India and its impact on Scheduled Caste in Bengal*, (New Delhi, Abhijit publication, 2012), pp. 66-67.
৬৯. নির্মলকুমার বসু: *হিন্দু সমাজের গড়ন*, (কলকাতা, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, ১৩৫৬)।
৭০. Partha Chatterjee: the Nation and Its Fragments, *Op.Cit.*, p. 7.
৭১. Sudipta Kaviraj: *Trajectories of the Indian State, Politics and Ideas*, (Permanent Black, 2010), p. 24-26.
৭২. Nicholas B. Dirks: *Caste of Mind, Colonialism and the making of modern India, (New Jersey, Princeton, 2001),* p. 9.
৭৩. Samir Kumar Das: 'Living the Absence, the Rajbanshi of North Bengal', *Op.Cit*, p. 2.
৭৪. নির্মলকুমার বসু: *হিন্দু সমাজের গড়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।
৭৫. Hitesranjan Sanyal: *Social Mobility in Bengal*, *Op.Cit.*, p. 112.
৭৬. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal, 1872-1947*, (New Delhi, Oxford University Press, 2011), p. 4.
৭৭. Nicholas B. Dirks: *Op.Cit.*, p. 5.
৭৮. Sekhar Bandyopadyay, *Op.Cit.*, p. 8.

৭৯. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste Movement, the Rajbansis of North Bengal: 1910-1947*, (New Delhi, Manohar, 2003), p. 121.

৮০. Sekhar Bandyopadhayay and Anusua Basu Ray Chaudhury: 'Partition, Displacement, and the decline of the Scheduled Caste Movement in West Bengal', Uday Chandra, Geir Heierstad and, Kenneth Bo Neilsen (ed): The Politics of Caste In West Bengal, (*New Delhi, Rutledge, 2016*), p. 63.

৮১. আনন্দ গোপাল ঘোষ, গিরিন্দ্র নাথ বর্মণ, নীলাংশু শেখর দাস, নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পা): *বৃত্ত-বিবরণী* (ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন), ১৯১০-১৯৩৫, (পুণ্যভূমি খলিসামারী পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট, খলিসামারী, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, ২০১৯), পৃ. ট।

৮২. দীপককুমার রায়: *মনীষী পঞ্চাননের ক্ষাত্র আন্দোলন-অনালোচিত অধ্যায়,* (চাঁচল, মালদা, কল্যানী পাবলিকেশন, ২০১৩), পৃ. ২৯।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

৮৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক,* (কলকাতা, বীনাপাণি প্রেস, ২০০১), পৃ. ১৭।

৮৫. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* ষষ্ঠ সংস্করণ, (রায়গঞ্জ, রায় প্রিন্টার্স, ১৪১৬), পৃ. ১৩; উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *উত্তরবাংলার সেকাল ও জীবন স্মৃতি,* (জলপাইগুড়ি, শ্রীদুর্গা প্রেস, ১৩৯২), পৃ. ৪৩-৪৫।

৮৬. ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৮৭. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৩৮০ সালে লিখছেন- 'তাহাদের কথ্য ভাষায় কামরূপ উপভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রাজবংশী জাতির মধ্যে যে বাংলাভাষার উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহা রাজবংশী উপভাষা বলিয়া পরিচিত'। হরিশ্চন্দ্র পাল (সম্পা): উত্তরবাংলার পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খণ্ড, *(কলকাতা, স্যান্যাল য়্যান্ড কোম্পানী, ১৩৮০)*, পৃ. এ৪।

৮৮. ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৮৯. গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮) পৃ. ১৩৩-১৩৪।

৯০. শশধর রায়: 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ সাম্বতসরিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ', পঞ্চানন সরকার (সম্পা): রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ, ত্রৈমাসিক, *(কলিকাতা, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ১৩১৬),* পৃ. ৮।

৯১. প্রভাসচন্দ্র সেন: 'পৌণ্ড্রদেশ নির্ণয়', পঞ্চানন সরকার (সম্পা): রঙ্গপুর সাহিত্য- পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ ত্রৈমাসিক, *(কলকাতা, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)*, পৃ. ১১১-১২১।

৯২. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ: 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ', পঞ্চানন সরকার (সম্পা): রঙ্গপুর সাহিত্য- পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ, ত্রৈমাসিক, *(কলকাতা, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)*, পৃ. ১৩৭- ১৪৯।

৯৩. রাধেশচন্দ্র শেঠ: 'মলদ ও মালদহ', পঞ্চানন সরকার (সম্পা): রঙ্গপুর সাহিত্য- পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ, ত্রৈমাসিক, *(কলকাতা, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)*, পৃ. ১০৫-১১০।

৯৪. শরৎ কুমার রায়: 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতি ভাষণ', রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১-২।

৯৫. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম বর্ষের কার্য্য বিবরণ, চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশন, (ধর্ম্ম সভাগৃহ, রঙ্গপুর, ১১/১২ আষাঢ়, ১৩১৬), পৃ. ৪-৫।

৯৬. শরৎ কুমার রায়: রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতি ভাষণ, *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭- ৮।

৯৭. উত্তর-উপনিবেশিক আমলে রাজবংশী জাতি উত্তরখণ্ড, উতজা্স, কামতাপুর বা গ্রেটার কুচবিহার আন্দোলনের ক্ষেত্র রচনা করেন। উক্ত আন্দোলনের প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল জনমণ্ডলী বোধ (Ethnic feeling) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। আর বিরোধীতার জায়গাটি আন্দোলনের দাবির ভাষায় পরিণত হয়েছিল মুলত কলকাতার বাঙ্গালীর শোষণকে সামনে রেখে। সেজন্য 'আলাদা রাজ্যের' দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

৯৮. Partha Chatterjee: *the Nation and its Fragments, Op.Cit,* p. 76.

৯৯. ধর্মনারায়ণ বর্মা: *কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা,* (তুফানগঞ্জ, রায়ডাক প্রকাশক, ১৪০০)।

১০০. বাংলা সন ১৩১৬ সালের ৯ ও ১০ মাঘ আসামের গৌরীপুর শহরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঞ্চানন সরকার 'কামতা-বিহারী সাহিত্য' শিরোনামে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন, তা ১৩১৭ সালে সভার কার্য বিবরণীর দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয়।... প্রবন্ধটি কামতাবিহারী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পঞ্চাননের জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ: ঠাকুর পঞ্চানন স্বারক, (কলকাতা, বেহালা সেন্ট্রাল গভ কোয়াটার, ২০০১), পৃ. ১০৪।

১০১. Sukhbilas Barma: *Indomitable Panchanon-an objective study on Rai Sahib Panchanan Barma*, (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2017), p. 1.

১০২. ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যকলাপ ও তার সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রংপুরে প্রধান কার্যকলাপের ক্ষেত্র থাকার ফলে সেখানে যতখানি প্রভাব ছিল তার তুলনায় উত্তরবঙ্গের অন্য পরিসরে সেভাবে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। এখনও অনেক মানুষের কাছে বিশেষত রাজবংশীদের কাছে পঞ্চানন নামটি অজানা থেকে গেছে। Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste movement, The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947*, *Op.Cit*, p. 113.

১০৩. ক্ষত্রিয় সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, বৃত্ত বিবরণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬- ৬১০।

১০৪. ক্ষত্রিয় সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন, বৃত্ত বিবরণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

১০৫. পঞ্চানন বর্মা: *'নাদিম পরামাণিকের পাঁঠা'*, রঙ্গপুরের রূপকথা, ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন স্বারক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১- ৯৫।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

১০৭. ক্ষত্রিয় সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন, 'বৃত্ত বিবরণী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০-৫৭২।

১০৮. ক্ষত্রিয় সমিতির একাদশ সম্মেলন, 'বৃত্ত-বিবরণী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০-৫৭২।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

১১৩. 'বৃত্ত বিবরণী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৮।

১১৪. ক্ষত্রিয় সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, 'বৃত্ত বিবরণী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯।

১১৫. Swaraj Basu: *Dynamics of Caste Movement*, *Op.Cit*, p. 44.

১১৬. তপন রায় প্রধান: *রাজবংশী লোককথা*, (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৩), এতে নির্মল দাশ, প্রাসঙ্গিক কথাতে উক্ত কথা ব্যক্ত করেছেন।

১১৭. হরিশ্চন্দ্র পাল (সম্পা): *উত্তর বাংলার পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ত।

১১৮. জগদীন্দ্রদেব রায়কত: (প্রণীত), নির্মল চন্দ্র চৌধুরি (সম্পা): রায়কত বংশ ও তাঁহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, (১৮৮৩), (সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা, আনন্দ গোপাল ঘোষ: সম্পাদিত ও সংযোজিত), (মালদা, সংবেদন, ২০১৩), পৃ. ৩১।

১১৯. শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়: 'কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, *(কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০)*, পৃ. ১১১-১১২।

১২০. হরিশ্চন্দ্র পাল (সম্পা): *উত্তর বাংলার পল্লীগীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ড।

১২১. বুদ্ধ বর্মণ: (৪২), *সাক্ষাৎকার:* পেশায় শ্রমিক, বন্ধুস্থানীয়। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম রাজবংশী লোকেরা কীভাবে ভাবে রে? এর উত্তরে সে জানাল আমাদের মালিক (মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের) মাঝে মাঝে বলে- 'কিরে চাল ফুরিয়েছে বুঝি কাজে এসেছিস'। বুঝলি কি বলল? আমি বলাম না। সে তখন বুঝিয়ে বলল এখানকার লোকেরা খুব অলস। ঠ্যাং হাড়িত দিয়া দেখে চাল কতলা আছে। যদি থাকে সে মরে গেলেও কাজত যাবে না।

১২২. 'বৃত্ত বিবরণী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

১২৩. ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন স্বারক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

১২৪. পঞ্চানন বর্মা (১৮৬৬-১৯৩৫) সংস্কৃত সাহিত্য এবং আইন বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ এম.এ... বি.এল সন্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। গোটা বাংলা ও বিহারে রাজবংশী সমাজে তিনি প্রথম উক্ত অভিধায় সন্মানিত হয়েছিলেন।

Sukhbilas Barma: *Indomitable Panchanan: An objective study on Rai Saheb Panchanan Barma*, (Delhi, Global Vision Publishing House, 2017), p. 9-11.; অরবিন্দ ডাকুয়া: *রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা*, (আলিপুরদুয়ার জংশন, উপমহদেশ পাবলিকেশন, ২০১৫), পৃ. ১৫।

১২৫. আনন্দ গোপাল ঘোষ, গিরীন্দ্র নাথ বর্মণ, নীলাংশু শেখর দাস, নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পা): বৃত্ত-বিবরণী, ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন-বিবরণ, ১৯১০-১৯৩৫, (খলিসামারি, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পুণ্যভূমি খলিসামারী পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট, ২০১৯), পৃ. ঢ-ত।

১২৬. রাজবংশী সমাজ আধুনিক শিক্ষা প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্থানীয়দের কথোপকথনে। *'পড়াশুনা শিখে সরকারের গোলামি কে করে'?* চাকরি করা মানে অন্যের আদেশ পালন করা এই বিষয়টি তারা মানতে চাইত না। তাই ছেলেপুলেদের ছোটবেলার থেকে বাড়ির কাজে যুক্ত করে দিত। নিজের যা আছে তা করে মিলে খেলে অভাব নেই এমনটাই ভাবনা প্রসন করতেন। গরীব ঘরের ছেলে মেয়েরা যদি স্কুলে যেত তাহলে তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হত *'দেখ প্যক্কা খাওয়ার ছাওয়া স্কুলে যায়'।* এই কাঠামোটির কিছুটা পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন পঞ্চানন বর্মা। তাঁর শিক্ষামূলক ভাষণে তার কিছুটা অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। বৃত্ত-বিবরণীতে প্রত্যেকটি সেশনে শিক্ষার প্রতি তিনি আলোকপাত করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন- আনন্দ গোপাল ঘোষ, গিরীন্দ্র নাথ বর্মণ, নীলাংশু শেখর দাস, নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পা): বৃত্ত-বিবরণী, ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন-বিবরণ, ১৯১০-১৯৩৫, (খলিসামারি, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পুণ্যভূমি খলিসামারী পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট, ২০১৯)।

১২৭. Durgadas Majumder: *West Bengal District Gazeteers*, (Kuch Bihar), (Calcutta, Bengal Secratariat Press, 1977), p. 46.

১২৮. Ibid, p. 177.

১২৯. উপনয়ন সংস্কৃতি ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বের দ্বিজ অর্থাৎ পুনঃজন্ম বা পবিত্র হয়ে ওঠার একটি অনুষ্ঠান মাত্র। করতোয়া পবিত্র নদী যা 'সদানিরা' নামে পৌরাণিক কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। সেই নদীর তীরে পঞ্চানন বর্মা একদল ব্রাহ্মণদের তত্বাবোধনে রাজবংশীদের মাথা মুণ্ডন করে পৈতা পরিধানের বিধান নিয়ে এসেছিলেন। পৈতা পরিধানে সকল রাজবংশী যে অংশগ্রহণ করেন তা নয় বরং তাদের একটি অংশ দ্বিধার মুখোমুখি হন। কারণ তারা এর ব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কেননা, নতুন অভ্যাস আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে ভয়ের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

১৩০. ধনঞ্জয় রায়: *উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন*, (মালদহ, নর্থ ইস্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ. ৩২।

১৩১. আনন্দ গোপাল ঘোষ, গিরীন্দ্র নাথ বর্মণ, নীলাংশু শেখর দাস, নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পা): বৃত্ত-বিবরণী, ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন-বিবরণ, ১৯১০-১৯৩৫, প্রাগুক্ত, পৃ.-ত।

১৩২. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত*, সপ্তম সংস্করণ, ননীগোপাল রায় (সম্পা): (মাথাভাঙ্গা, উপ্ জনভুই পাবলিশার্স, ২০১৫), পৃ. ১৫।

১৩৩. বৃত্ত-বিবরণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৩৪. Swaraj Basu: *Dynamics of caste movement, The Rajbnasis of North Bengal, 1910-1947*, (Delhi, Manohar, 2003), p. 72; আনন্দ গোপাল ঘোষ, গিরীন্দ্র নাথ বর্মণ, নীলাংশু শেখর দাস, নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পা): বৃত্ত- বরণী, ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন-বিবরণ, ১৯১০-১৯৩৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪, ২২৮, ৩২০-৩২১, ৫১৪-৫১৫, ৫৮৫-৫৮৬, ৬৪০- ৬৪৫, ৭৬৭, ৮৩৮-৮৩৯; উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৮।

১৩৫. প্রাগুক্ত, বৃত্ত-বিবরণী, দশম বার্ষিক অধিবেশন, ১৩২৬ সাল, সপ্তম প্রস্তাব, পৃ. ৫১৪-৫১৫।

১৩৬. প্রাগুক্ত, বৃত্ত বিবরণী, অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, ১৩৩৪ সাল, দ্বিতীয় দিন, ২০শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, পৃ. ৬৪০-৬৪৫।

১৩৭. Swaraj Basu, *Op.Cit.*, pp. 72-73.

১৩৮. Ibid, p. 47.

১৩৯. মণিকুন্তলা সেন: *সেদিনের কথা*, (কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২), পৃ. ২২৬।

১৪০. তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: *কোচ ও টোটোদের সমাজ ও সংস্কৃতি*, (কলকাতা, প্রতিভাস, ২০০৮), পৃ. ১৮।

১৪১. রাজবংশী সমাজে বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা এবং দারিদ্রতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় এক বন্ধুর পরিবারকে নিয়ে। তখন তার বয়স ১১ বা ১২ হবে। আমার বোধ হয় ৮ কিংবা ৯। তার বাবা ছিলেন বাম সংগঠনের

ক্যডার ও স্থানীয় মানুষ। কিছু জমি জায়গা ছিল কবে বিক্রি করেছেন জানি না। অবশিষ্ট জমি নদীর ভাঙ্গনে শেষ হচ্ছে। সেই সামান্য জমিতে যে ফসল হত তা এক মাস চলত কিনা বলা কঠিন। তার উপর তিনি সংগঠনের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতেন। উপার্জ্জনের কোন উপায় নেই। নিশ্চিত করে বলা যেত না কবে এক বা দু কিলো চাল নিয়ে আসবেন। একমাত্র উপায় ছিল তার মা। বাড়ি বাড়ি কাজ করে সন্ধ্যায় আধা কিলো চাল নিয়ে আসতেন। এই টুক সম্বল। এতে তরিতরকারির কথা না বলাই ভাল। একটা অনিশ্চিত জীবন। তবে না খেয়ে আছে মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। এই ভাবে জীবনকে ভাবা অনুপ্রেরণা বোঝ হয় 'বাউদিয়া সংস্কৃতির' থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। এর পর একদিন শুনতে পেলাম সে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে গেছে। যাকে রাজবংশী ভাষায় বলে 'বছরকিয়া'। এক বছর অন্যের বাড়িতে থাকবে এবং কাজ করবে। বছরের শেষে কয়েকটা টাকা পেত। কয়েকদিন হল বাড়ি সে ফিরছে না। সে আমার খেলার বন্ধু ছিল। তাই তার খোঁজ রাখতাম। তাকে দেখতে না পেয়ে একদিন ও যেখানে কাজ করে সেখানে গেলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে সে বেশ খুশি। জিজ্ঞেস করলাম বাড়ি যাস না কেন রে? সে বলল এক বছর এই বাড়িতে থাকব। পরে সে বলতে শুরু করল 'মুই এই বাড়ির এলা চাক্রিন্দার' অর্থাৎ চাকর। এক বছর থাকিলে পঁচিশ টাঁকা দিবে। খাওয়া থাকা সব বাড়ির মালিক দেবে। এরপর জিজ্ঞেস করলাম পেট ভরে খেতে দেয় রে? সে বলল তা দেয়। যে টুক খাবার থাকে সবাই ভাগ করে খাই। দুবেলা পেট ভরে খাই। আর একবেলা একটু কম। ওরার একবেলা কম খায়। কেন রে? অঢেল ব্যবস্থা এদেরও নেই...।

১৪২. বৃত্ত-বিবরণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ণ।

১৪৩. বৃত্ত-বিবরণী, প্রাগুক্ত, ক্ষত্রিয় সমিতি, দশম বার্ষিক অধিবেশন, রংপুর, ১৩২৬ সাল, পঞ্চম প্রস্তাব, পৃ. ৫১২-১৩।

১৪৪. জ্যোতির্ময় রায়: রাজবংশী সমাজদর্পন, (কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, ২০১২), পৃ. ২৮০-২৮৯।

১৪৫. ব্রজেন্দ্র নাথ রায় ১৯৫২ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কোচবিহার বিধান সভার প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর লেখনীতে তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। নিবারণ পণ্ডিত যিনি উত্তর বাংলার মাটিতে বাংলার শ্রেণিসংগ্রামের কাহিনী গানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছিলেন তিনি এই গ্রন্থটি রচনায় লেখককে বিশেষ উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। নিবারণ পণ্ডিত সম্পর্কে জানার জন্য পরে আমরা মূল পাঠ্যে আলোচনায় আসব।

১৪৬. ব্রজেন্দ্র নাথ রায়: মৈশালবন্ধু, নৃপেন্দ্র নাথ পাল (সম্পা): (কোচবিহার, কোচবিহার সমাচার প্রেস, ১৯৮৫), প্রাক্ কথা, পৃ. ৯- ১০।

১৪৭. হরিশ্চন্দ্র পাল (সম্পা): *উত্তর বাংলার পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খন্ড,* (কলিকাতা, সান্যাল য়্যান্ড কোম্পানী, ১৩৮০)।

১৪৮. মৈশালবন্ধু, প্রাগুক্ত, মুল নাটক, পৃ. ৮।

১৪৯. রণজিৎ দেব: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, (কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০১৪), পৃ. ২১।

১৫০. মৈশালবন্ধু, প্রাগুক্ত, মুল নাটক, পৃ. ৯।

১৫১. ধনঞ্জয় রায়: *উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন,* (মালদহ, নর্থ ইষ্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৯)।

১৫২. বৃত্ত-বিবরণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৫৩. সমিতির সদস্য পদ তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল। গন্য, মান্য এবং সাধারণ। এরা প্রত্যেকেই নিদিষ্ট অর্থ সমিতিকে প্রদান করতেন। এর সঙ্গে বিভিন্ন চাঁদা বা দান গ্রহণ করার পদ্ধতি নিয়েছিলেন সমিতি। সমিতি সদস্যদের কাছ থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করত তা জানতে বিস্তারিত দেখুন Swaraj Basu: *Op.Cit.*, PP. 71- 72.

১৫৪. বৃত্ত-বিবরণী: প্রাগুক্ত, *ক্ষত্রিয় সমিতি,* দশম বার্ষিক অধিবেশন, রংপুর, ১৩২৬ সাল, ষষ্ঠ প্রস্তাব, পৃ. ৫১৩-১৪।

১৫৫. বৃত্ত-বিবরণী: প্রাগুক্ত, *ক্ষত্রিয় সমিতি,* একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, ধুবড়ী, ১৩২৭ সাল, চতুর্থ প্রস্তাব, পৃ. ৫৬৩-৬৪।

১৫৬. বৃত্ত-বিবরণী: প্রাগুক্ত, *ক্ষত্রিয় সমিতি,* একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, ধুবড়ী, ১৩২৭ সাল, পঞ্চম প্রস্তাব, পৃ. ৫৬৫-৬৬।

১৫৭. বৃত্ত-বিবরণী: প্রাগুক্ত, *ক্ষত্রিয় সমিতি,* একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, ধুবড়ী, ১৩২৭ সাল, ষষ্ঠ প্রস্তাব, পৃ. ৫৬৬।

১৫৮. বৃত্ত-বিবরণী: প্রাগুক্ত, *ক্ষত্রিয় সমিতি,* একাদশ বার্ষিক অধিবেশন, ধুবড়ী, ১৩২৭ সাল, সপ্তম প্রস্তাব, পৃ. ৫৬৬-৬৭।

১৫৯. বৃত্ত-বিবরণী: প্রাগুক্ত, *ক্ষত্রিয় সমিতি,* দশম বার্ষিক অধিবেশন, রংপুর, ১৩২৬ সাল, ষষ্ঠ প্রস্তাব, পৃ. ৫১৪।

১৬০. Swaraj Basu: *Op.Cit.*, p. 41.

১৬১. শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়: 'কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, *(কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০),* পৃ. ১০৫।

১৬২. পরিমল বর্মণ ও কানু বর্মণ (সম্পা): *লোক-উৎস, ভান্ডানী পূজাসংখ্যাঃ এক,* উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, *(মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, রায় কম্পিউটার প্রেস, শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি, ১৪১৭);* রণজিৎ

দেব: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮০; গিরিজাশংকর রায়: *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা- পার্বণ,* (কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ৬৩-৬৯; দীপক রায়: *উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক দেবী ভান্ডানী,* (বাকুড়া, টেরাকোটা, ২০১২)।

১৬৩. অজিত কুমার বর্মা: 'সোদরের পক্ষ থাকি', কানু বর্মণ ও অভিজিৎ বর্মণ, (সম্পা): উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, ভান্ডানী দ্বিতীয়া সংখ্যা, *(মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, সোদর, শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি, ২০১১),* পৃ. ৩-৪।

১৬৪. পরিমল বর্মণ (মারেয়া): *উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বছরকিয়া পত্রিকা, ভান্ডানী তিতিয়া সংখ্যা,* শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, (কোলকাতা, বিভূতি পিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০১২), পৃ. ৯।

১৬৫. এই শব্দটি মুলত নিয়েছি Leela Gandhi 'Affective Communities' থেকে। তিনি মূলত এমন এক কমিউনিটির কথা উল্লেখ করেছেন তার বইটি রচনার ক্ষেত্রে, যারা বইটি প্রকাশের ও রচনা করতে সাহায্য করেছে তারা একদিকে আবেগপ্রবণ এবং অন্যদিকে আর্দশগতভাবে একই চিন্তার অংশিদার যা তাদের বন্ধুত্বমুলক বন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করে। বিস্তারিত দেখতে Leela Gandhi: *Affective Communities, Anticolonial Thought and the politics of friendship,* (Durbam & London, Duke university press, 2006).

১৬৬. অজিত কুমার বর্মা: 'সোদরের পক্ষ থাকি', কানু বর্মণ ও অভিজিৎ বর্মণ (সম্পা): উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, ভান্ডানী দ্বিতীয়া সংখ্যা, *(মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, সোদর, শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি, ২০১১),* পৃ. ১-৫।

১৬৭. অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের ভাব ও ভাবনার প্রকারতা।

১৬৮. পরিমল বর্মন: 'বর্তমান সমায়ত্ ভান্ডানী পূজা আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান': গ্যালো বারের খানেক মূল্যায়ন, কানু বর্মণ ও অভিজিৎ বর্মণ (সম্পা): উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, ভান্ডানী দ্বিতীয়া সংখ্যা, *(মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, সোদর, শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি, ২০১১)*।

১৬৯. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste Movement, The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947, Op.Cit.,* p. 46.

১৭০. রণজিৎ দেব: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৭১. বিমল চন্দ্র বর্মণ: *উত্তর উপনিবেশিক কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থান ও সঙ্কট: পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তরাংশের একটি তুলনামূলক আলোচনা,* অপ্রকাশিত, (কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এম ফিল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ২০১১), পৃ. ৩৭।

১৭২. জ্যোতির্ময় রায়: *রাজবংশী সমাজদর্পণ,* (কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, ২০১২), পৃ. ৩৬।

১৭৩. রণজিৎ দেব: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৭৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Rup Kumar Barman: *Practice of Folk Medicine in Sub- Himalayan Bengal, A study on the folk medicine practices of the Rajbanshis in Historical perspective,* (Delhi, Abhijeet Publication, 2019).

১৭৫. বিস্তারিত দেখতে Charu Chandra Sanyal: The Rajbansis of North Bengal, (Kolkata, The Asiatic Soceity, 1965); ধর্মনারায়ন বর্মা: 'কোচবিহার লোকাচার', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, *(কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০),* পৃ. ৩৩০-৩৩৭; রণজিৎ দেব: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত; পরিমল বর্মন: *রাজবংশী সমাজের লোকপ্রযুক্তি,* (মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, উপ্ জনভুই পাবলিশার্স, ১৪১৯)।

১৭৬. ধর্মনারায়ণ বর্মা: 'কোচবিহার লোকাচার', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, (কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০), প ৩৩০-৩৩৭; বাপদায় দেয়া বিষয়টি আসছে একটি বিশেষ মুহুত্বকে সামনে রেখে। কেউ যদি হটাৎ করে দিপদে পড়ে (আর্থিক বা সামাজিক) এবং যে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করে তাকে বাপের সমতূল্য মনে করে সম্পর্ক তৈরি করার এটি একটি প্রক্রিয়া। এই সম্পর্ক সাময়িক নয়, বরং আজীবনের এক আত্মীয় সমন্ধ। বঙ্গের নিরিখে এই সমন্ধ অনুসন্ধান করা না গেলেও রাজবংশী সমাজে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মৈশালবন্ধু নাটকের শেষ অংশে দেখতে পাবেন নায়িকা পালিয়ে গিয়ে অন্যস্থানে আশ্রয় যখন নেয় তখন এক আদিবাসি তাকে আশ্রয় দিলে মেয়েটি আশ্রয়দাতাকে বাপদায় পিতা রূপে মেনে নেয় এবং অপরদিকে আশ্রয় দাতা মেয়েটিকে

নিজের মেয়ের মত সন্মান করে থাকে। আরও জানতে দেখুন ধনঞ্জয় রায়: *উত্তরবঙ্গের লোকজীবন চর্যা,* (কলিকাতা, ভোলানাথ প্রকাশনী), ১৩৬২, পৃ. ২২-২৩।

১৭৭. আনন্দগোপাল ঘোষ, শেখর সরকার: 'কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৯৬।

১৭৮. জ্যোতির্ময় রায়: *রাজবংশী সমাজদর্পন,* (কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, ২০১২), পৃ. ১২৯-৩৯।

১৭৯. বিমল চন্দ্র বর্মণ: *উত্তর উপনিবেশিক কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থান ও সঙ্কট: পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তরাংশের একটি তুলনামূলক আলোচনা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৮০. শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়: কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৮১. বিস্তারিত জানতে দেখুন, চারু চন্দ্র রায়: *চারুরায়ের দারোগাগিরি,* (কোচবিহার, প্রণতি বুকস্, ১৯৯০), পৃ. ২৮-৩২।

১৮২. প্রচলিত অর্থে মাষান দেবতাকে শিবের এক রূপ বলা হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন গিরিজাশঙ্কর রায়: *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২২।

১৮৩. Harendra Narayan Chaudhuri: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements,* (Cooch Behar State Press, 1903), p. 131.

১৮৪. রাজবংশী সম্পদায়কে ক্ষত্রিয়করণের মধ্য দিয়ে জাতি ব্যবস্থার মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত করার সংগ্রাম একদিকে ব্রিটিশ প্রশাসকদের সঙ্গে এবং অন্যদিক থেকে বাঙ্গালী সমাজপতিদের অনুশাসন বাদ দিয়ে করা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র শাস্ত্র অনুশাসনে নয়, সমাজপতিদের অনুমোদনের বিষয়টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগপদ সংগ্রাম করতে হয়েছিল পঞ্চানন বর্মাকে। যার ফলে এক সময় তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের স্বীকৃতি ও বৈধতা মেলে। রংপুর ম্যাজিস্ট্রেট C. Tindal ১৯১০ সালে তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিল 'বন্ধনীতি রাজবংশী লিখে, রাজবংশীদের 'ক্ষত্রিয়' এবং বর্মণ লেখায় আমি কোন আপত্তির কারণ দেখিনা। বিস্তারিত জানতে দেখুন- উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০। একইভাবে কলকাতা, মিথিলা, কামরূপ এবং নবদ্বীপের পন্ডিতমন্ডলী রাজবংশী সম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয় অভিধায় স্বীকৃতি প্রদান করে। উপেন্দ্রনাথ বর্মণ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* পৃ. ১৯।

১৮৫. সুখবিলাস বর্মা: 'স্মৃতি জুড়ে মোর উত্তরবঙ্গ', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ, *(কলকাতা, সমীক্ষা প্রকাশন, ২০০২),* পৃ. ২৩৩।

১৮৬. ছোটবেলার থেকে দেখে আসা এই অভিজ্ঞতার ছবির দিকে তাকালে নস্টালজিক ভাবনার জন্ম দেয়। তবে সে সব প্রবাদ প্রবচনের সংরক্ষণ আমার কাছে নেই। বর্তমানে চেষ্টা করে তা করতে পারিনি। অনেকেই মারা গেছেন আর যারা এখন বেছে আছেন সেই সব আলোচনা তাদের মনে নেই বলে। তবে সেই মুহুত্বের কথা তাদের স্মরণ করে দিলে একটা হাফ নিশ্বাস ছেড়ে বলতে থাকেন সে তো 'সত্য যুগে'র কথা। সে সময় সমাজে অভাব ছিল ঠিকে কিন্তু অফুরুন্ত আনন্দ ছিল। কাজ করার মধ্যে মানুষ আনন্দ খুঁজে পেত। এখন মানুষ কাজ করতে ভাল বাসে না। এক অদ্ভুত সমাজ এটা। *সাক্ষাৎকার:* শামারু বর্মণ (৬০), (নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার)।

১৮৭. গোপাল নস্কর: *সাক্ষাৎকার,* আমার স্কুলের কলিক (মোহনপুর সাবিত্রিবিদ্যা মন্দির)। ওনিও ইতিহাস বিষয়টি পরাতেন। অর্থাৎ আমরা একই ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক। একই পেশায় থাকায় ওনার সাথে আমার খাতির গড়ে ওঠে। মাথাভাঙ্গা জোনাল কমিটির সম্পাদক বা অন্য কোন বড় দায়িত্ব তিনি সামলাতেন। উক্ত অঞ্চলে বেশ দাপুটে কমরেড ছিলেন। ছোট বেলার থেকে নস্করবাবুর নাম শুনে আসছি। এতটাই তিনি প্রভাবশালি। তবে ওনাকে দেখার সৌভাগ্য আগে কখন হয়নি। স্কুলে প্রথম ওনাকে দেখি। সেই থেকেই বোধহয় ওনার সাথে খাতির করার ইচ্ছা আমার মনে জন্মেছিল। ফলত গল্পের ছলে অনেক কথা ওনার কাছ থেকে শুনতে পারতাম।

১৮৮. সুগত বসু: 'বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলার কৃষি-সমাজের কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগত বিন্যাস', অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা): বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, *(কলকাতা, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৮),* পৃ. ১৪৪-১৪৫।

১৮৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): নিম্নবর্গের ইতিহাস, (কলকাতা, আনন্দ, ১৯৯৮), পৃ. ১-২১।

১৯০. মিনতি সেন, শুভাশীষ গুপ্ত: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, প্রথম খন্ড: দেশভাগ পর্যন্ত,* (কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ১৭০ কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, ২০১৬), পৃ. ১৬৮।

১৯১. অবনী লাহিড়ী: *তিরিশ চল্লিশের বাংলা, রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে,* (কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯), পৃ. ১৬।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজবংশীদের বামপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া: দেশভাগ পর্যন্ত

বামপন্থী রাজনীতি গ্রামাঞ্চলের সমাজজীবনে একটা নতুন ভাবনার সূচনা করেছিল। বামপন্থী নেতাদের গ্রাম সমাজে উপস্থিতি ও শ্রমজীবি মানুষের উত্থান নিয়ে আলোচনা-একটা নতুন ভাবনার আবির্ভাব ঘটাতে সাহায্য করে। এতে প্রচলিত জীবনের ধারায় একটা শূন্যতার জায়গা তৈরি হয়েছিল। বামপন্থী ভাবাদর্শকে ঘিরে তার ব্যপ্তি ঘটে। ফলে এই নতুন চিন্তার জায়গাটি কীভাবে আমাদের আলোচ্য গবেষণার পরিসীমায় বিকাশ ঘটেছিল এবং তার মধ্যে রাজবংশীদের অবস্থান কেমন ছিল তার পর্যালোচনা দিয়ে জাতি ও শ্রেণির পারস্পরিকতা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়টিতে। যা বুঝতে সাহায্য করবে রাজবংশীদের কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার সঙ্গে বঙ্গের বামপন্থী ভাবাদর্শের স্বরূপকে।

১. অবিভক্ত বাংলার বামপন্থী রাজনীতির সূচনা

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লব সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষকে একটা বড় স্বপ্ন দেখিয়েছিল। এই বিপ্লব নতুন করে শ্রমজীবি মানুষকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে শিখিয়েছিল। দেখতে পেয়েছিল নতুন আশার আলো যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবি মানুষের উত্থান গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শ্রমজীবি ও মেহনতি মানুষের এই সংগ্রাম ইতিহাসে শ্রেণিসংগ্রাম নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লবকে ঘিরে যে নতুন পুঁজিবাদী সমাজ তৈরি হয়েছিল এবং এর থেকে সমাজে একদল শ্রমজীবি মানুষের উত্থান ঘটল যাদের অবস্থানকে সামনে রেখেই এই ইতিহাস উঠে এসেছে। ফলত শিল্প

বিপ্লবের অনুপূর্ব সমাজের শ্রেণির অবস্থান এবং এর পরবর্তী সমাজের শ্রেণির ধারণা একে অপরের পরিপূরক নয়। মার্কসীয় ধারণায় শ্রেণি সংজ্ঞার মূল কথা হল শ্রমজীবি মানুষের অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ এর মধ্যে একটা গতিশীলতার জায়গা রয়েছে। অন্যদিকে জাতি ব্যবস্থায় অনুপূর্বের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে জাতির তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে উদ্ভূত চিন্তার মধ্য দিয়ে। ফলত উভয়ের এই পারস্পরিকতা বোঝাপড়া দিয়ে রাজবংশী প্রশ্নটিকে প্রকট করেছে বর্তমান অধ্যায়টি।

এই বিপ্লবী চিন্তা ভারতবাসীদের কাছে পৌঁছেছিল ভারতের বিপ্লবী ধারার জাতীয় নেতাদের হাত ধরে। যারা বিদেশে ছিলেন বা ইউরোপে পৌঁছেছিলেন তাদের হাতেখরিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাদের অনুপ্রেরণায় এবং শ্রেণি আর্দশে প্রভাবিত হয়ে ভারতের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একটা জাগরণ ১৯২০ দশক থেকে শুরু হয়েছিল। এই নেতৃস্থানীয়দের উদ্যোগে ১৯২৫ সালের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। ভারতে রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে বাম ভাবনাচিন্তা যতটা প্রসার লাভ করে সেই তুলনায় মার্কসীয় তত্ত্বের গভীরতার মধ্য দিয়ে তার ব্যপ্তি ঘটেনি। কারণ মার্কসীয় ধারার লেখা প্রধানত ইংরাজি বা ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় ইংরাজি জানা ভারতীয় ছাড়া তাদের লেখনী সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাই মার্কসীয় ভাবনা নিচুতলার মানুষের কাছে একপ্রকার পার্টিতন্ত্রের জায়গা থেকে প্রাপ্ত হয়।

শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস যেহেতু ইউরোপ-কেন্দ্রিক ভাবনা প্রসূত, সেই ভাবনা প্রকাশে একমাত্র অবলম্বন ছিল লিখনী (Writing) এবং আমাদের কাছে লেখনী মধ্য দিয়েই তা প্রাপ্ত হয়। অথচ পার্টির সদস্যের একটা বড় অংশের কাছে সে ভাষা ছিল অজ্ঞাত। সেই সীমাবদ্ধতা কাঠিয়ে ওঠার জন্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও অনুকরণ

করার প্রবণতা লক্ষণীয়। সেই অনুবাদ পাঠ করে শ্রেণিসংগ্রাম করার মধ্যে একধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে মার্কস বা লেনিনের চিন্তাভাবনা সূক্ষ্মভাবে বোঝার বিষয়টি ছিল একমাত্রিক। ইংরাজি জানা গুটিকয় ব্যক্তির ভাবনাই প্রধান সম্বল ছিল। ফলত তাদের চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা যেমন পার্টি পলিটিক্স এ থেকে গেছে তেমনি সুদীপ্ত কবিরাজ মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে বঙ্গের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের (Left Intelectuals) মিল খুঁজে পাননি।[১] অর্থাৎ শ্রেণিসংগ্রামের আবডালে বামপন্থী রাজনীতি উত্থানের সঙ্গে রাজবংশীদের সংযুক্তি কীভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা ধরে আলোচনায় অভিনিবেশ করা হয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রভাব বাংলায় পড়েছিল ধীর গতিতে। একপ্রকার ১৯২০র দিক থেকে 'শ্রমিক ও কৃষক' প্রশ্নটি ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়। যুক্ত হলেও শ্রেণি চেতনার জায়গাটি ছিল অনুপস্থিত। কংগ্রেসি রাজনীতির পরিমণ্ডলে তার বিকাশ ঘটে এবং কংগ্রেসের অভিপ্রায়ের সঙ্গে 'শ্রমিক ও কৃষক' উত্থানের প্রসঙ্গটি সম্পর্কিত না হলেও কৃষক ও শ্রমিক প্রশ্নটি গুরুত্ব পেতে থাকে। ধীরে ধীরে 'শ্রমিক ও কৃষক' সংগঠন গড়ে ওঠে এবং স্বতন্ত্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় (১৯২৫)। তার পাশাপাশি কতগুলো কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন 'Workers and Peasants Party' (১৯২৫), 'লেবার স্বরাজ পার্টি' (১৯২৫), 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' (১৯২৬), 'শ্রমিক কৃষক পার্টি' (১৯২৮), নিখিল বঙ্গ প্রজা সংগঠন (১৯২৯) বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠে। অর্থাৎ বামপন্থী ভাবনার নিরিখে ধীরে ধীরে একটা বুদ্ধিজীবী বলয় আত্মপ্রকাশ করেছিল। যাদের উদ্যোগ এবং প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তা শুধুমাত্র ভারতের আভ্যন্তরিন কার্যকলাপে নয় বরং অনেকটা আর্ন্তজাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ন্যাৎসি জঙ্গি আন্দোলনে

যখন গোটা দুনিয়া হতবিম্ব হয়ে পড়েছিল সেসময় বঙ্গের এই প্রগতিশীল বাম-বলয় একটা নতুন আশার উদ্মাদনা দেখিয়েছিল। তাদের অনুপ্রেরণায় ইউরোপ ন্যাৎসি বিরোধীতায় যোগদান করার শক্তি পেয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন।[২] অন্যদিকে এই বুদ্ধিজীবির বলয়ের অভ্যন্তরে একটা সাংস্কৃতিক জগত তৈরি হয়েছিল। এই সৃষ্ট সংস্কৃতি দেশভাগের পরবর্তীতে কিভাবে বামফ্রন্ট সরকারে রাজত্বকে স্থায়িত্ব দিতে সাহায্য করেছিল তার আলোচনা রাখা হয়েছে পরের অধ্যায়ে। যাইহোক, অন্যদিকে স্বরাজ পার্টি দূর্বলতা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু (১৯২৫) বঙ্গের রাজনীতিতে শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে জহওরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) কিংবা সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) শ্রমিক কৃষকদের কংগ্রেস রাজনীতিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেও সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ হন। ফলত বাম পরিসরের সংকোচন যেমন রয়েছে তেমনি একক নেতৃত্বে শ্রমজীবি মানুষকে রাজনীতিতে আনা এই পর্বে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যার কারণে ১৯৩০র দশকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের সহচর্যে কৃষক সভা গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও তাদের কার্যকলাপ শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে ওঠেনি। এরকম পরিমণ্ডলে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) কৃষক ও প্রজাদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন (১৯৩৫) তৈরি করে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। তিনি প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গিকার নিয়ে ক্ষমতা দখল করার পর ভূমিসংস্কারকে বাস্তবায়িত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। যার কারণে তার রাজত্বে ফ্লাউড কমিশন (১৯৩৮) গঠিত হয় এবং ১৯৪০ সালে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে প্রজাদের অবস্থান উন্নতির সেরকম ব্যবস্থা হয়নি। সুরাহা না হলেও প্রজাস্বত্বের বিভিন্ন দাবি তা প্রচারে আসতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীতে ১৯৪৩র

মন্বন্তর সমাজজীবনের পরিস্থিতি অনেকটা ভিন্নতর করে তোলে। এই অবস্থাতে কৃষকদের যে দাবি ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে উঠে আসে তাকে কিছুটা আন্দোলনের দাবির ভাষা করে বামপন্থীরা আকস্মিকভাবে তেভাগা আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। এই আন্দোলন বঙ্গের কৃষক আন্দোলন তথা বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় জায়গা করে নেন। আন্দোলনের গুরুত্ব এতটাই গভীর ও বিস্তৃত তা একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এই আন্দোলন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হলেও তার আদি উৎস লক্ষ করা যায় উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে রাজবংশীদের অবস্থান অনান্য সম্প্রদায়গুলোর তুলনায় সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ যেমন ছিল গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কৃষক সম্প্রদায় হিসাবে রাজবংশীদের শ্রেণি আন্দোলনকে সমর্থন এক অন্যমাত্রা দেয়।

প্রথম পর্বের এই কার্যকলাপ শহরকেন্দ্রিক ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য সীমায়িত হলেও তার একটি অন্যমাত্রা থেকে যায়। আলোচ্য সময়কাল বিবেচিত হয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহাত্মা গান্ধীর উত্থানের পর্ব হিসাবে। তিনি প্রথম সাধারণ মানুষের পার্টি হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শ্রমিক কৃষক এমনকি মালিক শ্রেণিকেও জাতীয় কংগ্রেসের নীচে এনে সর্বভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজির আবির্ভাব জাতীয় রাজনীতির লক্ষমাত্রা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কতগুলো শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে শ্রমিক শ্রেণি কথাটি উঠে আসতে থাকে। ১৯২৭ থেকে এই সংগঠনগুলি হয় জাতীয় আন্দোলনে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুবা বামপন্থী সংগঠনগুলোর সঙ্গে মিশে গিয়েছে বা উভয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে।[৩] যদিও বলা হয় উক্ত

সংগঠনগুলির চরিত্র কংগ্রেসে রাজনীতির সঙ্গে খুব একটা সখ্যতা করতে না পেরে বাম-বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সেই বাম-বলয়ের রাজনীতির প্রথমদিকের নেতৃত্বের মধ্য এম. এন. রায়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে। তিনি মনে করেন ইতিমধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য ভারতবর্ষ তৈরি হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে লেনিন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে উপনিবেশিক বিরোধী নীতিতে পার্টিকে কাজ করার জন্য মতামত দিয়েছিলেন।[৪] রায় চেয়েছিলেন রাশিয়ার মডেলে ভারতে 'Workers and Peasants Party' বা 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'[৫] শ্রমিক শ্রেণি উত্থানের জন্য কাজ করবে। যদিও 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (C.P.I.) সাংগঠনিকভাবে প্রকাশ পায় ১৯২৫ সালে। কানপুরের সম্মেলন থেকেই বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য মুজফফ্‌র আহমেদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই অনুসারে তিনি 'বাংলা কমিটি' গঠন করার জন্য বাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বদের আহ্বান জানান 'লাঙ্গল' পত্রিকা মারফৎ। 'লাঙ্গল' কথাটি সঙ্গে কৃষকদের কথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও এটি ছিল শ্রমিক শ্রেণির পত্রিকা।[৬] ফলত প্রথম যুগের আন্দোলনের ক্ষেত্র শ্রমিকদের দিকেই তাকিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কানপুর সম্মেলন থেকে ফিরেই মুজফফ্‌র আহমেদ যোগদান করেন 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনে'। ১৯২৬ সালে এই সম্মেলন বসে কৃষ্ণনগরে। এই সম্মেলন থেকে 'স্বরাজ লেবার পার্টি'র নাম বদল করে রাখা হয় 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। ১৯২৮ সালে এই সম্মেলন বসে আবার ভাটপাড়াতে (কলকাতা)। এখানে নতুন করে সংঠনের নাম রাখা হয় 'বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক পার্টি'। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নেতাদের কাছে দুটি সংগঠন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একটি হল সিপিআই আর অন্যটি হল শ্রমিক-কৃষক পার্টি।[৭] এর ফলে লালঝাণ্ডার সংগঠনের ভিত্তি প্রসারিত হয়েছিল। যার ছত্রতলে বিভিন্ন কৃষক ও

শ্রমিকদের অভ্যুত্থান শুরু হল। ১৯২০ সালের শ্রমিক সংগঠন বা এ আই টি ইউ সি-র বহু শাখা ভেঙ্গে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যার কারণে ১৯২৮ সালে 'শ্রমিক কৃষক পার্টি' সর্বভারতীয় সন্মেলন করার কথা ভাবতে পেরেছিল বলে অনেকেই মনে করেন।[৮] যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক কৃষক পার্টি ইতিমধ্যে সংগঠিত হয়েছে। তাসত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ছিল। সেই দূরত্ব কাটিয়ে ১৯২৮ সালের সন্মেলনে সকলে মিলিত হন। নেতৃত্বের প্রশ্নে এই সময় পর্যন্ত কোন কৃষককে আন্দোলনে যুক্ত করতে পারেনি এবং যাদের দ্বারা সংগঠন পরিচালিত হয়েছিল তাদের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও শহরের বাসিন্দা ছিল। নীতি নির্ধারণের বিষয়েও রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কার্যকলাপ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।[৯]

২. ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ

১৯২০ সাল থেকে শ্রমিক শ্রেণির আবির্ভাব, কংগ্রেস ও জাতীয় বিপ্লবীবাদী আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন – এ সবের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক জীবনে তীব্রতা অনুভব হতে শুরু করেছিল। এসবেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাস্তব উপাদান ছিল। ১৯৩০র দশক পার্টির ইতিহাসে দুটি চ্যালেঞ্জ বেশ জোরাল হয়ে উঠে। এই সময় ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ তুঙ্গে পৌঁছালে ব্রিটিশরা বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেতা নেতৃত্বদের ধরে ধরে বিভিন্ন জেলে কিংবা দ্বীপান্তরে পাঠাতে শুরু করেছিল। এই বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ জেলে বসেই সাম্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হন এবং জেল থেকে মুক্তি পেলে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। অন্যদিকে বামপন্থী নেতারা নিজেরাই কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সংগঠন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি ব্রিটিশদের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার একটি পন্থা

হলেও নেতৃত্বের মনোমালিন্যের জায়গাটিকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। আবার ১৯৩৪ সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে একটি অংশ বেড়িয়ে এসে 'কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি' গঠন করেন। ১৯৩৫ সালে আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশ নীতিতে পরিবর্তন আসে। যার ফল স্বরূপ বামপন্থীরা যুক্তফ্রন্ট নীতিতে[১০] সাংগঠনিক প্রসরতা বৃদ্ধির লক্ষে নিজেদের ভিত দৃঢ় করতে তৎপর হয়ে উঠেন। ১৯৩৬ সালে বাকুড়ার পাত্রসায়ারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ঋণ মুকুব, খাজনার পরিবর্তে আয়কর প্রদানের উপর জোর দেন।[১১] এই সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,০৮০ জন। ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে তা এসে দাড়ায় ৫০,০০০ এ।[১২] ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় পার্টি গঠনের প্রয়োজনে শহর থেকে গ্রামে দিকে কমরেডদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাংলা প্রদেশের মধ্যে প্রথম জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল বর্ধমানে। ১৯৩৩ সালে।[১৩] রংপুর ও দিনাজপুরে যথাক্রমে হয় ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে।[১৪] রংপুরের প্রথম দিককার নেতাদের মধ্য ছিলেন সুধীর মুখার্জি, শচীন ঘোষ, মণিকৃষ্ণ সেন, অবনী বাগচী প্রমুখ। দিনাজপুরে ছিলেন সুশীল সেন, গুরুদাস তালুকদার, বিভূতি গুহ, হাজি দানেশ প্রমুখ। জলপাইগুড়িতেও ১৯৩৮ সালে জেলার কৃষক সংগঠনী কমিটি গড়ে ওঠেছিল।[১৫] এখানে প্রথমদিকের নেতাদের মধ্য ছিলেন শচীন দাশগুপ্ত, বিমল হোড়, সমর গাঙ্গুলী প্রমুখরা। উক্ত তিন জেলা একে অপরে সীমানা ঘেষে অবস্থান করায় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অনুরূপ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যথায় উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলার আধিয়ার কৃষক ছিল প্রধানত রাজবংশী ও মুসলমান। এই মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা রাজবংশী থেকে মুসলিম হয়েছেন। এরা 'নস্য শেখ' নামে পরিচিত। অশিক্ষিত ও সরল প্রকৃতির এই মানুষদের সঙ্গে পাহাড়ি বা আদিবাসী সমাজের অনেকক্ষেত্রে মিল

রয়েছে। তারা ছিল জমিদার জোতদার ও তাদের দক্ষিণ দেশি কর্মচারীদের অবাধ শোষণের শিকার। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রভাবে এরা ছিল জাতীয় কংগ্রেস থেকে দূরে। অনেকটা মুসলীম লীগের মত। উভয় সম্প্রদায় বর্ণহিন্দুদের অবিশ্বাস করত।[১৬] উক্ত অঞ্চলে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ক্ষত্রিয় সমিতি এবং হিন্দু মহাসভা। রংপুর জেলা ক্ষত্রিয় সমিতির প্রধান কেন্দ্র হলেও তার সব থেকে বড় প্রভাব পড়েছিল বাকি দুই জেলাতে। সে অর্থে তিন জেলার জনবিন্যাসে রাজবংশীদের ভূমিকা ছিল অবিসংবাদিত।

৩. জোতদারি ব্যবস্থার পক্ষে জোতদার সংগঠনের মতামত

জলপাইগুড়ি নতুন করে ১৮৬৯ সালে জেলায় পরিণত হওয়ার পর থেকে সেখানকার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব নিয়ে প্রশাসনিক মহলে একপ্রকার অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছিল। যে অস্পষ্টতার কারণে জমি বন্টনে অসমতা ছিল চোখে পড়ার মত।[১৭] স্থানীয় অনেকের জোত হারাতে হয়েছিল, প্রচুর জোত কেনা বেচা শুরু হয়েছিল এবং সেই জোতের মালিক হয়েছিল বহিরাগতরা বিশেষত মাড়োয়ারি, অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং কাবুলিরা।[১৮] ফলত জোতদার শ্রেণিতে নানা প্রকার লোকের সংমিশ্রণে অনুপস্থিত জোতদারের সংখ্যা বেড়ে যায়।[১৯] সর্বপরি আধিয়ার এবং খেতমজুরদের অধিকার সম্পর্কে ইংরেজ সরকার ছিলেন উদাসীন।[২০] আধিয়ার প্রশ্নে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ ভাবনা জোতদার সমাজে লক্ষণীয়। কেননা, পুরানো প্রথা-প্রকরণকে প্রাধান্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ভূমিব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছিল। পারিবারিক সূত্রে কোচরাজ পরিবারের সঙ্গে জলপাইগুড়ি রাজের আত্মীক বন্ধন উক্ত অঞ্চলে কোচবিহারের ন্যায় প্রথা-প্রকরণ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। জলপাইগুড়ি নতুন জেলা ঘোষিত হওয়ার পর কোচবিহার থেকে অনেকেই স্থায়ীভাবে

জলপাইগুড়িতে চলে আসে। কারণ এই নতুন জেলার ভূমিরাজস্ব ছিল কম। নতুন জেলার আয় বৃদ্ধির কারণে রাজস্ব নীতি কম করা হয়েছিল। সেই অর্থে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়। বিশেষত প্রত্যেকটি জেলা কম বেশি রাজবংশী সংস্কৃতি ছিল। সেই নিরিখে আধিয়ার জোতদার সম্পর্ক প্রত্যেকটি জেলায় একেই রকম না হলেও আত্মীক বন্ধনের বিষয়টি কম বেশি ছিল। একই সঙ্গে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আধিয়ারের জমিস্বত্বের প্রশ্নটি উঠলে তার বিরোধিতা করেন জোতদার সমাজ। অর্থাৎ বঙ্গে ১৯২০র দশক প্রজা আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে। যার ভূমিকা ও প্রভাব ১৯৩০র প্রাদেশিক রাজনীতি নির্ধারণ করে দেয়। ১৯১৪ সালে প্রজা অভ্যুত্থান ও সন্মেলন সংগঠিত হয় ময়মনসিং এ। 'আবওয়াব' ও ভূমিসংস্কার ছিল এই প্রজা অসন্তোষের কারণ।[২১] এর বিপরীতে জোতদার সমাজ সম্মিলিতভাবে এই প্রয়াস আটকানোর জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নেয়। ফলত গড়ে ওঠে 'জলপাইগুড়ি জোতদারর্স এসোসিয়েসন'। রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কতের বাড়িতে অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে ১৯/০৪/১৯২৩ ইং সালে একটি সাধারণ সভা আয়োজিত হয়। রাজার সভাপতিত্বে শতাধিক সভ্য নিয়ে সভা শুরু হয়েছিল। তাদের দাবির পরিভাষায় ছিল আধিয়ারদের জমিতে রায়তিস্বত্ব দেওয়ার যে প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে তা বাতিল করতে হবে। আধিপ্রথা কৃষকদের আর্থিক উন্নতির সূচক বলে জোতদারর্স এসোসিয়েসন বয়ান দিয়েছেন এবং এই প্রথার মধ্যে কৃষক স্বাধীনতার দিকটি উঠে এসেছে। কৃষক ইচ্ছে করলে বা জোতদারদের সঙ্গে মনমালিন্য দেখা দিলে অন্যত্র চাষের সুবিধা পেত। আধি নিয়মে সহজে জমি প্রাপ্ত করার উপায় থাকায় সমস্ত জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় মজুরি বৃত্তির আশ্রয় নিলে অভাব অনটনে সম্ভবনা বাড়বে এবং এমতাবস্থায় আধিয়াররা নিরুপায় হয়ে চুরি ডাকাতির

করতে শুরু করলে সমাজের অকল্যাণ সাধিত হবে বলে এসোসিয়েশন মনে করেন। এছাড়াও আধিব্যবস্থায় আধিয়াররা উৎপন্ন শষ্যে অর্ধেক প্রাপ্ত করলেও জোতদারদের ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে জীবন নির্বাহ করতে হয়। কেননা, জোতদারের একটি অংশ সমাজের কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে হয়েছিল। যেমন জমির নালা, আইল, পাট ধোয়ার ডোবা ও মামলা মোকর্দ্দমার যাবতীয় খরচ জোতদারকে বহন করতে হয়। আধিপ্রথা মধ্য দিয়ে অনেক আধিয়ার জোতদার ও দরচুকানিদারে পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এ দেশে যত ছোট ছোট জোতদার, চুকানিদার দেখতে পাওয়া যায় তারা এ ব্যবস্থার দ্বারা উদ্ভুত হয়েছে। আধিয়ারকে প্রজাস্বত্ব প্রদান করলে পুরানো প্রথার সঙ্গে আধিয়ার ও জোতদার উভয় সমাজের ধ্বংস সাধন হবে বলে জোতদারর্স এসোসিয়েসন মত প্রকাশ করেন।[২২]

প্রজাস্বত্ব নিয়ে বিশ শতকের শুরু থেকে আলোচনা শুরু হলেও বাম-রাজনীতিতে বিষয়টি একপ্রকার নীরব ছিল। বরং জমিদারি বা জোতদারি ব্যবস্থা তুলে দিলেই শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস শেষ হবে এই প্রকারে মতামত প্রকাশ করেন বঙ্গের বামপন্থীরা। এমনকি ১৯৩৬ সালের প্রাদেশিক সন্মেলন কৃষক সমস্যা সম্পর্কে নীরব থেকে গেছেন।[২৩]

৪. উত্তরবঙ্গে মহামন্দার প্রভাব ও রাজবংশীদের জমি হস্তান্তর

১৯২৯ সালে বিশ্বজনীন মহামন্দার প্রভাব সমগ্র মানবসমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে আঘাত করেছিল। সেই প্রভাব থেকে উত্তরবঙ্গ বাদ পড়েনি। তার লক্ষণ দেখা যায় সেখানকার ভূমি ব্যবস্থায়। জমির মালিকানা স্বত্বের অদল বদল এমনভাবে হয়েছে তা জনবিন্যাসের চিত্র ও মানসিকতায় নিয়ে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। ১৯২০-১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় বিক্রয়যোগ্য ফসলের দর বার্ষিক গড় ছিল ৭২.৪ কোটি টাকা।

১৯৩২-১৯৩৩ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৩২.৭ কোটি টাকা। এই হিসাবে কৃষকের অবাধ ক্রয় ক্ষমতা ৪৪.৫ কোটি টাকা থেকে নেমে ৪.৪ কোটি টাকা হয়। শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। এমত অবস্থায় বেশির ভাগ কৃষকের পক্ষে খাজনা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ৪৯ ভাগ।[২৪]

১৯৩০ এর দশকের পর উত্তরবঙ্গের ভূমিব্যবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশ্বজনীন মহামন্দার প্রভাবের কারণে অনেকে জমি হারিয়ে ফেলেছিল। অন্যদিকে জমিদার জোরদারদের মধ্যে মানসিকতারও বিরাট পরিবর্তন আসে। এই দ্বিবিবিধ রূপান্তরের ধারা বেয়ে তৈরি হয়েছিল নতুন সমাজ কাঠামো। যেখানে পুরানো ব্যবস্থার জায়গায় আসতে শুরু করেছিল নতুন নতুন আদব কায়দা। মহামন্দা জনিত কারণে কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গাতে দেখা গিয়েছিল জমি হস্তান্তরের ঘটনা। অনেক কৃষক এই সময় জমি হারিয়ে আধিয়ার হয়েছেন। তাদের এই সব জমি কিনে নিয়েছিল মারোয়াড়ী সম্প্রদায়।[২৫] উপেন্দ্রনাথ বর্মণ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন--

> কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার মন্দার ফলে ভূমি সত্ত্বের উপর নির্ভরশীল জমিদার, জোতদার, চুকানিদার, রায়ত সকলেই ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করতে পারল না। ১৯২৭ সাল থেকে খাজনা বাকি থাকায় জমি নিলাম হতে শুরু করে। মন্দা চলিতে থাকে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি নিজের জোতদারি টিকাতে পারেননি। কৃষকরা থালা বাটি বিক্রি করে দিনাতিপাত করতে থাকেন। এই সুযোগে মাথাভাঙ্গার মহানন্দা সাহা নামে এক মহাজন নাম মাত্র মূল্যে তাঁর জমি ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এমনকি কোচরাজ তার জমি নিলামে তুলতে থাকলে মারোয়াড়ী ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা জোত সত্ত্বের মালিক হতে লাগলেন।[২৬]
> জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চল সরকারের খাস মহল। এককালে প্রায় ১০০০

> এর বেশি জোত সার্টিফিকেটে নিলামে ডাকদার না মেলায় কলকাতা থেকে খাস মহল তদন্তে M.M. Stuart, I.C.S এসেছিল।...এই নিয়মে জোতদার বা রায়তের কোন সুরাহা হল না। বিত্তবান মহাজন শ্রেণি ভাল ভাল জোতগুলি ক্রয় করে অধিনস্ত প্রজাদের উপর সুদসহ খাজনা আদায় করতে শুরু করে। তা ধীরে ধীরে জমি খামারে পরিণত হতে লাগল।[২৭]

অকৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তরণের ঘটনা স্থানীয় সমাজ কাঠামোতে একটা বড় মাপের পরিবর্তন নিয়ে আসে। এতে কৃষক, দেওয়ানি সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব বাড়লেও বাড়তে পারে। আবার প্রশাসনিকগতভাবে কোচবিহারের সাথে রংপুর, দিনাজপুর বা জলপাইগুড়ি একটা পার্থক্য ছিল। কোচবিহার ছিল রাজ শাসনের দ্বারা পরিচালিত একটি রাজ্য। অন্যদিকে অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ শাসনের আওতাভুক্ত। উভয় অঞ্চলে নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহিরাগতদের দ্বারা। ব্রিটিশ প্রশাসনের বা রাজ শাসনের বা ব্যবসার খাতিরে এরা উত্তরবঙ্গে আসতে শুরু করেছিল। এই সমস্ত অকৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর হয়েছিল। এতে স্থানীয় সমাজ জমি হারাতে শুরু করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সূচনা ঘটে। মহামন্দার প্রকোপ ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় চলছিল। এই সময় লক্ষ করা যায় উত্তরবঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের সূচনা ঘটতে। উপেন্দ্রনাথ মনে করেন মন্দার ফলে হাজার হাজার জমির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল যা সমাজতন্ত্রের আঘাত থেকেও শোচনীয় ছিল।[২৮]

জমি হারানোর সঙ্গে মান হারানোর বিষয়টি ওতপ্রোত জড়িত ছিল। জোতদাররা জমিস্বত্ব প্রদানে রায়তের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দিতে রাজি ছিলেন না। না দেওয়ার সঙ্গে আর একটি বিষয় যেমন প্রাচীন প্রথা ধ্বংসের দিকে চলে যাবে, এই ভয় সমাজে কাজ করেছিল। তবে এই পর্বে ভাগচাষিরা অভিভাবক হিসাবে পেয়েছিলেন অন্য নৃগোষ্ঠীর মালিককে। সাহা, সূরি, মারোয়াড়ীরা এই সময় প্রচুর জোতের মালিক হয়ে

বসেন। প্রমাণ আছে রাজশাহী ও পাবনা থেকে অনেক বর্ণহিন্দু পরিবার উত্তরবঙ্গে আগমন করেন। যেমন মুস্তাফি পরিবার, বক্সী পরিবার, স্যান্যাল পরিবার, লাহিড়ী পরিবার প্রচুর জোতদারি কিনে নিয়ে ভূসম্পত্তির মালিক হন।[২৯] সোমনাথ হোড় তেভাগার ডাইরিতে রংপুর ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন এদিককার গ্রামের বড় বড় মারোয়াড়ী জোতদারদের বাড়িতে এরা (ভুটিয়া) দারোয়ানের কাজ করে; ভীষন ধূর্ত।[৩০] হটাৎ তাঁর চোখে পড়ে রাইস্ মিল। বাংলার বাইরে থেকে এসে মারোয়াড়ীরা রাইস্ মিল বানিয়েছে। উত্তর বাংলার সব জায়গায় এরা নাকি ছড়িয়ে।[৩১] তেভাগার ডাইরি লিখতে গিয়ে যে দু একজন জোতদারের নাম নিয়েছেন তারা কেউ রাজবংশী জোতদার নয়।[৩২] উত্তরবঙ্গের অন্যতম কমরেড দীনেশ ডাকুয়া এ বিষয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা হল --

> '১৯৩০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী একটা পুঁজিবাদী সঙ্কট হয়েছিল। সেই সঙ্কটের সময় ফসল বিক্রি করে জমির খাজনাও জুটত না। ফলে গ্রামাঞ্চলের বহু জোতদারের বহু জমি নিলাম হয়েছে। নিলাম ডেকে নিয়েছে শহরের উঠ্তি ব্যবসাহীরা। তাঁরা বেশির ভাগই মারোয়ারি, পশ্চিমা ও ভাটিয়া (ভাটির দেশ থেকে আসা লোকদের রাজবংশীরা ভাটিয়া বলে সম্বোধন করত)। নিলামের পর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জমির পুরানো মালিকদের উচ্ছেদ করা হয় নি, সেই ভিটে বাড়িতে থেকে তারা তাদের পুরানো জমির অধিকার হিসাবে চাষ করত। ভাঙা দালান বাড়িতে থেকে শহরের কাইয়াঁর (মারোয়ারি) অধিনে এককালের নিজের জমিই আধিতে চাষ করতে দেখা গেছে। এভাবে কোচবিহার জেলা তো বটেই, সমগ্র উত্তরবঙ্গে এ জিনিস ঘটেছে'।[৩৩]

এই নতুন জোতদারদের মধ্যে একজন মারোয়াড়ী জোতদার বাস করতেন রংপুরের ডিমলা থানায়। নাম হল কোরামল দাগা। তাঁর অত্যাচারে গ্রামগুলো শ্রীহীন হয়ে

পড়ছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাঁর উৎপীড়নে ও অত্যাচারে বহু কৃষক, রমনী ও তার পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে ভুটান যাত্রা করেছিল। রাগী কোরামল একদিন বন্দুক ও তাঁর পাইক বাহিনী রংপুরের কৃষক নেতা মনিকৃষ্ণ সেনকে আঘাতে আঘতে জর্জরিত করে তোলেন। এর প্রতিশোধ নিতে রাজবংশী জোতদার নয়নতারা বর্ম্মনী বাহিনী নিয়ে কোরামল দাগার উপর চড়াও হন।[৩৪] এতে কিছুটা রাজবংশীদের সঙ্গে বাইরের জোতদারের পার্থক্য বোঝা যায়। সুধীর মুখ্যোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ আত্মজীবনীতে লিখেছেন –

> 'রংপুর জেলায় ছোট বড় বহু জমিদার ছিল, স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে সব থেকে বড় ছিলেন তাজহাটের রাজা। ১৯৩৯ সালে তার আয় ছিল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা। তার পরেই কাকিনার স্থান। তাঁর আয় ছিল সাড়ে চার লক্ষ টাকা। তার কিছু মহাল মুর্শিদাবাদের নবাবে কাছে বিক্রি হয়ে যায়। বাহিরে কিছু বড় জমিদার ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা। তাঁর আয় ছিল ৯ লক্ষ টাকা। কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহাকুমা নিয়ে বাহারবন্ধ পরগনা ছিল তার জমিদারি ভুক্ত। যা ছিল সব থেকে বড় একটি পরগনা। রংপুরের বড় জমিদার থাকতেন কলিকাতায়, মাঝারি জমিদাররা থাকেন শহরে। ছোটরা অনেকে গ্রামে থাকতেন।...জেলার মধ্যে সব থেকে বড় জোতদার ছিলেন গাইবাধার সুরেন রায় চৌধুরি। তাঁর আয় ছিল বছরে ৭৫ হাজার টাকা। কান্ত মুদী বাহারবন্ধ পরগণার জমিদারি সত্ত্ব পেলে প্রজারা তাকে মানতে অস্বীকার করেন এবং দীর্ঘকাল প্রতিরোধ চালান। অন্য উপায় না দেখে কান্ত মুদী এক দিকে প্রধান প্রধান মাতব্বর প্রজাদের মধ্যস্বত্ত্ব দিয়ে হাত করেন। অপরদিকে সরকারী দমন যন্ত্রের সাহায্য সাধারণ প্রজাদের দমন করেন'।[৩৫]

এই অভিবাসীদের জীবন চর্চা এবং স্থানীয়দের প্রাত্যহিক জীবনযাপনে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি জোতদার জমিদারদের সঙ্গে রাজবংশীদের সম্পর্কের জায়গাটি

পূর্বের ন্যায় থাকল না। কেননা, নতুন জোতদার বা জমিদারদের অবস্থান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় 'অনুপস্থিত জমিদার'র জন্ম দিয়েছিল। পুরানো জমিদার জোতদারদের সঙ্গে নতুন জোতদারদের মানসিকতায় পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। নতুন জোতদার বা জমিদাররা জোতের তুলনায় শহরে থাকতে বেশি সাচ্ছন্দ বোধ করত। আধুনিক শিক্ষায় সন্তানসন্তিদের শিক্ষিত করে বঙ্গের ভদ্রবাবুদের ন্যায় জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন। অনুরূপভাবে একথা বলা যেতে পারে মহামন্দায় রাজবংশী সমাজ কাঠামোতে বিশেষত ভূমিব্যবস্থার রদবদলে আর্থিক সমস্যাগুলি বেড়েছিল এবং জোরদার সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক কতটা প্রভাবিত হয়েছিল তা তথ্যের অভাবে বলা না গেলেও রাজবংশী রীতিনীতির মধ্যে কিছুটা নতুনত্বের প্রবেশ করে। নতুনত্ব দেখা দিলেও রাজবংশী আদিসত্ত্বার জায়গাটি ছিল। সেকারণে বাম জমানায় তা নতুন করে রাজবংশী জাতি রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিল উত্তরখন্ড, উতজাস বা কামতাপুরি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। যা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দমন করতে রাজবংশী জাতি আন্দোলনকে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে রাজবংশীদের উপর সন্ত্রাস চালাতে হয়েছিল। রাজবংশী যদি শ্রেণি ধারণায় বাম সরকারকে সমর্থন করে থাকে তাহলে নতুন করে জাতি আন্দোলনের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারত।

৫. জাতীয় কংগ্রেস ও রাজবংশী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের নাম এততাই উচ্চারিত এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে যার প্রসরতা সমস্ত স্তরে মানুষের আশা আকাঙ্খার দর্পন হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় ইতিহাসের অসম বিকাশ[৩৬] ঘটেছিল। ইতিহাসের এই ভিন্নতা থাকলেও প্রত্যেক জাতির স্ব চরিত্র ও তার গুণ (Virtue)

একে অপরকে পাশাপাশি নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে।[৩৭] আমার আলোচ্য পর্বে রাজবংশীদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের কিছু কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ রাখব যা বুঝতে সাহায্য করবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি। অন্যদিকে বামপন্থীরা অনেক সময় নিম্নজাতি সমূহের জাতীয় আন্দোলন থেকে বিরত থাকার প্রশ্নটি নিয়ে এসেছে সেই বিষয়ে তাদের অস্পষ্টতা স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত প্রধানত রংপুর থেকে শুরু হয়। সন্ন্যাসী ও ফকির (১৭৬৩) বিদ্রোহের ইতিহাস কিংবা রংপুরের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের কথা বললে রাজবংশীদের নাম চলে আসে। আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত অঞ্চল রাজবংশী অধ্যুষিত। প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ রাজবংশী। ব্রিটিশ আধিকারিকদের বিবরণীতে রাজবংশীদের পরাক্রান্ত জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবীসিংহের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ কীভাবে গড়ে ওঠেছে তার বিবরণ পাই নিচের বয়ানে। সমকালীন কবি রতিরাম দাস লিখেছেন –

"লাঠি নিল, খন্ডি নিল্ নিল কাঁচি দাও।
আপত্য করিতে আর অ্যান থাকিল কাঁও।।
ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিল, হালের জোয়াল।
জাঙ্গাল ধরিয়া সব চলিল কাঙাল।।
চারি ভিত্ হইতে আইল্ রঙ্গপুরের প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল্ কেবল দেখিবার মজা।।

খিড়িকির দুয়ার দিয়া পালাইল্ দেবী সিং।
সাথে সাথে পালেয়ে গেল সেই বার ঢিং।।
দেবী সিং পালাইল্ দিয়া গাও ঢাকা।

কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা"।।[৩৮]

দেবী সিংহের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা জড়িয়ে রয়েছে দিনাজপুর ও রংপুরের ইতিহাসের সঙ্গে। জমিদার থেকে জোতদার; কৃষক থেকে প্রজা, শিশু থেকে বৃদ্ধ, নারী কেউ বাদ যাইনি তাঁর বর্ব্বোচিত মানসিকতার শিকার হতে। একদিকে আর্থিক শোষণ, শাসন আর অন্যদিকে ধর্ষণ ও খুনের নজীর গড়েছিলেন দেবী সিংহ।[৩৯] ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকেই রাজবংশীদের আন্দোলন প্রকাশ পেলেও বঙ্গীয় তথা বৌদ্ধিক সমাজে সে বিষয়ে আলোচনা একপ্রকার নেই বললে চলে। খাজনা বন্ধের আন্দোলন থেকে কারাদণ্ড, সমস্ত কংগ্রেসি পদক্ষেপের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের একটি অংশের মানুষের যোগাযোগ নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠেছিল। যার কারণে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধীজি এবং নেতাজী সভাষচন্দ্র বসু উত্তরবঙ্গে এলে গান্ধী টুপিতে জনসমাবেশ ভরে উঠত। নলিনী পাকড়াশী গান্ধীজির মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে ডুয়ার্স অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। যার কারণে একসময় তিনি 'ডুয়ার্স গান্ধী'[৪০] হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। অন্যদিকে পঞ্চানন জীবনীকার উপেন্দ্রনাথ বর্মণ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন ছাত্র জীবনে তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। কোচবিহার রাজ্যে রাজনীতি করার জায়গাটি না থাকলেও মাথাভাঙ্গার মত অঞ্চলে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। এমনকি তিনি ১৯৪৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসে যুক্ত হন এবং কংগ্রেস রাজনীতির বড় বড় পদে আসীন ছিলেন। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষের যোগাযোগ যে গভীর ছিল তা অনুমেয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব এতটাই প্রভাবিত করেছিল তার অনুভুতি রাজবংশীদের নিজের ভাষায় গান রচনা করতে সাহায্য করে এবং সমকালীন অবস্থার পরিচয় সেই গানগুলিতে প্রকাশ

পেয়েছে। তাতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টি যেমন আমাদের অবগত করতে সাহায্য করে তেমনি বুঝতে সাহায্য করে আন্দোলনের ব্যপ্তিকে।

'ভাত দিম্, পানি দিম্ খাজনা দিম্ না।

জান দিম্, পান দিম্, ট্যাকসো দিম্না,...'[৪১]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী ভূমিকা নিয়ে অনবদ্য ইতিহাস রচনা করেছেন নির্মল চন্দ্র চৌধুরি। ১৯৮৫ সালে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন এবং জলপাইগুড়ি থেকে তা প্রকশিত হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থে তিনি রাজবংশীদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রাজবংশীদের অবদান এবং সর্বপরি রাজবংশীদের স্ব চরিত্র নির্মাণ করেছেন। যদিও বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে জাতি পরিচিতি (Caste Identity) আন্দোলন গড়ে তোলেন রাজবংশীরা এবং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। সেই আন্দোলনের কার্যকলাপে গান্ধীজির মতাদর্শ প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা জাতির (caste) প্রতিরোধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কার্পাস চাষ প্রবর্তন, সুতা কাটার চরকার প্রবর্তন ও তার উৎকর্ষ সাধন, সুতাকাটার কল নির্মাণে উৎসাহ প্রদান করা হয়।[৪২] এই চরকার ব্যবহারকে পঞ্চানন বর্মা 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত করেন। এতে আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন সাধন করার ইঙ্গিত রয়েছে। তবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা কতটা এতে প্রতিফলিত হয় তা বির্তকের বিষয়। কেননা ক্ষত্রিয় সমিতির কার্যকলাপ কখনই জাতীয় কংগ্রেসের ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়নি। তবে গান্ধীজির উজ্জ্বল মূর্তি রাজবংশীদের যে প্রভাবিত করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন নির্মল চন্দ্র চৌধুরি।

পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মানুষের আন্দোলন ছিল স্বাধীনতার আন্দোলন-এইরকম একটা বির্তক চলছিল সেসময়। অন্যদিকে রাজবংশীরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেননি-এই বির্তকে জোর ধরে রাজবংশীদের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন নির্মল চন্দ্র চৌধুরি। যদিও তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন। দেশভাগ পরবর্তীতে (১৯৪৮) জলপাইগুড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

৬. নির্বাচন পরিসরে নিম্নজাতি সমূহের অবস্থান এবং বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি

ব্রিটিশ ভারতে রাজবংশী প্রশ্নটি প্রশাসনিক ভাবে ‘তপশিলী জাতি’র সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে পঞ্চানন বর্মার উদ্যোগে উক্ত পরিচিতিতে রাজবংশীদের প্রাপ্তি ঘটে।[৪৩] তপশিলি জাতিতে অন্তর্ভুক্ত করার পশচাতে বলা হয়েছে রাজবংশীরা শিক্ষা এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতি। উন্নয়নের প্রশ্নে সংরক্ষণ দরকার এমনটাই দাবি করেছেন পঞ্চানন জীবনীকার উপেন্দ্রনাথ বর্মণ।[৪৪] রাজবংশীদের থেকে আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করার এটি এক অন্যতম অভিপ্রায় যা উপেন্দ্রনাথ বর্মণের উপরিউক্ত বয়ানে স্পষ্ট। তার সুবিধে রাজবংশী পেয়েছিল ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে। তপশিলি জাতির এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি তাদের রাজনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি উত্থানের দিকে নিয়ে গেল। প্রসন্ন দেব রায়কত, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, পুলিনবিহারী মল্লিক, প্রেমহরি বর্মণ প্রমূখ ব্যক্তিদ্বয় বাংলার মন্ত্রীসভার আসন লাভ করে তপশিলি মধ্যবিত্তের পরিসর গড়ে তোলেন।[৪৫] পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তপশিলিদের অংশগ্রহণ সংরক্ষণের প্রশ্নকে ধরে শুরু হলেও মন্ত্রীসভায় (১৯৪৭-২০১৬) তাদের অবস্থান শতাংশের নিরিখে ৪.৪৪% থেকে ১৬.৬৬% উর্দ্ধে উঠতে পারেনি আর বাকি অংশ উচ্চবর্ণের দ্বারা কুক্ষিগত[৪৬] হয়ে পড়ে। একে আমরা উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের

অবস্থানের তফাৎ বলতে পারি। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব এতটাই তার তুলনামুলক আলোচনায় না গিয়ে বরং তপশিলি প্রশ্নটিকে নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদ্বয় বা তাদের আদর্শে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং উপস্থাপিত ঘটনা কীভাবে রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠেছে তার দিকে নজর রাখা হয়েছে।

'তপশিলি জাতি' প্রশ্নটি উপনিবেশিক পর্বে উত্থাপিত 'একগুচ্ছ জাতি' ও তার ব্যবস্থা'র সম্মিলিত ধারার একটি ভিন্ন নাম। প্রাক-উপনিবেশিক কালে সামাজিক অবস্থানের নিরিখে যে সকল জাতিগুলির অবস্থান নিম্নস্তরে - সাহিত্যে দেখানো হয়েছে – ব্রিটিশ শাসন কালে তা তপশিলি জাতি কিংবা তপশিলি উপজাতি হিসাবে উত্থাপিত হয়েছিল। যেমন চন্ডাল, চামার, মুচি, অস্পৃশ্য ইত্যাদি জাতিগুলি সাংবিধানিকভাবে একত্রে তপশিলি জাতির তকমা অর্জন করে। নিম্নবর্ণীয়দের এই অভিধা প্রাপ্তি আবডালে জাতির ক্রমবিন্যাসে অন্তর্ভুক্তি আসলে শাসকের শাসনের অভিপ্রায় বলা চলে। বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার আদিমতম রূপের এক অনুরূপ ব্যবস্থা উপনিবেশিক পর্বে শুরু হয়। এই পর্বে বি আর আম্বেদকর তপশিলি জাতির মুক্তির পথ হিসাবে 'রাজনৈতিক অধিকার' আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেন। এ জন্য নিরূপমা রাও তার অনবদ্ধ গবেষণা পত্রে মাহারদের 'Political Community' জায়গার থেকে আলোচনা শুরু করেন যা সন্দর্ভের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে তিনি লিখেছেন --

> 'Untouchables, usually known by degrading names such as Chamar, Mahar, Mang and Paraiyar, were dehumanized by the caste Hindu order'.[৪৭]

অর্থাৎ বর্ণ হিন্দু কাছে তপশিলি জাতি অমানবিক ও অপমানজনক- এইরকম একটা সামাজিক ইন্দ্রিয়গোচর (Social Phenomenon) বস্তুতে পরিণত হল। সংরক্ষণের বিষয়টি সংসদীয় রাজনীতিতে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসেছিল তা বাদ দিয়ে নির্বাচন-রাজনীতি আবার অচল হয়ে পরার সম্ভবনা তৈরি হয়েছিল। ১৯৮০ সালের সপ্তম লোকসভা নির্বাচন তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তপশিলিদের সংরক্ষণ ও তার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্নটি মাথায় রেখে এই নির্বাচন তরিঘরি করে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল।[৪৮] সংবিধানে বি আর আম্বেদকর সহ অনান্যরা বলেছিলেন পিছিয়ে পড়া জাতিসমূহের যদি দশ বছরের সংরক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে তারা বর্ণ হিন্দুদের সম-স্থানে অবতীর্ন হওয়ার সুযোগ পাবে, এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সংরক্ষণ নিয়ে এক ধরনের রাজনীতির জায়গা তৈরি করেছেন (বর্ণ হিন্দুরা) বিভিন্ন দল বা পার্টির পক্ষ থেকে, বলে মনে করেন মনোরঞ্জন বড়াল।[৪৯] তার লেখনীর একটি বড় অংশ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস সংরক্ষণ সমর্থন করলেও তপশিলিদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সে তুলনায় তপশিলিদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করার পক্ষে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তার অনুরূপ বয়ান লক্ষ করে যায় গান্ধীজির ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছিলেন 'তপশিলি শ্রেণি যে সকল দাবি করে তার চেয়েও আর অনেক বেশি করা আমি অবশ্যক মনে করি'।[৫০] বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি জাতীয় কংগ্রেস দিলেও তপশিলি জাতি বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে খুব একটা সখ্যতা গড়ে তোলেনি। নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল গান্ধীজিকে বলেছিলেন জাতীয় কংগ্রেস বর্ণ হিন্দুর দল। তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস করি কি করে।[৫১] ১৯৪৬ সালে ৫ই নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় গর্বের সাথে তিনি বলেছিলেন 'তপশিলি জাতি হিন্দুদের আওতায় থাকিয়া

ঘৃণিত জীবনযাপন করার চেয়ে মুসলমান বা অন্য কোন জাতির আওতায় স্বাধীন ও সম্মানের সহিত বাস করিতে বেশি পছন্দ করে'।[৫২] ফলত বাংলায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তপশিলিরা সরকার গঠন করেনি। বরং ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি' এবং মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকারের সঙ্গে তপশিলিরা যোগদান করেন। উক্ত মন্ত্রীসভায় উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ১৯৪১ সালে 'বন ও আবগারি' দপ্তরের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন।[৫৩] আর যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ১৯৪৩ সালে নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় 'সমবায় ও ঋণদান' দপ্তরের মন্ত্রী হন।[৫৪] জাতীয় কংগ্রেস এবং তপশিলি জাতি প্রশ্নটি অর্থাৎ একের প্রতি অপরের দৃষ্টিভঙ্গির যেটুক পরিচয় পাওয়া গেল উপরিউক্ত আলোচনাকে ধরে বামপন্থীরা তার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে--

> 'কি গভীর বিভেদই না কংগ্রেস ও তপশিলি সমাজে সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ত্যাগ করলে বি আর আম্বেদকর এবং জিন্না মিলে মুক্তি দিবস পালন করে।[৫৫]

বামপন্থীরা *'মুক্তি সংগ্রামে তপশিলী শ্রেণী'* নামক একটি শিরোনামে তপশিলিদের সম্পর্কে লিখেছেন--

> 'নিজেদেরই দেশবাসীদের হাতে অস্পৃশ্যেরা যে অত্যচার সহ্য করে, তাহার অবদি নাই। তাহাদের প্রতি যে অপমানজনক ব্যবহার করা হয়, তাহা গণতন্ত্র দূরে থাক, সাধারণত মানবতার বিরোধী। যে কোন মুক্তিকামী ভারতবাসীই এই ব্যবহার দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে বাধ্য হইবে'।[৫৬]

জাতীয় কংগ্রেসের ও তপশিলির এই বিরোধকে বামপন্থীরা দেখেছেন জাতি সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার জায়গা থেকে। জাতীয় কংগ্রেস তপশিলিদের অধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্ব দেননি বলে অভিযোগ করেছেন। অর্থাৎ যে স্থানে বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান সেখানে ঐক্যের কল্পনা করা হয়েছে এবং অস্পৃশ্যদের যে একটা রাজনৈতিক

সত্তা আছে তা অস্বীকার করেছেন।[৫৭] অনুরূপ অভিযোগ করেছেন তপশিলিদের ক্ষেত্রেও। এই দ্বন্ধ করতে গিয়ে তপশিলিরা একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলেন কীভাবে ইংরেজের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। পূর্ণ স্বাধীনতায় না গিয়ে তপশিলিরা 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন'র মধ্যে থাকতে চায় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৫৮] স্বাধীনতা সংগ্রামে তপশিলিদের অবস্থান সম্পর্কে ভারত তথা বঙ্গের বামপন্থীদের উক্ত বয়ান এককেন্দ্রিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ বলা চলে। অপরদিকে তপশিলিরা অস্পৃশ্য- এই ভাবনার বাইরে বেড়িয়ে এসে তাদেরকে নিয়ে বামপন্থীরা ভাবতে পারেননি। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ হিসাবে তাদের চিহ্নিত করেছেন বামপন্থীরা। ফলত শ্রেণির প্রশ্নটি এক্ষেত্রে অনেকটা প্রান্তিক রূপে অবস্থান করে। বামপন্থীরা মনে করেন শ্রেণির ধারণা উপরিউক্ত অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে --

> যদি দূরগতিতে দেশের শিল্পোন্নতি, জমিদারি প্রথার অবসান, চাষবাসের ব্যবস্থায় বড় রকমের অদলবদল এসব পরিবর্তন হলে অধিকাংশ অস্পৃশ্যই ত' নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া উপার্জ্জনের অবাধ সুযোগ পাইবে এবং তবেই বাস্তবিক অস্পৃশ্য দূর হবে। এজন্য দেশকে বিদেশী শাসনের শিকল ভাঙ্গতে হবে।[৫৯]

অর্থাৎ শ্রেণির ধারণার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা নতুন কিছু হওয়ার (Hope) স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেন। তবে তপশিলিদের সংগ্রামের প্রশ্নটিকে বামপন্থীরা একপ্রকার এড়িয়ে গেছেন। উপরিউক্ত বয়ানে তা স্পষ্ট। সমাজের আভ্যন্তরিন যে ব্যধি তার বিরুদ্ধে তপশিলিদের সংগ্রামের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় বামপন্থীর ধরতে পারেনি তপশিলিদের অবস্থানকে বুঝতে। যেমন অস্পৃশ্যতার অভিশাপের কারণে আম্বেদকরকে ক্লাস রুমের বাইরে থেকে পড়াশুনা শিখতে হয়েছিল। যাইহোক, তপশিলিদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে বঙ্গের বামপন্থীরা সচেতন থাকলেও বাম

জমনায় তপশিলিরা সব থেকে কম রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে।[৬০] একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেন। তাতে ৩০ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং জ্যোতি বসু মূখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। এই ৩০ জন সদস্যের মধ্যে তপশিলি জাতির এক জনও বামমন্ত্রী সভায় স্থান পায়নি। এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তা প্রশমিত করার জন্য কান্তি বিশ্বাসকে (যিনি পরবর্তীতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী) নিয়ে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রমোদ দাসগুপ্ত, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কমরেড এক ঘরোয়া আলোচনায় অংশ নেন। কান্তি বিশ্বাসের কাছে এই বিক্ষোভের কথা বলতেই তিনি বলতে শুরু করেছিলেন --

> "স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন হেমচন্দ্র নস্কর, তিনি তপশিলি জাতিভুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেখানেও হেমচন্দ্র নস্কর মন্ত্রীসভায় স্থান পায়। ১৯৫৭ সালে পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় সেখানে হেমচন্দ্র নস্কর এবং শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ পূর্ণমন্ত্রী এবং অর্ধেন্দু শেখর নস্কর রাষ্টমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হন। এরা তিনজনেই ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেখানে অর্ধেন্দু শেখর নস্কর এবং প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এই দুইজন তপশিলিভুক্ত জাতি সম্প্রদায় মন্ত্রীসভায় স্থান লাভ করে। ১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়। সেখানেও অর্ধেন্দু শেখর নস্কর স্থান পান। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, মুখ্যমন্ত্রী হন অজয় মুখার্জি। চারুমিহি সরকার, যিনি ছিলেন তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালেই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের

নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছিলেন গঙ্গাধর প্রামানিক, তিনিও ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত। ১৯৬৮ সালে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে নতুন যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় সেখানে বিনোদ বিহারি মাঝি মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সেখানে কৃষ্ণচন্দ্র হালদার এবং চারুমিহি সরকার অন্তর্ভুক্ত হন। এঁরাও ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত। ১৯৭১ সালে সির্দ্ধান্তশঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভায় আনন্দমোহন বিশ্বাস ও রথীন তালুকদার মন্ত্রীসভায় ছিলেন। এঁরা উভয়ে ছিলেন তপশিলি জাতিভুক্ত। ১৯৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী সির্দ্ধান্তশঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভায় আনন্দমোহন বিশ্বাস ও গোবিন্দ নস্কর এই দুই জন তপশিলি জাতিভুক্ত স্থান পায়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরে এই প্রথম রাজ্য মন্ত্রীসভায় তপশিলি জাতিভুক্ত কাউকে মন্ত্রী করা হয় নি। আমার মনে হয় এর ফলে রাজ্যের এই অংশের মানুষের মধ্যে আপশোচের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে”।[৬১]

কান্তি বিশ্বাসের উপরিউক্ত তপশিলি জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমাদের বুঝতে সাহায্য করে মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের অধিকারের জায়গাটি কতটা সঙ্কুচিত। এ বিষয়ে রূপ কুমার বর্মণ তার অনবদ্য গবেষণা *‘জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক’*[৬২] আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। এ সব শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কান্তি বিশ্বাসকে উত্তর দিচ্ছেন- ‘তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষ আর্থিক, সামাজিক দিক থেকে পশ্চাদপদ এটা বাস্তব, তাদের কথা আমরা জানি কিন্তু তার জন্য কাউকে মন্ত্রী করতে হবে তার যুক্তি কোথায়’? এর উত্তরে কান্তি বিশ্বাস বলেছিলেন-

“এই পশ্চাদপদ সম্প্রদায় তথা তপশিলি জাতিভুক্ত, এবং আদিবাসিদের করুণ অবস্থা এবং তার থেকে উদ্ধার করার কথা কমরেড সুন্দরাইয়া, কমরেড বাসব

> পুন্নাইয়া, কমরেড বি টি রণদীভে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ করেছেন। কার্ল মার্কসও তাঁর লেখার এক জায়গায় ভারতের বর্ণবৈষম্যের কথা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে না তুললে শ্রেণিসংগ্রামও যথোচিতভাবে বিকশিত হবে না, এইরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর ওই পশ্চাদপদ মানুষ সাধারণভাবে উচ্চবর্ণের কোনো নেতার কাছে তাদের অন্তরের জ্বালা ব্যক্ত করতে অনেক সময় ভয় পায়, ভাবে নেতা তাহলে তাদের সাম্প্রদায়িক আখ্যায় আখ্যায়িত করবেন। এই জন্য তাঁদের ব্যথা বেদনার কথা যথার্থভাবে উপস্থাপিত করার জন্য তাদের মধ্য থেকে পার্টির গণসংগঠন ও সংগঠনের মধ্যে যেমন কাউকে তুলে আনার প্রয়োজনীতা আছে তেমনি প্রশাসক পরিচালনায় তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকার যৌক্তিকতা আছে''।[৬৩]

দুই কমরেডের তথা উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কথোপকথন এতটাই প্রাসঙ্গিক ছিল যে, এর প্রসঙ্গ ধরে কয়েক মাস পরে সেই মন্ত্রীসভায় কান্তি বিশ্বাস রাষ্টমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন।[৬৪] সেই নিরিখে **১৯৭৭**র মন্ত্রীসভায় কান্তি বিশ্বাস একমাত্র তপশিলি জাতিভুক্ত সদস্য। অর্থাৎ পূর্বাতন মন্ত্রীসভায় এক বা দুজন তপশিলি যে স্থান পেত তারই অনুরূপ ছবি লক্ষ করা গেল বাম জমানায়। উপরন্তু তপশিলি জাতিকে বলতে হয়েছিল কেন বাম জমানায় তপশিলি প্রতিনিধিত্ব দরকার। তার থেকেও বড় যে বিষয়টি এতে প্রকাশ পেয়েছে তা হল বি টি রণদিভে[৬৫] বা স্বয়ং কার্ল মার্কস ভারতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে দু এক লাইন লেখার কারণে জ্যোতি বসুরা বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছিলেন। জ্যোতি বসু তাঁর আত্মজীবনী *'যত দূর মনে পড়ে* তে লিখেছেন --

> 'দাদার বিয়ের কথা ঠিক হল। শুনলাম, পাত্রী প্রসন্নদেব রায়কতের মেয়ে। বাবা এবং মার মনে এই বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কারণ অনেক নিকট আত্মীয়রা বলেছিলেন, রায়কত পরিবারের হাতে বসু পরিবারের জল চলে না। আমরা তো

অবাক। জাতপাতের প্রশ্নটা হটাৎ এভাবে চলে এসেছিল। আমরা তো হাসাহাসি করতাম। যাইহোক, নির্বিঘ্নে দাদার সঙ্গে সেই পাত্রীর বিয়ে হয়ে গেল'।[৬৬]

এই রায়কত পরিবার হল জলপাইগুড়ির রাজপরিবার অর্থাৎ কোচবিহারের রাজপরিবারে একটি অংশ। যে রাজপরিবারে কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতি দেবীর বিয়ে হয়েছিল। জ্যোতি বসুর দাদার এই বিয়ে বোধহয় ছিল প্রেমঘটিত। এই বিয়ে রাজবংশীদের অনেক ক্ষতি করেছিল বলে অরবিন্দ ডাকুয়া মনে করেন।[৬৭] তিনি হলেন রাজবংশী সমাজের নেতৃস্থানীয় একজন লেখক। সেকারণে জ্যোতি বসুরা মন্ত্রীসভায় তপশিলিদের স্থান প্রথমদিকে দিতে চাননি। পরে বাধ্য হয়ে বিক্ষোভের মুখে পরে কান্তি বিশ্বাসকে মন্ত্রীত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বাম প্রতিবেদনে যেমনটা বলা হয়েছিল বাস্তবে কি বিপরীত চরিত্রই বঙ্গের বাম শাসনে প্রকাশ পেয়েছে ? এ বিষয়ে জগদীশ চন্দ্র মণ্ডলের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল জ্যোতি বসুর সম্পর্কে।

'১৯৫৯ সাল। খাদ্য আন্দোলন করে জেলে গিয়ে জ্যোতি বসুকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। কথা ও কাজে যেমন মিল নাই, যা বলেন তা করেন না, যা করবেন বলে ঠিক করবেন, তা ঘুণাক্ষরেও সামান্য আভাস-ইঙ্গিতে কাউকে পূর্বাহ্নে জানতে দেবেন না। পরিপাটি পোশাকে, ভোগবিলাসি ভদ্রলোক'।[৬৮]

বঙ্গের বাম-কর্মীদের আত্মজীবনী বা তাদের সংগঠনের ইতিহাসের সঙ্গে অনেকটাই উচ্চবর্ণের বাঙালিদের নাম জরিয়ে রয়েছে। এরা তথাকথিত ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পশ্চিমী ভাবধারায় আত্মবিশ্বাসী। বর্ণের বিষয়টি শ্রেণিসংগ্রামে গুরুত্ব না পেলেও নেতা নেতৃত্বদের অবস্থান জাতি প্রশ্নে জড়িয়ে ছিল। ফলত জাতির প্রশ্নটি আবডালে রাখার মধ্য দিয়ে শ্রেণির ধারণা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে দারিদ্রতার বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেখান মুক্তির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে প্রধানত উন্নয়নের মাপকাঠিতে। বিপ্লবাত্বক ধারণা বঙ্গের রাজনীতিতে সেভাবে যুক্ত

হয়নি বলে রজ মালিক মনে করেন।[৬৯] তিনি মনে করেন দারিদ্রতার জায়গাটিতে তপশিলিদের অবস্থান রয়েছে এবং অন্যদিকে বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণির হল বঙ্গের বাম শাসনের অন্যতম সমর্থক।[৭০] পাশাপাশি দেশভাগ ও তার পরবর্তীতে অগুনতি মানুষজন যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল এই সমস্ত নতুন লোকজনেই হয়ে উঠেছিল বাম শাসনের মধ্যমণি। অর্থাৎ দেশভাগের মত পরিস্থিতির উদ্ভব বাম শাসনের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক দীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ করা যায় জয়া চ্যাটার্জির *'Bengal Divided'* এ। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে ব্যবসা বা শিল্পের উপর নির্ভরশীল নয়, জমির হল আয়ের উৎস। এই পেশাগত অবস্থান বাম শাসনের ভিত্তি গড়তে সাহায্য করে। এরা জাতিগত ভাবে উচ্চবর্ণে অবস্থান করে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সঙ্কিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বহন করে। এরা উপনিবেশিক বঙ্গে 'ভদ্রবাবু' নামে পরিচিত। বঙ্গের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনায় এদের অবস্থান ছিল প্রথম সারিতে। সেই সঙ্কিন্নতা প্রতিফলিত হয়েছে বঙ্গের জাতীয় আন্দোলনে।[৭১] তাদেরই একটি অংশ পরবর্তীতে বঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মধ্যমণি রূপে প্রতীয়মান হন। উপনিবেশিক বঙ্গের রাজনীতিতে ভদ্রলোকদের প্রাধান্যতা বেশ গভীর থাকলেও ১৯১১ সালে দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলে তাদের ক্ষমতার স্খলন শুরু হয়। এই সময় গান্ধীজী নেহেরুর অবস্থান বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং বঙ্গের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যভাবে প্রতিফলিত হতে থাকলে বঙ্গে বিপ্লবী কার্যকলাপের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এর ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে বঙ্গের দূরত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বিপ্লবীরাই পরবর্তীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন বলে মুজাফফ্‌র আহমেদ থেকে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৭২] আর গ্রাম বাংলায় সাধারণ মানুষকে

রাজনীতির সঙ্গে এই প্রথম বামপন্থীরা জরিয়ে ফেলাতে তারা অনুভব করতে পেরেছিল বাম শাসনের নতুনত্বকে। এই দ্বিবিবিধ অনুষঙ্গ বঙ্গে বাম রাজনীতির অনেকটাই অনুকুল পরিস্থিতি তৈরি করে।

৭. হাততোলা ও মেলায় আন্দোলন

উত্তরবঙ্গে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে স্থানীয় হাট ও বাৎসরিক মেলাগুলির ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। বামপন্থী রাজনীতির পরিসর গড়ে তোলার অর্থে হাটগুলো প্রাথমিক ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। কীভাবে হাট ও মেলাগুলি রাজনীতির জায়গা হয়ে উঠেছিল তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১৯৩৯র শেষদিক থেকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হাটতোলা বন্ধের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রথম আরম্ভ হয় জলপাইগুড়িতে। এর পড়েই দিনাজপুর ও রংপুর ছিল আন্দোলনের অন্যতম জেলা। একদিকে কৃষক সমিতি গড়া এবং তার আর্দশ প্রচারের জন্য তার পাশ্ববর্তী হাট বা মেলাকে বেচে নেওয়া হয়েছিল। যেখানে ইতিমধ্যে কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছে, তার প্রভাব বেশ শক্তিশালি, কৃষক আন্দোলনের পুর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, তার পাশ্ববর্তী হাট বা মেলাকে ধরে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাটে জমায়েত, মিছিল, মিটিং, সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৭৩] আন্দোলনের দাবির মধ্যে ছিল --

১. কৃষকের গন্ডি নেই।
২. রসিদ দিয়ে খাজনা নিতে হবে।
৩. গরু ছাগল ক্রয়ের রসিদ বাবদ আদায় কমাতে হবে।
৪. হাটের ইজারা প্রথা তুলে দিয়ে কমিটির হাতে হাটের দায়িত্ব দিতে হবে।[৭৪]

প্রচলিত নিয়ম ছিল হাটে বাজারে পণ্য বিক্রয় করতে হলে বিক্রয়কারীকে ‘মাসুল’ দিতে হবে। এই হাটগুলি বসত কোন না কোন জমিদারের জমিতে। সেই নিরিখে

সেই হাটের মালিক হত জমিদার বা জোতদার। এই ‘মাসুল’কে ‘তোলাবাটি’ বলা হয়। এই ‘মাসুল’ অর্থাৎ ট্যাক্স জোর জবরদস্তি ভাবে আদায় করার কথা বাম নেতাদের বয়ানে উঠে এসেছে। তার বিরুদ্ধের নেতারা প্রথম আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। মেলাতেও আন্দোলনের অনুরূপ চিত্ত ধরা পড়ে। গ্রাম্য মেলাগুলি বছরের কোন এক সময় বসে কোন ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়মে। এখানেও নেতাদের আন্দোলনের পরিভাষা একই রকম ছিল। কারণ এই মেলাগুলোতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য ছিল কৃষকদের উৎপাদিত শষ্য বা গরু মোষ। এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার পশ্চাতে একটি বাড়তি সুবিধে ছিল। গ্রামের প্রায় অধিকাংশ মানুষের যোগাযোগের বড় মাধ্যম ছিল এই হাটগুলি। সপ্তাহে দুদিন হাটগুলো বসে। ফলত জমায়েত জনপরিসরে তাদের পরিকল্পনা প্রচার করার বিষয়টি ছিল শ্রেণির ভাবকে সহজে ছড়িয়ে দেওয়া সুবিধে। মনে হয় হাটগুলোকে ধরে নেতাদের গ্রাম প্রবেশের রাস্তা তৈরি হয়েছিল। কারণ গ্রামের রাজনীতি বা গ্রামে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন কংগ্রেস নেতাদের হাত ধরে। কংগ্রেসেই প্রথম গ্রাম ও শহরের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করেন। সেই পথ ধরেই এগোতে হয়েছে এবং কংগ্রেসি রাজনীতি দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। কংগ্রেস রাজনীতি হল জমিদার বা জোতদারদের রাজনীতি। ১৯৩০র পর থেকেই জমিদার বা জোতদারদের চরিত্র এবং মানসিকতায় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। স্থানীয়দের জমি হারানো, মহামন্দার প্রভাব, অন্য জাতের লোকেদের জমিতে উপস্থিতি, তাদের জমির মালিক হয়ে উঠা, কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই ‘অনুপস্থিত’ জমিদারদের আবির্ভাব উত্তরবঙ্গের ব্রিটিশ এলাকাগুলোতে একটা অন্যমাত্রা নিয়ে এসেছিল। যার প্রভাব পড়ে স্থানীয় সমাজের উপর। শহুরে জীবনের ভাবধারা অনুকরণ করার একটা ঝোক স্থানীয় সমাজে পড়ে।

বামপন্থী নেতারা তাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, এই সমস্ত লোকদের প্রতি রাজবংশী সমাজে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। নীচের বাম নেতার বয়ানটি তারই সাক্ষ্য দেয়--

> 'আমাদের উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর-রংপুরের আদত বাসিন্দা হচ্ছে রাজবংশী ও মুসলমান। পরে এসেছেন সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও। এঁরাই হচ্ছেন কৃষক। উচ্চবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকেরা বেশীর ভাগই এসেছেন বাইরের থেকে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসাহী, কর্মচারী ও কিছু জোতদার, জমিদার হচ্ছেন এই উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকেরা। যদিও দেশীয়দের (রাজবংশী ও মুসলমান) ভেতরও অনেক জোতদার ছিল। ভদ্রলোক ও কৃষকরা যেন ছিল দুটো আলাদা জাত। তাদের বলবার ভাষা আলাদা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি আলাদা। তার উপর নানা ভাবে বঞ্চিত কৃষকরা এই ভদ্রলোকেদের দেখত সন্দেহের চোখে।...গায়ের সাথে শহরের যেটুক রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল তা গড়ে তুলেছিল কংগ্রেসেই। আমরা কংগ্রেসে যোগ দিলাম...'।[৭৫]

উত্তরবঙ্গে, শহুরে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যেই প্রথম বাম চিন্তার উদয় ঘটে।[৭৬] এরাই কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। অর্থাৎ কংগ্রেস রাজনীতির মধ্য দিয়ে যদি বাম আন্দোলনের প্রসরতা আসে তাহলে জমিদার বা জোতদারে সঙ্গে নেতাদের প্রাথমিক সম্পর্ক সাধিত হয়েছে বলা যায়। তবে ছোট ছোট জোতদাররা তাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেও বড় ও মাঝারি জোতদাররা বাম নেতৃত্বকে মানতে পারেনি।[৭৭] কারণ হিসাবে অনেক সময় দেখান হয়েছে আর্থিক দিক থেকে বড় জোতদাররা এগিয়ে থাকায় কৃষকদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ এনে মামলা করত। যার ফলস্বরূপ পুলিশের গুলিতে সাধারণ চাষিরা মারা যান (কম্প্রাম

সিং)। আলোচ্য সময়কালে নেতারা আত্মগোপন করে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।[৭৮]

৮. ফ্লাউড্ কমিশন (১৯৩৮-৪০)

১৯২০র দশক থেকেই বঙ্গের কৃষকরা ভূমিস্বত্বের অধিকার নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস বা বামপন্থী দলগুলি তার সদার্থক ভূমিকা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় ফজলুল হক কৃষক প্রশ্নটিকে নির্বাচন-রাজনীতিতে নিয়ে আসেন এবং তাদের নিয়ে একটি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেন। নাম রাখেন 'কৃষক প্রজা পার্টি'। যদিও ১৯২৯ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'র নাম বদল করে ফজলুল হক 'কৃষক প্রজা পার্টি' নামটি সামনে নিয়ে আসেন।[৭৯] ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী বঙ্গীয় আইন সভার প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফজলুল হকের এই তৎপরতা শুরু হয়েছিল। এই নির্বাচনে বঙ্গের প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। কোন দলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না পাওয়ায় বঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয়েছিল। ফজলুল হক তপশিলি ও মুসলিম লীগকে নিয়ে সরকার গঠন করেন। ফলে মফস্বল থেকে একটা বড় অংশের বিধায়ক উঠে আসেন। অন্য অর্থে ভূমি নির্ভর মানুষদের নিয়ে সরকার গঠন বঙ্গের রাজনীতিতে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত করেছিল।

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের আস্তা যাতে ফজলুল হকের 'কৃষক প্রজা পার্টি'র দিকে থাকে তার জন্য নির্বাচন ইস্তেহারের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল জমিদারি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া এবং কৃষকদের ভূমিস্বত্ব পুনরুদ্ধারের অঙ্গিকার। সেই মোতাবেগ বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রী সভা গঠন করেন মুসলিম লীগ

ও অনান্যদের সঙ্গে নিয়ে। কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেগ ক্ষমতায় আসার পর ফজলুল হক ভূমি ব্যবস্থার পুনঃমূল্যায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয় ১৯৩৮ সালে এবং তাঁরেই নামানুসারে কমিশনের নাম রাখা হয়। তিনি ১৯৪০ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। মূলত জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল এবং ভূমি নিয়ন্ত্রণে সকল মধ্যস্বত্ব বিলোপ সাধন, উৎপন্ন ফসলের অধাংশের বদলে এক-তৃতীয়াংশ করার সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রিপোর্টের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ফ্লাউড বিভিন্ন জায়গা থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন। বিশেষ করে কৃষক সভা, রাজস্ব আধিকারিক এমনকি জমিদারদের কাছ থেকে মৌখিক ও লিখিত বয়ান সংগ্রহ করেছিলেন। সেই উদ্যোগে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক কৃষক সভা একটি স্মারক পাঠিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন বঙ্কিম মুখার্জি, রেবতী মোহন বর্মণ, ভবানী সেন প্রমূখ।[৮০] তবে কমিশনের কাছে পাঠানোর কৃষক সভার দাবিতে তেভাগার উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি ফ্লাউড কমিশন গঠন করা নিয়ে বিরোধীরা বার বার প্রশ্ন তুলেছিলেন। বঙ্কিম মুখার্জি বলেছিলেন বাংলার সমাজব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন দরকার। আইন প্রণয়ন করে সে পরিবর্তন আসতে পারে না। অন্যথায় কমিশন নিয়োগ করে ভূমিব্যবস্থার সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন।[৮১] রিপোর্ট প্রকাশের পরেই বাম নেতারা এই বিষয়ে সচেতন হন। ১৯৪০ এ পাঁজিয়াতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সভাতে তেভাগার দাবি কার্যকরি করার দাবি জানানো হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৬ সালে।[৮২] এই সময় তেভাগার দাবি নিয়ে কৃষক সভা পরিচালনার আদেশ জারি হয়। আওয়াজ উঠতে থাকে নিজ খোলানে ধান তোলার দাবি। হটাৎ করে বাম

আন্দোলনে তেভাগার দাবি এবং আন্দোলন সংগঠিত হওয়া বিষয়টি যতটা বাম-রাজনীতির তার তুলনায় সে সময়কার আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অনেক বেশি ছিল যথোপযুক্ত। সেকারণে নেতাদের বয়ানে উঠে এসেছে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শ্রেণি চেতনা আমাদের মধ্যে সেভাবে বিকাশ ঘটেনি।[৮৩] তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট।[৮৪] তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে আন্দোলনের চরিত্র কেমন ছিল? এ বিষয়ে নীচে আলোচনা করা হয়েছে। যাইহোক, ফ্লাউড কমিশনের মত বাস্তবায়নে সরকার খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি মুসলিম লীগের অসহযোগিতার কারণে। তবে ফজলুল হকের আমলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি কল্পে কয়েকটি আইন পাশ হয়েছিল। যেমন সালিশি বোর্ড (১৯৩৮), প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৩৯), মিউনিসিপ্যালিটি আইন সংশোধন (১৯৩৯),এবং মহাজনী আইন পাস (১৯৪০)।[৮৫] যা বঙ্গের কৃষকের অবস্থান কিছুটা পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে। তবে ১৯৪৩ এর মহাদুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা এবং দেশভাগ এমন পরিস্থিতির জন্ম দেয় ফ্লাউড কমিশন বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৫১ সালের আইনে জমিদারি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়।

৯. ১৯৪৬র নির্বাচন ও বামপন্থী প্রার্থী হিসাবে রাজবংশী

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোয়ালিশন সরকারে বামপন্থীরা যোগদান না করে কংগ্রেসকে সহযোগিতা করেছিলেন। তখন শ্রমিক কেন্দ্র ছিল আটটি। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থী দেওয়ার জন্য একটা ইউনাইটেড ফ্রন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। বেঙ্গল লেবার এ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল লেবার পার্টি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ওয়ার্কার্স লিগ, গণবাণী গ্রুপ, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কৃষাণ সভা – গোষ্ঠীগুলিতে বিভক্ত বঙ্গের বামপন্থীরা। এই কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস

নিজেদের কোন প্রার্থী না দিলেও কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে কয়েকটিতে বামপন্থীরা জয়ী হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন।[৮৬] এদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আফতাব আলি ও এম. এ. জামান প্রমূখ বিধায়করা।[৮৭] কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে ত্যাগ করে বামপন্থীরা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। সেই দিক থেকে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন বামপন্থীদের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

চল্লিশের দশকের থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে পার্টি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সঙ্গে কৃষক সমিতি, মিছিল মিটিং, প্রতিবাদ, আলোচনা সভা বিস্তৃত হয়েছে। এই সময় সভ্য সংখ্যা বেড়েছে। ফলে পার্টির কাজের পরিধি প্রসারিত হয়েছিল। যার কারণে সর্বক্ষণের কর্মী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কর্মীদের বেতন বাড়ানো হয়। সারাক্ষণের কর্মীদের বেতন ২৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা করানো হয়। বহুক্ষেত্রে তাদের বাড়িঘর ও পরিবার ছেড়ে আসতে হত। এ জন্য এদের জন্য পার্টি বড় বড় বাড়ি ভাঁড়া নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেন। কর্মীদের এই একসঙ্গে মেসবাড়িতে থাকার ব্যবস্থাকে রণেন সেন বলেছেন ‘পার্টি কমিউন’।[৮৮] এই পর্বে পার্টি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পস্তুতি নেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে পার্টি শহর ও গ্রাম উভয় পরিসরে নিজেদের অবস্থা করে নিতে পেরেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুসারে ১৯৪৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে প্রায় বঙ্গের সর্বত্র প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন--

> পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ আসনে হাওয়া থেকে বঙ্কিম মুখার্জি, হুগলী থেকে মহম্মদ ইস্মাইল, জলপাইগুড়ি থেকে রাধামোহন বিশ্বাস, যশোর জেলা থেকে কৃষ্ণ বিনোদ রায়, দিনাজপুর তফশীলি কেন্দ্র থেকে রূপনারায়ণ রায়, দার্জিলিং

থেকে রতন লাল ব্রাহ্মণ, চট্টগ্রাম থেকে কল্পনা দত্ত (যোশী), শ্রমিক আসনে কলকাতা থেকে সোমনাথ লাহিড়ী, ময়মনসিং এর হাজং এলাকা থেকে মণি সিং, আসানসোল থেকে ইন্দ্রজিত গুপ্ত, ব্যারাকপুর থেকে চতুর আলি এবং বিশেষ রেল কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বসুকে দাঁড় করান হয়...।[৮৯]

উক্ত নির্বাচনে রূপনারায়ণ রায়, রতন লাল ব্রাহ্মণ এবং জ্যোতি বসু একপ্রকার উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হন।[৯০] ফলত উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে বামেদের উত্থান শুরু হয়েছিল।[৯১] অন্যথায় বাম-রাজনীতির অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে উত্তরবঙ্গ চিহ্নিত হল। সেকারণেই উত্তরবঙ্গ থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়। উক্ত নির্বাচনে দিনাজপুরের কমিউনিস্ট নেতা রূপনারায়ণ রায় ভোট পেয়েছিলেন ৩৫,১২৭টি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী হরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রাপ্য ভোট ছিল ৩০,৮৩৯টি। অন্যদিকে ক্ষত্রিয় সমিতির থেকে গোবিন্দ চন্দ্র রায় এবং শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ প্রার্থী ছিলেন। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট ছিল যথাক্রমে ৭,৭৩৮ ও ৩৭৮টি।[৯২] ক্ষত্রিয় সমিতির পীঠস্থান রংপুরে থেকে সমিতির প্রার্থী ছিলেন নগেন্দ্র নারায়ণ রায় ২৩,২৩৭ ভোটে জয়ী হন। ক্ষত্রিয় সমিতির অপর প্রার্থী ছিলেন ক্ষেত্রনাথ সিং। তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৬,১২১টি (পরাজিত)। কমিউনিস্ট পার্টির থেকে রাজবংশী প্রার্থী ছিলেন হরিকান্ত সরকার ও নির্মালেন্দু বর্মণ। তাঁদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬,৯৩৪ ও ১০,৯৮০।[৯৩] কমিউনিস্ট পার্টি পরাজিত হলেও কৃষক সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছিল তা পরিসংখ্যানেই প্রমাণ করে। অনুরূপ চিত্র লক্ষ করা যায় জলপাইগুড়িতে। এখানে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন রাধামোহন বর্মণ। ভোট পেয়েছিলেন ৯,৩৯৬টি। অন্যদিকে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ পেয়েছিলেন ৫,৪৫২টি ভোট। এই সময় কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন প্রসন্ন দেব রায়কত। তিনি ১৩,৮২১টি ভোট পেয়ে জয়ী হলেও কয়েকদিন পর মারা যান।[৯৪] এই অবস্থায় উপেন্দ্রনাথ বর্মণ সমিতি থেকে

বেড়িয়ে গিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং রায়কতের পোষ্টটিতে জয়েন করেন। যাইহোক, রূপনারায়ণ রায় জাতিতে রাজবংশী ছিলেন। প্রথম নির্বাচনেই রাজবংশীদের থেকে বামপন্থী নেতার আবির্ভাব বুঝতে সাহায্য করে শ্রেণি রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্টতার জায়গাটিকে। রূপনারায়ণ রায় ছিলেন দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার বাসিন্দা। ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি একদিকে ছিলেন ক্ষুদ্র কৃষক ও নিরক্ষর। দরিদ্র কৃষক ঘরের সন্তান রূপনারায়ণ রায় হয়ে উঠলেন আপামর সাধারণ এবং বাম আন্দোলনের প্রতিক। কারণ শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন হিসাবেই কমিউনিস্টদের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকারণে এই প্রথম বঙ্গের বাম আন্দোলন অনেকটাই শ্রমজীবী মানুষের পার্টি হিসাবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। দেশভাগ হলে তিনি পাকিস্থানেই থেকে যান এবং ১৯৭৪ সালে নকশালদের হাতে খুন হন।

১০. উত্তরবঙ্গে বাম-রাজনীতির বিকাশ

বঙ্গের বাম রাজনীতির প্রারম্ভিক পর্ব বলতে তেভাগা আন্দোলনের কথা চলে আসে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে থাকলেও আমাদের গবেষণার প্রতিপাদ্যতা উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে বিশেষত অবিভক্ত রংপুর, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি ছিল আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। প্রশাসনিক দিক থেকেও অঞ্চলগুলি বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষত জলপাইগুড়ি নবীনতম জেলা। ১৮৬৯ সালে যার জন্ম হয়, কিছুটা রংপুর জেলার আর ভুটানের কাছ থেকে প্রাপ্ত অংশ নিয়ে সৃষ্ট হয়। রংপুর বা দিনাজপুর চিরস্থায়ী ব্যবস্থার আওতার মধ্যে থাকলেও জলপাইগুড়িতে জোতদারি ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে জলপাইগুড়ির জোতদার আর রংপুরে জোতদারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। জলপাইগুড়ির জোতদার ছিল

সরাসরি সরকারের অধিনে আর রংপুরের জোতদার ছিল জমিদারের একজন প্রজা মাত্র।[৯৫] উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলগুলিতে জাতিগতভাবে নিম্নবর্ণের লোকদের বাসস্থান। উক্ত স্থান এবং শ্রেণিসংগ্রামের ধারণা এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে। কেননা অঞ্চলটি কৃষক তথা সাধারণ মানুষজনদের দ্বারা পরিবৃত। এই রকমের মানুষজনদের মধ্যে শ্রেণির ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা বস্তুবাদী ইতিহাসে বিষয় হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে উত্তরবঙ্গ অনেকটাই আদর্শের পরিপূরক বলা যায়। এর সঙ্গে রংপুর ও দিনাজপুরের এক অন্যমাত্রা রয়েছে। রংপুর, উত্তরবঙ্গে যুব বিপ্লবী আন্দোলনের একটি অন্যতম কেন্দ্র।[৯৬] স্থানের নিরিখে উত্তরবঙ্গ উত্তর পূর্ব ভারত তথা চীন বা তিব্বতের সীমানায় অবস্থান করায় যোগাযোগের একটা বাড়তি সুবিধা ছিল।অন্যথায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের দেখে মণিকুন্তলা সেন এটি একটি আদর্শ জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ আদিকাল থেকে এমনকি পঞ্চাননের সময়কাল বা তার পরবর্তীতে বঙ্গের থেকে মৌখিক ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। বঙ্গের মানুষের কাছে একটি বিনোদনের জায়গা মাত্র উত্তরবঙ্গ। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের সঙ্গে বহিজগতের সম্পর্ক একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। না থাকার কারণ যেমন ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নতা তেমনি জাতি বৈশিষ্ট্যের একটি জায়গা হল নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিসরে সক্রিয় থাকা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির রাস্তাঘাটের বর্ণনা অনেকসময় বাম-কর্মীদের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয় তাদের সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সংগঠন করতে হয়েছিল।[৯৭] বর্তমান মাথাভাঙ্গা থেকে শিলিগুড়ি বাসে করে যাতায়াত করতে ২.৩০ ঘন্টার মত সময় লাগে। একটা সময় (১৯৯৭-৯৮ সালের বা তারও পরবর্তীতে) শিলিগুড়ি হয়ে ওঠেছিল রাজবংশীদের

কাছে ‘বিদেশ’। রাজবংশী ঘরের ছেলেপুলেরা কাজের সন্ধানে একটা সময় শিলিগুড়ি যেতে শুরু করেছিল। পরিবার, বাড়ির বাইরে ছেলেপুলেদের যেতে দিতে রাজি না থাকলেও অভাবে পড়ে যেতে বাধ্য থাকত। অর্থাৎ ঘরের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। অথচ শিলিগুড়ি রাজবংশী অধ্যষিত এলাকাগুলির মধ্যে একটি। এই সামান্য সময় অতিক্রম করে যাওয়ার মত মানসিকতা রাজবংশীরা রাখত না। সেই অর্থে বাইরের জগত সমন্ধে তাদের পরিচিতি ছিল না বললেই চলে। বাইরের মানুষদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার পরিসরও ছিল কম। এই বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে অনেকটা বাম-কর্মীদের হাত ধরে। অন্যদিকে থানা পুলিশ আদালত এইসব প্রশাসনিক সেক্টরগুলি বিস্তৃতি ঘটে। তার সুবাদে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাইরের লোকেদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংযোগ ঘটে। যদিও কোর্ট কাছারি বা পুলিশি বিষয়গুলি দেখভাল করতেন সমাজের ‘এক প্রকারের লোক’। রাজবংশী সমাজে ওরা *‘ঠক’* নামে পরিচিত ছিল। প্রচলিত অর্থে *‘ঠক’* কথাটি ঠকানোর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি আইনি বিষয় বা মামলা মোকদ্দমায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতেন। কাজটি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা নিতেন বলে *‘ঠক’* নামে পরিচিত হন। প্রত্যেক টারীতে না হলেও কয়েকটি টারীর মধ্যে একজন বা দুজন *‘ঠক’* থাকত। সমাজকে তাঁরা বিভিন্ন সময় যুক্তি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন বলে অনেকে মনে করেন।[৯৮] রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রশাসনিক কার্যকলাপের বিষয়গুলি সংযুক্ত হতে থাকলে কিছুটা বাইরের মানুষদের দেখার সুযোগ পেতেন। যদিও ঠক বা দেওয়ানি বিষয়টি সামলে নিত বলে সেইভাবে সাধারণের মেলামেশার পরিসর ছিল না। রাজবংশীরা তাদেরকে খুব একটা বিশ্বাস করতেন না এবং মিশতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না। কিন্তু তাদের অসম্মানও

করতেন না। অপরিচিতদের 'বাবু' বলেই সম্বোধন করেন। বিশেষ করে শহুরে মানুষজনদের প্রতি বাড়তি সম্মান দেখানোর একটা প্রবণতা রয়েছে। এই রকম পরিবেশে যখন বাম-কর্মীরা আসতে শুরু করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে থেকে (এমনকি বাড়িতে) তাঁদের সুখ দুঃখের অংশিদার হওয়ার মত মানসিকতা[৯৯] দেখাতে শুরু করেন তখন রাজবংশীদের সহানুভূতি কিছুটা অর্জন করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অনুপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ভদ্রবাবুদের প্রতি কোথাও যেন একটা মেনে নেওয়ার মানসিকতা কাজ করেছিল। অর্থাৎ লেখাপড়া জানা লোকজনদের প্রতি রাজবংশীদের একটা আস্থা রয়েছে। মনে হয় পঞ্চানন বর্মার অনুরূপ একটা প্রতিচ্ছবি ভদ্রবাবুদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন একটা বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের জায়গাটি ধরে রাজবংশীরা হয়ত কমরেডদের জমি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। কারণ একটা সময় পঞ্চানন বর্মা রংপুর থেকে বঙ্গীয় বিধান সভায় নির্বাচিত হয়ে কৃষকের ঋণ মুকুবের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন।[১০০] আবার জাতি চেতনার জায়গাটি বঙ্গের নিরিখে উত্তরবঙ্গে প্রসার লাভ না করায় তাদের আথিতিয়তার বন্ধন যা বামপন্থীদের সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। রাজবংশী আথিতিয়তার বন্ধন এবং নেতাদের কৃষক দরদি মনভাব বিশেষত পরস্পরের প্রতি কমরেড সুলভ আচরণ[১০১] এই দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসাযুজ্যতা শ্রেণিসংগ্রামের ভিত্তি নির্মাণ করে। অন্যদিকে কৃষকদের কমরেড সূচক সম্বোধন ভদ্রবাবুদের সমগোত্রী ভাবাপন্ন আথিতিয়তা বাম রাজনীতির জায়গাটাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। রাজবংশী এবং ভদ্রবাবুদের এই সংযোগসাধন প্রক্রিয়া তেভাগার পর্ব থেকে শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। বামপন্থীদের সাংগঠনিক আদবকায়দা বিশেষত প্রত্যেকের খবর নেওয়া বা বিপদে

পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা[১০২] রাজবংশী আদিসত্তার অনুরূপ বলা যায়। অর্থাৎ রাজবংশীদের প্রাত্যহিক জীবনের আচরণের সঙ্গে কমরেডদের চলন ঘরনে একটা মিলগত জায়গা লক্ষ করা যায়। এর মধ্য দিয়ে কমরেডদের অভিভাবকত্বের ভূমিকা প্রকাশ পেলে তাঁদের সঙ্গে মিলে যেতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। শ্রেণিসংগ্রামের ধারণার থেকেও নতুনত্ব কিছু ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টিশীল রাজবংশীরা আকর্ষণ বোধ করলেও করতে পারে। এই নতুন বিষয় আগমন রাজবংশীদের স্থানীয় শাসনে শাসক করে তোলার অভিপ্রায় অনেকটা রজ মালিকের বয়ানের অনুরূপ বলা চলে।

১১. কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা (১৯৪৬র ডিসেম্বর)

১৯৪০র সময়কাল নানা কারণে ভারত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। একের পর এক ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া এমনভাবে সামনে চলে আসছিল এবং সেই পরিস্থিতিতে কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার ছিল সে বিষয়ে বামপন্থীরা অনেকটাই সদার্থক ভূমিকা নিতে পারেনি। যার কারণে অনেকসময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলে অনেক বাম-কর্মীরা মনে করেন। বামপন্থীরা আলোচ্য সময়কালের নাম রেখেছেন 'জনযুদ্ধ'। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তাই বেড়িয়েছেন কখন ভারতছাড় আন্দোলনে (১৯৪২), কখন নৌ-বিদ্রোহে (১৯৪৬), রসিদ আলি দিবসে (১৯৪৫), কখনবা ডিরেক্ট একশনে (১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬)। ১৯৪৩র মহাদুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রভাব রাজনৈতিক জীবনে কোন পথে এগিয়েছিল তা বামপন্থীরা বুঝতেই পারেনি। যা সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সব কয়টি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে করা হয়। যেমন বলা হয়েছে 'তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের ছিল অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি'।[১০৩]

কেন্দ্রিয় কমিটির দোদুল্যতা এবং বুর্জোয়া নেতৃত্ব সম্বন্ধে মোহ কাটিয়ে সংগ্রামের পথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং পলিটব্যুরোর আভ্যন্তরিণ মনমালিন্য এ সময় প্রকাশ পেয়েছে। তার উপর ছিল পার্টির ভ্রান্ত নীতি। যেমন- জনযুদ্ধ নীতি এবং 'পাকিস্থান ও ন্যাশনাল ইউনিয়ন' প্রস্তাবকে সমর্থন করায় পার্টি দেশপ্রেমিক জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।[১০৪] এই রকম পরিস্থিতিতে ভাগচাষিরা তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সময় পার্টির সম্পাদক ছিলেন পি সি যোশী। তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে বাম নেতাদের লেখনীতে কিছু সমালোচনার সুর শুনতে পাওয়া গেলেও সরাসরি বিরোধীতা করার সাহস কেউ দেখান নি। ফলত এই একপেশে চিন্তাকে ধরেই পার্টি পরিচালিত হয়েছে। অন্যথায় পার্টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

১২. রাজবংশীদের তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণের স্বরূপ

বঙ্গের তেভাগা আন্দোলন একপ্রকার উত্তরবঙ্গের থেকেই সৃষ্ট। সেখান থেকেই আন্দোলনের প্রভাব অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আধিয়ার ব্যবস্থা হল এখানকার ভূমি, প্রজা ও জোতদারদের যৌথ ভাবনার স্তম্ভ বিশেষ। জোতদারের জমিতে যে সকল চাষি চাষ করেন এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ভোগ করার অধিকারী সাধারণভাবে তাদের আধিয়ার বিবেচিত করা হয়েছে। তাদের প্রচলিত নিয়ম কীভাবে আধি ব্যবস্থায় (System) পরিণত হয়েছে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও আধি ব্যবস্থার রাজবংশী সমাজকে পুষ্ট করেছে। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অর্ধেক ভাগ আধিয়ার ব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য। তবে চাষ করার উপকরণ স্থানভেদে একই রকম না হলেও জোতদার ও চাষির যৌথ উদ্যোগে তা নির্ধারিত হয়েছে। এই চাষিরা 'প্রজা' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রজাদের সঙ্গে জোতদার বা দেওয়ানির সম্পর্ক ছিল আত্মীক তা

সন্দর্ভের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কবে থেকে উভয়ের সম্পর্ক শোষণ ও তিক্ততায় ভরে ওঠে তা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও বলা যেতে পারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকেই উত্তরবঙ্গের ব্রিটিশ শাসিত এলাকাগুলোতে অনুপস্থিত জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত অঞ্চলগুলোতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। জমিও স্থানীয়দের হাত থেকে হস্তান্তরিত হয় ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হাতে। এই সকল জোতদার বা জমিদারদের চরিত্র স্থানীয় জীবনের সঙ্গে মেলবন্ধন তো হয়নি বরং বৈরিতাকে প্রকাশ করেছে। এই বহিরাগতদের অবস্থানকে ধরে স্থানীয় সমাজের অবস্থান বোঝার প্রয়াস লক্ষ করা যায় বামপন্থী মানসিকতায়। ফলত স্থানের স্বতন্ত্রতা আলোচনায় আসেনি। অন্যদিকে সার্বিকভাবে ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত ইতিহাস সমাজকে ক্যাটাগরিক্যালি ভাবাতে সাহায্য করে। তার প্রেক্ষিত ধরে শোষণ ও বঞ্চনার বিষয়টি শ্রেণির ইতিহাসে উঠে এসেছে। যাইহোক, কবে এই প্রথা শুরু হয়েছিল তা আমাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও ব্রিটিশ আমলের শেষ পর্বেও তা প্রচলিত নিয়মে চলছিল।

বঙ্গের মার্কসবাদী লেখকরা মনে করেন তেভাগার ইতিহাস কৃষকদের দাবি আদায়ের ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনার থেকে মুক্তির ইতিহাস।[১০৫] কৃষকদের দাবি আদায়ের বিষয়টিকে বঙ্গের বাম-কর্মীরাও দেখেছেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর শোষণ থেকে মুক্তি পথ হিসাবে। সামন্ততান্ত্রিক পর্বের বিনাশসাধন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে এই শোষণের দাবি শেষ হয়ে সমতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। সেই উচ্ছ্বাস বাম-কর্মীদের শহর থেকে গ্রামের দিকে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু মার্কসীয় লাইন একের পর এক পরিবর্তনের হলে তাদের পুরানো স্বপ্ন ভেঙ্গে পড়ে এবং দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

ফলত পূর্বাতন সমাজে আমুল পরিবর্তন এবং সেই শূন্যস্থানে উন্নয়নের নিরিখ নিয়ে বাম শাসনকে স্থায়িত্ব দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছিল বলে রজ মালিক মনে করেন। এতে বিপ্লবাত্বক ভাবনা জায়গাটি অনেকটাই অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই অস্পষ্টতাই একসময় বাম-কর্মীদের হতাশাকে স্পষ্ট করে।[১০৬] আর যেটুক অবশিষ্ট থাকল সমাজ পরিবর্তনে, তার ব্যাখ্যা করেছেন সমাজে দারিদ্রতা এবং শোষণের প্রশ্নকে সামনে রেখে। তেভাগার ডাইরিতে সোমনাথ হোড় (রংপুরের অভিজ্ঞতা) লিখেছেন--

> 'নেংটি পরা লোক- ছেলে বুড়ো, জোয়ান, কোথাও তামাকের ক্ষেতে কাজ করচে, কোথাও বুক থেকে হাঁটু জড়ানো মেয়েরা গরু নিয়ে মাঠে বেরিয়েচে। দৈহিক গঠন ভাল নয়- না মেয়েদের না পুরুষদের। দেখলেই বোঝা যায়- খাটতে হয় বেশি, খেতে পায় কম।...'[১০৭]

তিনি জোরদার আধিয়ারদের ঠকায় তার জায়গাকে ধরে লিখছেন--

> 'জোতদার যখন কৃষককে ধান কর্জা দেয়, তখন একটি ছোট 'দোন' (ধান মাপার সাজি) দিয়ে ধান মেপে দেয়। কিন্তু কৃষক যখন ধান ফিরিয়ে দিতে আসে তখন একটি বড় 'দোন' বের করে। কৃষক আগের দোনের কথা জিগ্যেস করলে বলে, "কি জানি, ছেলেপিলেরা কোথায় ফেলে দিয়েচে'।[১০৮]

এই শোষণ ও দারিদ্রতাকে সামনে রেখে শ্রেণির ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

জ্যোতি বসু ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ বঙ্গীয় আইনসভার প্রদত্ত ভাষণে উল্লেখ করেছেন --

> 'আমি নিজের স্বচক্ষে খুলনা জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহে এবং দিনাজপুরের পাঠানো রিপোর্ট দেখেছি যে কৃষকরা কোথাও মারমুখি হয়ে উঠেনি। একটি থানা বা একটি জোতদারের বাড়িও পোড়েনি, জমিদার বা জোতদারের একজনও খুন

হয়নি; তথাপি যখন বর্গাদারেরা তাঁদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য ভাগ দাবি করেন মাত্র, তখনি আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে শোনা যায়'।[১০৯]

অন্যদিকে পুলিশের সীমাহীন সন্ত্রাসের ফলে ৭০ জন কৃষক পুলিশের গুলিতে মারা যান এবং তার মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও ছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন।[১১০] তিনি আরও মনে করেন--

'কৃষকদের মধ্যে ৪১ শতাংশ বর্গাদার। তাঁরা যে ধান উৎপাদন করে তাদের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ তাদের প্রাপ্য। এ সম্পর্কে সরকার একেবারেই সচেতন। এই দাবি ১৯৪০ সালে ভূমিরাজস্ব কমিশন দ্বারা গৃহীত হয়েছিল।...কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন তা শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে এবং আমার ধারণা চিরতরে'।[১১১]

এ বিষয়ে সরকার কেন বিমুখ তার কারণ হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ১৯৪৭ সালের ২৪ এপ্রিল বঙ্গীয় আইনসভার ভাষণে--

'...আমরা দেখতে চাই, জোরদারদের নির্মূল করা হলো। কিন্তু এই বিলে তারা এখনও বেশ আছে। কেননা আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম লীগের অনেক সদস্যই জোরদার অথবা তাদের দালাল। না, এদের মধ্যে জমিদার দেশি নেই, কিন্তু জোরদার আছে'।[১১২]

তিনি মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন (পরে কোন এক সময়) 'বিলটি ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল কেন? উত্তরে সুরাবর্দি সাহেব আমাকে বলেছিলেন, আমি জানতাম না যে, আমার দলে এত জোতদার রয়েছে'।[১১৩] তেভাগা সর্ম্পকিত উক্ত বয়ান কৃষকদের দাবি পূরণের সঙ্গে বঙ্গের কমিউনিস্টদের রাজনীতি গ্রাম থেকে বিধানসভা পর্যন্ত ব্যপ্ত হয়। কৃষকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের এই সংযোগ গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। বিশেষত কৃষক সমিতি বৈঠক, ছোট মিটিং, হাটে জমায়েত, পাবলিক পরিসরে মিটিং করার পূর্বে ঘোষণা বা প্রচার করে

সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে চেষ্টা করতেন। বৈঠক বা মিটিংগুলির আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল পৌরাণিক কথন যেমন রামায়ণ মহাভারতের একলব্যের প্রতি দ্রোনাচার্যের অবিচার এবং পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত। এই সমাজব্যবস্থার জাতপাতই হল প্রধান প্রতিবন্ধকতা যা সমূলে উৎপাটন করে সবার মধ্যে সমতা আনার বিধানের মধ্য দিয়ে বাম-রাজনীতির জায়গাটা প্রসারিত করার চেষ্টা করতেন।[১১৪] তারা শহরতলীর মধ্যবিত্ত শ্রেণি সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতেন। যেখানে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ের সুবিধা পাওয়া যেত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানুষের কর্মস্থল ছিল গ্রামে। এদের মধ্যে কেউ গ্রামীন ডাক্তার, কেউ জোতদার, সাইকেল ম্যকানিক বা গ্রামীন পুরোহিত নেতাদের গ্রামে প্রবেশের রাস্তা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করতেন। এদের মধ্যে অনেকে রাজনীতিগতভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। ফলত কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বাম-রাজনীতির প্রসারণ ঘটছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি জেলা কৃষক সমিতি সম্মেলনের নাম রাখা হয়েছিল 'কৃষক সভা ও কংগ্রেস'।[১১৫] রংপুর কৃষক নেতা সুধীর মুখ্যার্জী মনে করেন--

> 'এতে পার্টি তার নিজস্ব ভিত্তি সম্পর্কে চেতনায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উপরতলার কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। সে ঐক্য ছিল কিছুটা বাহ্যিক ও সীমাবদ্ধ। ফলে কৃষক সমিতি তার স্বতন্ত্র ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছিল...'।[১১৬]

সার্বিকভাবে বাম চেতনা তৈরি করার প্রারম্ভিক পর্বে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে কমিউনিস্ট নেতারা কার্যক্রম শুরু করেছিল। জলপাইগুড়ির মত দিনাজপুরেও অনুরূপ চিত্র লক্ষ করা যায়। আসলে কংগ্রেস-কর্মী ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশের কোন রাস্তা ছিল না। যেমন নেতারা ছিল গ্রামবাসীদের কাছে অপরিচিত তেমনি তাদের নীতিও ছিল অবোধ্য। কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও নেতারা কংগ্রেস নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না।

তবে কংগ্রেসের হাত ধরেই সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিল সঙ্গে কৃষক সমিতি।[১১৭] এর পরবর্তীতে বিশেষত 'পঞ্চাশের মঙ্গা'য় লঙ্গরখানা পরিচালনার থেকে শুরু করে মানুষের পাশে বাম-কর্মীরা দাঁড়াতে থাকলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্যরাও সেচ্ছাসেবী হিসাবে সমাজ সেবা করতে শুরু করেন। এতেই রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন শক্তি পেতে শুরু করেছিল বলে সুধীর মুখার্জী মনে করেন। বসন্ত বাবু, জীবন দে প্রমুখরা এই সময় স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক দল গঠন করেন। এর মাধ্যমে মজুরদার বিরোধী অভিযান এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সাহায্যে সংগ্রহ অভিযান একসাথে পরিচালিত হয়। এই সময় অভাবে চিত্র জনমানসে ফুটিয়ে তোলার জন্য রাজবংশী ভাষায় গান বাঁধেন। যা গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

"জলপাই মুই নারী
রংপুরে মোর বাড়ি,
স্বামী বেচাইলে ধনীর ঘরে
ওরে, ক্ষুদায় পাগল প্রাণ পতিরে,
মইলো ধন মোর
খাও খাও করিয়া..."[১১৮]

অনুশীলন এবং অধ্যায়ন ছিল সমিতি ও কৃষকদের পারস্পারিক সমন্ধ প্রতিষ্ঠার আর একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। অনুশীলনের বিষয় ছিল মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, 'India today', সোভিয়েত পার্টির ইতিহাস।[১১৯] এই নতুন অধ্যায়ন ও তার পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে পার্টি-কর্মীরা স্থায়ীভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে অবস্থান করতে শুরু করেছিল। এই সহবস্থান এবং অনুশীলন কৃষকদের নতুন করে বর্ণ পরিচয়ের ধারা উন্মোচন করে বলে সুধীর বাবু মনে করেন।[১২০] এই নতুন অভ্যাস আয়ত্ব করা অর্থাৎ কমরেড হয়ে ওঠার ভাব ও আচার

স্থানীয় সমাজে যুক্ত হতে থাকে। সমিতি গড়ার প্রথম পর্বে নেতারা গ্রামের মাথাকে যাকে 'দেওয়ানি' বলা হয়েছে তাকে সমিতিতে আনার ব্যবস্থা করতেন। বঙ্গের বাম নেতারা বুঝেছিল দেওয়ানিকে বাদ দিয়ে গ্রামে কৃষক সভা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি ধনী কৃষক বা জোতদার ছিলেন। সেই নিরিখে বামপন্থীরা জোতদারদেরকেই নেতৃত্বে রাখতেন। জোতদারদের কেন সমিতিতে স্থান দিতেন তার যুক্তিটি হল জমিদারদের সঙ্গে জোতদারদের নানা বিষয়ে বিরোধ থাকত। সেকারণে জোতদার সমিতিতে আসতেন।[১২১] এই বৈরিতার কারণ হতে পারে উভয়েই ছিল ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। জাতিগত অবস্থান উভয়কে দূরত্বের দিকে নিয়ে গেছে। স্থানীয়দের মধ্যে জোতদারের সংখ্যা ছিল বেশি। সেই সূত্রে নিঃসন্দেহে রাজবংশীদের বাম বলয়ে অন্তর্ভূক্ত ছিল চোখে পড়ার মত। প্রথম দিককার বাম নেতাদের বয়ানে তা বার বার বলা হয়েছে। তবে উচ্চবর্ণের জমিদাররা কেন বাম-রাজনীতিতে এল না (?) তার কারণ বাম নেতারা করেছেন জমিদারদের আর্থিক সমৃদ্ধি দিয়ে। যাইহোক, রাজবংশী গ্রাম্য জীবনে দেওয়ানির প্রাধান্যের কথা অনুপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামের সমস্ত প্রজাদের তিনি আত্মীয় এবং অভিভাবক। সকলের সুখ সুবিধের ভাগিদার। ফলত প্রজারাও সমস্ত দায়িত্ব গিরিকে প্রদান করে ঝামেলা মুক্ত জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রজারা কাজটুক শুধু করত এবং উদাসীন ভাবে জীবন কাটিয়ে দিত। বাড়ির খুঁটিনাটি বিষয়গুলি মহিলারাই দেখতেন। বিশেষ করে রান্নার জন্য কাঠ জোগাড় করা[১২২] থেকে বাড়ির ছেলেপুলেদের বড় করা দায়িত্ব[১২৩] মায়েরাই সামলে নিতেন। এজন্যই 'বউ' বা স্ত্রীদের *'মাইয়া'* বলে অভিবাদন করতেন। মাইয়া অর্থাৎ মায়ের মত যার হিয়া তিনি মাইয়া। গ্রাহস্থ্য জীবনে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অনেক বেশি দায়িত্ববান বলে অনেকে মনে করেন।[১২৪] পুরুষরা সকাল বেলার দিকটা কাজ

করলেও বিকেলের সময়টা গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিত।[১২৫] অর্থাৎ পারিবারিক জীবনেও মৈশালের অনুরূপ জীবন শৈলী লক্ষণীয়। এই রকম পরিবেশ ভাওয়াইয়া সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বামপন্থীরা প্রজা ও গিরির এই পারস্পরিক সম্পর্কের জায়গাটাকে বিবেচনা করে দেওয়ানিকে সমিতিকে আনতে চেষ্টা করতেন। কারণ তারা জানতেন দেওয়ানিকে টানতে না পারলে অন্য কৃষকদের পাওয়া সম্ভব নয়।[১২৬] জ্যোতি বসু বিধানসভায় জমিদার জোরদারদের উচ্ছেদে কথা বললেও বাস্তবে গ্রামে সংগঠন করতে গিয়ে বাম-কর্মীরা দেখেছিলেন গ্রাম্য জীবনের এক ভিন্ন চরিত্র। সংগঠন প্রসারতার লক্ষে অর্থাৎ কৃষকদের সংগঠিত করতে বাম-কর্মীদের দেওয়ানিদের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার ঘটনা শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নকে স্ববিরোধীতায় জড়িয়ে ফেলেন।

১৯২৯ এর বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক মন্দা, জমি হস্তান্তর এবং পরবর্তীতে ভীষণ কৃষক শোষণ, অত্যাচার, সরকারের আপোস নীতি- এই বিষয়গুলো উপরিউক্ত আলোচনাতে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। এই পারিসরিক অবস্থার স্থিতশীলতার পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে 'পঞ্চাশের মঙ্গা' (১৯৪৩) বঙ্গকে এইসময় আতঙ্কের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছে। এই সময় ঘটেছিল ১৯৪৬-৪৭র তেভাগার লড়াই। সুস্নাত দাশ তার *'অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম'* গ্রন্থে একে অর্থনৈতিক আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন--

> বাস্তব পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সভা না চাইলেও ভাগচাষীরা বাধ্য থাকত অপর কোন সংগঠনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে। সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করে একে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত না। সেদিক থেকে একটা স্বতঃস্ফুর্ততা তেভাগা আন্দোলনে বরাবরেই ছিল।[১২৭]

একেই সঙ্গে তিনি গোষ্ঠীগত আনুগত্য বা সাম্প্রদায়িক চেতনার জায়গাটিকে অস্বীকার করেছেন। যুক্তি দিয়েছেন--

> দিনাজপুরের রাজবংশী কৃষকরা 'ক্ষত্রিয় সভার' নির্দেশ শিরোধার্য করে রাজবংশী জোতদারদের বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুলও তুলত না। স্মরণে রাখা উচিত, রাজবংশীদের অভিভাবক স্থানীয় ক্ষত্রিয় সভার (যারা জোতদারদের ক্রীড়নক ছিল) চোখ রাঙ্গানিকে অগ্রাহ্য করেই ১৯৪৬র নির্বাচনে প্রধানত রাজবংশী কৃষকরাই কমিউনিস্ট প্রার্থী রূপনারায়ণ রায়কে জয়ী করেছিলেন।[১২৮]

এই পর্বে জমি হারানো, অভাব, দুর্ভিক্ষ সব মিলিয়ে আধিয়ার বা ভাগভাষির সংখ্যা বেড়েছিল[১২৯] এবং নিজ জমিতে কৃষক আধিয়ারে পরিণত হয়েছিল। এই অবস্থায় ভাগচাষি কৃষকরা কৃষক সভাতে যোগদান করেছিলেন। ভাগচাষিদের যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ডি.এন. ধনাগারে তাঁর *'Peasent Movement in India'* গ্রন্থে দেখেছে চাষিরা শ্রেণির ধারণায় নয় বরং গোষ্ঠীগত বা জাতিগত ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন--

> Differences in the ethnic, caste or religious composition of the agriculture population were also reflected in kishan Sabha membership. In Dinajpur district, for example, the majority of members came from Rajbnashi or other Tribe groups and scheduled caste that formed a considerable proportion of the adhiars (share-croppers).[১৩০]

কৃষকদের সঙ্গে থেকে গ্রাম সমাজকে বোঝার (understanding) জন্য উচ্চবর্ণের[১৩১] বাম নেতাদের একটা সংগ্রাম করতে হয়েছিল যা কৃষকদের কাছাকাছি আসার পন্থা বলা যায়।[১৩২] এতে যদি কৃষক নেতারা ভাবেন গ্রাম বুঝেছি বা কৃষকদের বুঝেছি তা অনেকটা অতিরঞ্জিত ভাবনার প্রকাশ বলা যায়। কেননা একটা নির্দিষ্ট ভাবনা (শ্রেণির

ধারণা) মাথায় নিয়ে কৃষক বা গ্রামের 'সমস্যা'কে গুরুত্ব দিয়েছেন, কৃষকের অবস্থানকে নয়। এটা আদতে কৃষকের সমস্যা না নেতার সমস্যা আমরা বুঝব কি করে? অন্যথায় রাজবংশীদের একটি অংশ ভাটিয়া কমরেডদের বিশ্বাস করতে চাইতেন না। রণজিৎ দাসগুপ্ত তার অনবদ্য গবেষণা পত্রে লিখেছেন --

> 'The Rajbansi Hindu jotedars, many of whom were supporters of the Khatriya Samity, called upon the Rajbnasi Hindu peaseants and adhiars not to believe upper caste bhatiya leaders.'[১৩৩]

জমিদারি, জোতদারির একটা বড় অংশ বর্ণহিন্দুদের দখলে[১৩৪] চলে যাওয়ায় নেতাদের জমিদারি উচ্ছেদের দাবি কিংবা উৎপন্ন ফসলের আধি নয়, তিন ভাগের দুইভাগ কৃষকের অধিকার, ভাগচাষিদের সঙ্গবদ্ধ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল বলা যায়। কেননা শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা যে এ পর্বে কিছুটা ভিন্নতর[১৩৫] হয়েছিল তার থেকে পরিত্রান পাওয়ার আশা রাজবংশীদেরকে বাম-রাজনীতিতে আশ্রয় নিতে সাহায্য করে। যেমন বলা যায়, ১৯৩৮ সালে রংপুরে জেলার কৃষক সমিতি গঠিত হয়। তাদের আলোচনায় যে দাবিগুলি উঠে এসেছিল তা হল--

> বকেয়া খাজনা, আবওয়াব থেকে কর্জা ধানের সুদ কমিয়ে ২৫% করা, তামাকের উপর শুল্ক বিলোপ বা মহাজনদের সুদের হার কমানো, জমিদারি প্রথার বিলোপ, লাঙ্গল যার জমি তার ইত্যাদি বিষয়গুলি।[১৩৬]

কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের প্রচলিত সমস্যাগুলি বিশেষভাবে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ কৃষকের অভাব দূর করা ও অধিকার প্রদানের দাবিগুলি আকস্মিকভাবে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করলেও কতটা তারা শ্রেণির ধারণা বুঝে উঠতে পেরেছিল বলা কঠিন। একটা সময় পঞ্চানন বর্মা বিধান সভায় তামাক চাষের উপর শুল্ক বিলোপের থেকে কৃষক ঋণ মুকুবের আবেদন জানিয়েছিল।[১৩৭] এমনকি

কোচবিহার রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলনের প্রথম সংগঠক হিসাবে পঞ্চানন বর্মার নাম উঠে এসেছে। এই সংগঠনের জেরে নাকি বর্মাকে কোচবিহার রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।[১৩৮] তবে কৃষকদের হয়ে কথা বলার অর্থ অনেকসময় শ্রেণিসংগ্রাম নাও হতে পারে। অনেক গবেষণাতে দেখানো হয়েছে কৃষকদের অবস্থান না বুঝে তেভাগার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১৩৯] রাজবংশী যৌথ জীবনের যে চিত্র লক্ষ করা যায় তার সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। তবে কি তেভাগার সংগ্রামে কমিউনিস্টরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই প্রশ্নে ধনাগারে মনে করেন শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রবাবুরা আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকলেও গ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জোতদার এবং কৃষকরা (যাদের চার থেকে ছয় একক জমি ছিল)। কারণ তারা ধনী জোতদারদের কৃষকদের ঘৃণা করত। তেভাগার প্রধান শক্তি ছিল ভাগচাষিরা। তারা ভাগচাষিদের সাথ দিয়েছিলেন।[১৪০] রাজবংশী জোতদার যদি আন্দোলনের একটি অংশ হয় তাহলে ভাগচাষি নেতৃত্বের প্রশ্নটি জোতদারের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সম্ভবনা বেশী। রাজবংশী আধিয়ার বা প্রজা অনেকটাই জোতদারের উপর নির্ভরশীল ছিল।[১৪১] শুধু আর্থিক বিষয়ে নয়, অনান্য বিষয়েও বিশেষত কৃষিকাজ বর্হিভুত কাজগুলিতে দেওয়ানির প্রভাব ছিল অবিসংবাদী। যেমন কেউ বাইরের থেকে বাড়িতে এসে কোন বিষয় যদি আধিয়ারকে জিজ্ঞেস করতেন তখন আধিয়ার সরাসরি বলতেন বাবু *'মুইতো ওউল্যা জিনিস জানং না, দেয়ানির সাথে কতা কও'।* যদিও সে জেনে থাকে তবুও দেওয়ানিকে দিয়ে কাজটি করাতেন। আধিয়ারের এই স্বভাবগত চরিত্র তাকে নির্লিপ্ত জীবন চর্চার দিকে নিয়ে গেছে। কৃষক সমিতিতে অংশগ্রহণ বা তেভাগার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার বিষয়টি জোতদারের চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল বলা যায়। এতে কৃষকরা শ্রেণি চেতনায়

শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাননি। কারণ বাম-কর্মীরা যদি জোতদারদের প্রতি জোর দিয়ে থাকেন তাহলে কৃষকদের সঙ্গে প্রজাদের দেখা না করলেও চলে, জোতদার বলে দিলেই কৃষকরা তাদের মিছিল বা মিটিং এ অংশ নিবে। প্রজারা গিরির কথা খুব একটা অমান্য করতে পারতেন না। তবে তাঁর সব প্রজাই যে অংশ নিত এমনটাও বলা যাবে না। কেননা, গিরির চিন্তার সঙ্গে অনেকসময় প্রজা চিন্তা সমভাবে উচ্চারিত হয়নি।[১৪২] অনুপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে বহিরাগত লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে রাজবংশীরা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করত না। কোথায় যেন একটা হ্যজিটেশন থাকত। যেমন প্রজা অনেক সময় জিজ্ঞেস করত *'দেওয়ানি ওদের কি বলব গিয়ে? দেওয়ানি উত্তর দিত ওরা কি সব যেন বলবে তোদের, যা শুনে আয়'।* প্রজা উত্তর দিত- 'না যাও মুই। মোক সরম নাগে'। প্রজার ইচ্ছে না থাকলে জোতদার প্রজাদের জোর করে সমিতিতে যে পাঠাতেন এমনটাও নয়। যদিও রংপুরের কৃষক নেতা সুধীর মুখ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে জোতদারদের সমিতিতে টানতে পারলে আধিয়ার এমনিতে চলে আসত। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি কৃষক সভা প্রসারিত হয় তাহলে কৃষকদের সঙ্গে বাম-কমরেডদের পরস্পরের কাছাকাছি আসার প্রসঙ্গটি অন্যরকম হয়ে যায়। যদিও রণজিৎ দাসগুপ্ত মনে করেন ভাগচাষিরা স্বতঃর্ফুত ভাবে আন্দোলনে নেমেছিলেন। কৃষক নেতারা একের পর এক এরেস্ট হলে ভাগচাষিরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরে এবং পুলিশের সাথে দ্বন্ধে জড়িয়ে যায়। অনুরূপভাবে, তিনি এই সংগ্রামকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ বলে মনে করেন।[১৪৩] আবার উক্ত সংগ্রামে কৃষক হত্যার কথা শোনা গেলেও ভদ্রবাবুরা কেউ মারা গেছেন বলে জানা যায়নি। দলে দলে কৃষকরা একসঙ্গে ধান কেটে কৃষকের বা জোতদারে খোলানে ধান তুলছেন, তার প্রতিচ্ছবি দেখে মনে হতে পারে কৃষকরা সঙ্গবদ্ধ

হয়েছেন, এমনটা সহজে ভাবা যায় না। কারণ রাজবংশীদের গোটা গ্রাম মিলে একসঙ্গে কাজ করার রীতি বেশ পুরানো। 'হাউলি দেওয়া' বা 'ঢোকা দেওয়া'র রীতি সমাজ পরম্পরার নির্দশন। এই নির্দশনের প্রতিচ্ছবি যদি তেভাগা পর্বে কৃষকরা প্রতিরোধ হিসাবে গড়ে তোলেন তাহলে তা বোঝা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে এটা শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিরোধ না অন্যকিছু। কারণ পুলিশের আক্রমনের সামনে কমরেডদের দেখতে না পেলে তাদের যৌথভাবে কাজ করার মধ্যে যে আনন্দ (হাউলি দেওয়া) সেই বিষয়টি এখানে বোধহয় আত্মশ্লাঘার রূপ নিয়েছিল ? কৃষক নেতারা কি কৃষকদের বিশ্বাসে আঘাত করেছিল ? আবার জোতদার বা জমিদারদের উপর আক্রমনের নজীর না থাকায় রাজবংশী কৃষকরা আদতে কি করতে চেয়েছিল সেটা বোঝা কঠিন হলেও একেবারেই বোঝা অসম্ভব নয়। রাজবংশী সমাজের একটি প্রবাদ আছে *'যায় কয় আয় রে তারে পাছোত যাং রে'* অর্থাৎ যে ডাকবে তাকে সঙ্গ দেওয়া। না বুঝেই অপরের সঙ্গী হওয়ার ঘটনাটি রাজবংশী সমাজে প্রতিবাদ হিসাবে উচ্চারিত হয়েছে। এর পরেই বলা হত *'বুজি সুজি করি কাজ তাতে নাই লাজ'* অর্থাৎ বুঝে কোন কাজ করা উচিত। তাহলে কি রাজবংশীরা অবচেতন ভাবেই জোতদারের নির্দেশে বাম নেতাদের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং বোধগম্য হওয়ার পরে সরে পড়েছেন? এই জন্যিই কি তেভাগার সংগ্রাম এক বছরের মধ্যে স্থিমিত হয়ে পড়ে ? বিষয়টি বোঝা যাবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সুদীপ্ত কবিরাজ: *মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান*, (কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২২)।

২. Anuradha Ray: *Cultural Communism in Bengal 1936-1952*, (Delhi, Primus Books, 2014).

৩. এ. আর. দেশাই: *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, সপ্তম মুদ্রণ, (কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৫), [ভাষান্তর- মনস্বিতা স্যান্যাল], পৃ. ১৭৩।

৪. D.N. Dhanagare: *Peasant Movement in India: 1920-1950*, (New York, Oxford University Press, 1983), p.130.

৫. ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান উজ্‌বেকিস্তান রিপাবলিকের রাজধানী তাশখন্দ শহরে স্থাপিত হয়েছিল। যাকে মুজফফ্‌র আহমেদ বলেছেন 'ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি'। মুজফফ্‌র আহমেদ: *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দ্বাদশ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫), পৃ.৬৪।

৬. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৫৯।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯-৩৬২, ভানুদেব দত্ত: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপটঃ ভারত,* (কলকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ২০১৫), পৃ. ৩১।

৮. ভানুদেব দত্ত: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপটঃ ভারত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৯. D.N. Dhanagare: *Peasant Movement in India: 1920-1950,* Op.Cit., p. 133.

১০. Ibid, p. 138; ভানুদেব দত্ত: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপটঃ ভারত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১১.সুস্নাত দাশ: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত- পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

১২. সুনিল সেন: *ভারতের কৃষক আন্দোলন ১৮৮৫- ১৯৭৫,* (কলিকাতা, চ্যাটার্জি পাবলিশার, ১৯৯০), পৃ. ৬৩।

১৩. সরোজ মুখোপাধ্যায়: *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* চতুর্থ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১), পৃ. ১৯১।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

১৫. মিনতি সেন, শুভাশীষ গুপ্ত: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* প্রথম খন্ডঃ দেশভাগ পর্যন্ত, (কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৬), পৃ. ১৬৮।

১৬. অবনী বাগচী: *'তেভাগা সংগ্রামের অমর কাহিনী*, ধনঞ্জয় রায় (সম্পা): তেভাগা আন্দোলন, ষষ্ঠ মূদ্রণ, (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭), পৃ. ১১১।

১৭. তাপস কুমার রায়চৌধুরী: *'ডুয়ার্সে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন*, অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃ. ১৬১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৯।

২১. Adrinne Cooper: *Sharecropping and Sharecroppers' struggles in Bengal, 1930-1950,* (Calcutta, K P Bagchi & Company, 1988), p. 125.

২২. জোতদা্রর্স এসোসিয়েসন, সাধারন সভার নির্দ্ধারণ, জলপাইগুড়ি, ১৯/০৪/১৯২৩ ইং।

২৩. সুস্নাত দাশ: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত- পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

২৪. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃ. ২২।

২৫. আনন্দগোপাল ঘোষ, শেখর সরকার: *'কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা*, অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা): মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ, (কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০), পৃ. ৪০৫।

২৬. উপেন্দ্র নাথ বর্মন: *উত্তর-বাংলার সেকাল ও জীবন-স্মৃতি,* (জলপাইগুড়ি, শ্রীদূর্গা প্রেস, ১৩৯২), পৃ. ৫০-৬১।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

২৯. শিবশংকর মুখোপাধ্যায়: কোচবিহারের সামাজিক কাঠামো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

৩০. সোমনাথ হোড়: *তেভাগার ডাইরি ও চা-বাগিচা কড়চা,* (কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯১), পৃ. ১৩।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩২. সোমনাথ হোড়: *তেভাগার ডাইরি ও চা-বাগিচা কড়চা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৩৩. দীনেশ ডাকুয়া: *কামতাপুরী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ৯।

৩৪. ধনঞ্জয় রায়: *উত্তরবঙ্গ, উনিশ ও বিশ শতক,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ৪৮।
৩৫. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৩৬. এ. আর. দেশাই: *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।
৩৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: জাতীয়তাবাদের সত্যি মিথ্যে, (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০২২)।
৩৮. নির্মলচন্দ্র চৌধুরি: *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সমাজ,* (জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, ১৯৮৫), পৃ. ২।
৩৯. সমীরণ দত্তগুপ্ত: *তিস্তাতটরেখা,* (কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০), পৃ. ১২১-১২৩।
৪০. ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি: কোচবিহার, উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা, গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১৩), পৃ. ২৫৭।
৪১. নির্মলচন্দ্র চৌধুরি: *স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সমাজ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
৪৩. Swaraj Basu: *Dynamic of a Caste Movement, the Rajbansis of North Bengal,* Op.Cit., p. 91.
৪৪. উপেন্দ্রনাথ বর্মন: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* ষষ্ঠ সংস্করণ, (রায়গঞ্জ, রায় প্রিন্টার্স, ১৪১৬), পৃ. ৫৮।
৪৫. রূপ কুমার বর্মন: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক: পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* (কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯), পৃ. ৭১।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০৩।
৪৭. Anupama Rao: *The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India,* (Ranikhet, permanent Black, 2012), p. 1.
৪৮. মনোরঞ্জন বড়াল: *প্রসঙ্গঃ তফশিলভুক্তদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা,* (কলিকাতা, পথসংকেত প্রকাশনা, ১৯৯০), পৃ. ১২।
৪৯. প্রাগুক্ত।
৫০. উপেন্দ্র নাথ বর্মন: *উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি,* (জলপাইগুড়ি, শ্রীদুর্গা প্রেস, ১৩৯২), পৃ. ৭৫।
৫১. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪ ।
৫২. বিপদ ভঞ্জন বিশ্বাস: *ভারত বিভাগ ও ডঃ আম্বেদকর,* (কলিকাতা, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ২০০৩), পৃ. ১৫।
৫৩. হরিমোহন রায়: *মহামানবের কথা,* (রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ প্রেস, ১৯৯২), পৃ. ১৭।
৫৪. সদানন্দ বিশ্বাস: মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ ও অনান্য প্রসঙ্গ, (কলকাতা, দীপালি বুক হাউস), পৃ. ২।
৫৫. অরুণ ঘোষ (সংকলন): *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, দলিল সংগ্রহ ৪, (১৯৪৬-৪৭),* (কলকাতা, সেরিবান, ২০১১), পৃ. ১১৬।
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ। ১১১।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
৬০. রূপ কুমার বর্মন: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-১০৩।
৬১. কান্তি বিশ্বাস: *আমার জীবনঃ কিছু কথা,* (কলকাতা, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, একুশ শতক, ২০১৪), পৃ. ৭৬-৭৭।
৬২. রূপ কুমার বর্মণ: জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, প্রাগুক্ত।
৬৩. কান্তি বিশ্বাস: *আমার জীবনঃ কিছু কথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
৬৫. B. T. Ranadive: *Caste, Class and Property relation,* (Kolkata, National Book Agency, second printing, 1991).
৬৬. জ্যোতি বসু: *যত দূর মনে পড়ে,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৫), পৃ. ৭।
৬৭. অরবিন্দ ডাকুয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বই হল *'রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা',* (আলিপুরদুয়ার জংশন, উপমহাদেশ পাবলিকেশন, ২০১৫); এছাড়াও উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিশেষত রাজবংশীদের ওপর অনার অনেক লেখাপত্র রয়েছে। একদিন চা খেতে খেতে ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম উক্ত বিয়ের বিষয়ে ওনি জানেন কি না। সে সময় বলেছিল ও রাজবংশীদের

মেনে নিতে পারেন নি। অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে রে। কি ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে তিনি কিছু বলেন নি। তবে জাতি প্রশ্নটি এক্ষেত্রে বেশ প্রকট তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি।

৬৮. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *ভারতের কমিউনিস্ট (মাকর্সবাদী) চিন্তাধারা ও তার পরিণতি,* (কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০১২), পৃ. ৬।

৬৯. Ross Mallick: *Development policy of a Communist government: West Bengal since 1977,* (New York, Cambridge University Press, 1993).

৭০. Ibid, p. 21.

৭১. Joya Chatterji: *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947,* (New York, Cambridge University Press, 1994).

৭২. মুজাফ্‌ফর আহমেদ: *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দ্বাদশ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫); হরিনারায়ণ অধিকারী: *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* (কলিকাতা, দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৮৮); সরোজ মুখোপাধ্যায়: *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* চতুর্থ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১); সুধীর মুখপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত।

৭৩. সুধীর মুখপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩।

৭৫. বিভূতি গুহ: 'তেভাগার লড়াই', ধনঞ্জয় রায় (সম্পা): তেভাগা আন্দোলন, ষষ্ঠ *মুদ্রণ, (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭),* পৃ. ২১।

৭৬. মিনতি সেন, শুভাশীষ গুপ্ত: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, প্রথম খন্ডঃ দেশভাগ পর্যন্ত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৭৭. জনার্দন ভট্টাচার্য: 'দিনাজপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের গোড়ার কথা', ধনঞ্জয় রায় (সম্পা): তেভাগা আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৭৯. অঞ্জন বসু: *বাংলায় বামেরা: রাজপথে ও রাজ্যপাটে (১৯২০-২০১১),* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, পুনুর্মদ্রণ ২০১৯), পৃ. ১৭১।

৮০. Dilip Banerjee: *Election Recorder - An Analytical Refference: Bengal, West Bengal, 1862-2012,* vol- 1, (Kolkata, Star Publishing House, six revised, 2012), p. 73.

৮১. সত্যব্রত দত্ত: *বাংলার বিধানসভার একশ বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র,* (কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩), পৃ. ১৩৮।

৮২. তরুণ রায়: 'তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি', অনিল আচার্য (সম্পা): তিন দশকের গণআন্দোলন, (*কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৮*), পৃ. ১২৭।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৮৪. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৮৫. আবুল মনসুর আহমদ: *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* (ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ১৩৭।

৮৬. অঞ্জন বসু; *বাংলায় বামেরা: রাজপথে ও রাজ্যপাটে (১৯২০-২০১১),* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৮৭. সত্যব্রত দত্ত: *বাংলার বিধানসভার একশ বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৮৮. রণেন সেন: *বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮), (*কলিকাতা, বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ১৩৮৮), পৃ. ১৩৩।

৮৯. ভানুদেব দত্ত: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট: ভারত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৯০. রণেন সেন: *বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮),* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

৯১. মিনতি সেন, শুভাশীষ গুপ্ত: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, প্রথম খণ্ডঃ দেশভাগ পর্যন্ত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৯২. Dilip Banerjee: Election Recorder - An Analytical Refference: Bengal, West Bengal, 1862-2012, Op.Cit., p. 82.

৯৩. Ibid, p. 83.

৯৪. Ibid, p. 82.

৯৫. তাপস কুমার রায়চৌধুরী: *'ডুয়ার্সে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বিবর্তন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

৯৬. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৯৭. মিনতি সেন, শুভাশীষ গুপ্ত: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, প্রথম খন্ডঃ দেশভাগ পর্যন্ত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

৯৮. মাষান বর্মন [৭৫], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপার, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। তার বাবা ঠক গিরি করতেন। তার সঙ্গে আলোচনা এবং সমাজ ঠকদের সম্পর্কে যা ভাবতেন তার একটি বয়ান।

৯৯. বঙ্গের কমরেডরা তাঁদের (অনেকেই) আত্মজীবনীতে সাংগঠনিক কার্যকলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে জোর দিতে গিয়ে বলেছিলেন কিভাবে ঐদিনগুলি তাঁরা অতিবাহিত করেছেন। তারা গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কৃষকদের তাঁরা বুঝাতে সচেষ্ট থাকতেন তাঁরাও তাদেরই একজন। এই ধরনের মানুষিকতা মধ্য দিয়ে কৃষকদের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছেন। খেয়ে, না খেয়ে তাঁদের পাশে থেকে কৃষকদের মনবল বাড়াতে সাহায্য করেছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন জীবন দে: *আমার জীবনের অক্টোবর,* (তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সীমান্তী প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৭৮); সমীরণ দত্তগুপ্ত: *তিস্তাতটরেখা,* (কলকাতা, এন ই পাবলিশার্স, ২০০০); সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার: *পটভূমি কাঞ্চনঘংগা,* (কলিকাতা, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৩); সোমনাথ হোড়: *তেভাগার ডাইরি ও চা-বাগিচা কড়চা,* প্রাগুক্ত। সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত।

১০০. Sukhbilas Barma: *Indomitable Panchanan, an objective study on Rai Saheb Panchanan Barma*, (New Delhi, Global Vision Publishing House, 2017), PP. 273-290.

১০১. অনিল বিশ্বাস: *কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মতাদর্শ,* ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪), পৃ. ৮১।

১০২. অঞ্জন বেরা (সম্পা): *জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ,* কিছু কথা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন মার্কসবাদ – লেনিনবাদ নীতিতে স্থিত থাকার অন্যতম প্রধান যে শর্ত, মানুষের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ, তা নিশ্চিতভাবে বসুর রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম খন্ড, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২)।

১০৩. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

১০৪. রণেন সেন, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪),* (কলকাতা, বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ১৯৯২), পৃ. ২৬।

১০৫. সুস্নাত দাশ: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত- পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* প্রাগুক্ত; সুপ্রকাশ রায়: *তেভাগার সংগ্রাম,* (কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১); ধনঞ্জয় রায় (সম্পা): *তেভাগা আন্দোলন,* ষষ্ঠ মুদ্রণ, (কলকাতা, আনন্দ পাবলির্শাস, ২০১৭)।

১০৬. মণিকুন্তলা সেন থেকে অনেক সংগঠক তাদের আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, কি চাইলাম আর কি পেলাম। শেষে মণিকুন্তলা সেন পার্টি থেকে বেড়িয়ে আসেন। বিস্তারিত জানতে দেখুন মণিকুন্তলা সেন: *সেদিনের কথা,* প্রাগুক্ত; সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৮৫); জীবন দে: আমার জীবনের অক্টোবর, (তুফানগঞ্জ, কোচবিহার, সীমান্তী প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৭৮)।

১০৭. সোমনাথ হোড়: *তেভাগার ডাইরি ও চা-বাগিচার কড়চা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১০৯. অঞ্জন বেরা (সম্পা): *জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ,* প্রথম খন্ড, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ৪৩।

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১১৩. জ্যোতি বসু: *যত দূর মনে পড়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪।

১১৪. Ranjit Das Gupta: *Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947*, (Delhi, Oxford University Press, 1992), pp. 175-176.
১১৫. Ibid, pp. 177-178.
১১৬. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১১৭. মুহম্মদ মনিরুজ্জমান: 'দিনাজপুরের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবঃ ১৮৯০-১৯৪৭', বিনয় বর্মন (সম্পা): উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, খণ্ড ২, *(কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, ২০১২),* পৃ. ১৬৮।
১১৮. সুধীর মুখোপাধ্যায়, *নৃপেন ঘোষ: রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
১২২. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste Movement*, Op.Cit.,, pp 42.
১২৩. H.N. Chowdhuri: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement*, (Cooch Behar, The Cooch Behar State Press, 1903), p. 131.
১২৪. Ibib, p. 131.
১২৫. Ibid, p. 131.
১২৬. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।
১২৭. সুস্নাত দাশ: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।
১২৯. D.N. Dhanagare: Peasant Movement in India: 1920-1950, Op.Cit., p. 163.
১৩০. Ibid, p. 165.
১৩১. Ibid, p. 173.
১৩২. কৃষক নেতা অবনী লাহিড়ী লিখেছেন কমিউনিস্টরা দীর্ঘ সময় ধরে কৃষকদের গ্রামে-ঘরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় আর তার ফলে অন্যন্য রাজনৈতিক দল থেকে তাদের পরিচয় স্বতন্ত্র হয়ে যায়।... কী দুস্তর ছিল বাঁধা, কথা বলার ভাষাও জানা ছিল না, রাজবংশী কৃষকরা যে ভাষায় কথা বলতেন তার অর্থ উচ্চবর্ণের শহুরে ভদ্রলোকেরা বুঝতে পারতেন না, শহরের জীবনে অভ্যস্ত সেই যুবকদের পক্ষে গরিব কৃষক ও আধিয়ারদের মধ্যে বসবাসের শারীরিক কষ্ট ছিল কঠিন। কিন্তু ফলও ফলল বিপুল- কৃষক ও আধিয়ারদের মধ্যে থেকে পার্টিকর্মী তৈরি হতে লাগল। কৃষকদের সঙ্গে টানা দেড় বছর থাকায় তাদের জীবনে এনে দিয়েছিল রূপান্তর। প্রধানত দু দিক থেকে। কৃষকের সঙ্গে একাত্মবোধ, তাঁর জীবনের সমস্যাগুলোকে কাছ থেকে দেখা। অন্যটি হল গ্রামের সমস্যাগুলোকে কৃষকের চোখ দিয়ে দেখতে শেখা, যা এর আগে আমাদের ছিল না। *ত্রিশ চল্লিশের বাংলা: রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
১৩৩. Ranjit Das Gupta: *Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947*, Op.Cit., p. 193.
১৩৪. D.N. Dhanagare: Peasant Movement in India: 1920-1950, Op.Cit., p. 171.
১৩৫. রংপুরের কৃষক নেতা সুধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ তার আত্মজীবনীতে দু এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন জমিদারদের অত্যাচারের বয়ান। যেমন টেপার জমিদার সত্যন্দ্রনাথ রায় প্রজার উপর দারুণ অত্যচার করত। মাঠে প্রজা হাল বইছে, সেই অবস্থায় বরকন্দাজ হালমাঝি ও হাল বাড়ি থেকে প্রজাকে গলায় গামছা লাগিয়ে কাছাড়ীবাড়িতে নিয়ে যেত। পৃ. ৩৪।
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।
১৩৭. Sukhbilas Barma: *Indomitable Panchanan, an objective study on Rai Saheb Panchanan Barma*, Op.Cit., pp. 273-276.; অরবিন্দ ডাকুয়া: *রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২- ১৩৩।
১৩৮. হরিপদ রায়: *গণ আন্দোলনে কোচবিহার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
১৩৯. সুস্নাত দাশ: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৬।
১৪০. D.N. Dhanagare: Peasant Movement in India: 1920-1950, Op.Cit., p. 173.

১৪১. অরুণ চৌধুরী: *সাক্ষাৎকার:* প্রাক্তন পৌরপতি মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২৩.০১.২০১৯। তিনি মনে করেন রাজবংশী সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ হল জোতদার শ্রেণির উপর সমস্ত সমাজের নির্ভরতা। সব গিরির উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কখনবা গিরিকে বাপ দায় দিয়ে ধর্মবাপ করে পর নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার প্রবনতা সমাজের লক্ষণীয়।

১৪২. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste Movement, the Rajbansis of North Bengal, 1910-1947*, Op.Cit., p. 119.

১৪৩. Ranjit Das Gupta: Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947, Op.Cit., p. 192.

পঞ্চম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের শ্রেণি রাজনীতিতে রাজবংশীদের অবস্থান: উত্তর-উপনিবেশিক পর্ব

দেশভাগ, স্বাধীনতা এবং অগুন্তি মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, নিয়ে এসেছিল ১৯৪৭ সাল। নতুন করে দেশ গড়ার স্বপ্ন, হাজার হাজার মানুষের ভিন্ন অভিজ্ঞতা, নতুন করে বাঁচার সংগ্রাম, এ সবেই স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষার বসে সাধারণ মানুষ করেছে। গড়ে ওঠেছে নতুন দেশ এবং নতুন রাজ্য। মানুষ সীমানার জালে আবদ্ধ হয়েছে। পেয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। এই রকম পরিস্থিতিতে স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের উদ্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির ও স্থানীয় সমাজ অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। এই পর্বে বামপন্থী আন্দোলনের ভাষাও বদলেছে। আওয়াজ তুলেছেন *‘এ আজাদি ঝুটা হ্যায়’*। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছিল। বামেরা নতুন করে আন্দোলনের পরিভাষা ও সংগঠন তৈরি করার উদ্যোগ নেন। এই নব-নির্মিত রাজ্যে বামপন্থীদের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে উত্তরাংশের রাজবংশী সমাজের বোঝাপড়া কীভাবে গড়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষনাত্বক আলোচনা করবে আলোচ্য অধ্যায়টি।

নব-নির্মিত পশ্চিমবঙ্গ প্রথম পদক্ষেপেই ‘জমিদারি ব্যবস্থা’ (১৯৫৩) তুলে দিয়ে চিরাচরিত সমাজের ঐতিহ্যে আঘাত করেছিল। কৃষক সমাজকে জোটবদ্ধ করার অন্যতম উপায় হিসাবে বামপন্থীরা জমিদারি ব্যবস্থা বিরোধী রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসি আমলে এই আইন পাশ হয়। স্বাধীন ভারতে প্রথম

সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে এবং উক্ত আইন পাশ হয়। সেসময় বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিরোধী আসনে জায়গা করে নেয়। যার কারণে অনেকেই ১৯৫২-১৯৫৭র মধ্যকার বিধানসভাকে রায়-বসুর (বিধান চন্দ্র রায় ও জ্যোতি বসু) সভা বলে অভিহিত করেছেন।[১] পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক পটভূমির দিকে তাকালে অতি সহজে প্রতীয়মান হয় বামেদের পরিপাটি অবস্থানকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থেকে যৌথভাবে কাজ করলেও এসময় তারাই কংগ্রেসের বিরোধীতায় নামেন এবং সংগঠিতভাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে বাম-মনভাবাপন্ন দলগুলির (সিপিআই, আরএসপি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লক, পিএসপি (প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টি) সঙ্গে জোট গঠন করে বিরোধীতায় নেমেছিলেন। তারই অনুরূপ কৌশল ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে লক্ষ করা যায়।[২] এই সময়ের মধ্যে অনেকটাই বাম-রাজনীতির বিস্তৃতিও ঘটিয়েছিলেন। কারণ ১৯৫২র নির্বাচনে কমিউনিস্ট প্রার্থী ছিল ৭০ জন। ১৯৫৭য় তা বেড়ে হয়েছে ১০১ জন।[৩] বাম পরিধি ক্রমান্বয়িত বৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছিল। তবে ১৯৫২র নির্বাচনে কমিউনিস্টদের সীমাবদ্ধতা ছিল শহর ও শিল্পাঞ্চলে। গ্রামীণ একাকায় কংগ্রেসের আদিপত্য যেমন ছিল তেমনি শহরাঞ্চলে। এমনকি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম থেকে কোন আসন পায়নি সিপিআই।[৪] সেই সঙ্কট অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন ১৯৫৭য়। সিপিআই এর এই সাফল্যের পিছনে তপশিলিদের ভোট একটা বড় জায়গা জুরে ছিল। তাদের লক্ষ এবং তপশিলি জাতির অবস্থান অনেকটাই সমার্থক ছিল। দারিদ্রতার প্রশ্নে তপশিলিদের সংযুক্ত করা যেমন সহজ হয়েছিল তেমনি জাতি প্রশ্নটির গ্রহণযোগ্যতা ম্লান করার একটা বাড়তি সুবিধে

পেয়েছিলেন। এই লক্ষে **১৯৫২** নির্বাচনে তপশিলি জাতির সংরক্ষিত **১১**টি আসন দখল করে।[৫] কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের সফলতা বজায় থাকলেও তপশিলি জাতির আসন সংখ্যা কমে যায়। অন্যদিকে বাম বলয়ে তপশিলিদের আসন বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে **১৯৬২**র নির্বাচনে অসংরক্ষিত আসনে তপশিলিদের আসন সংখ্যা কমে যায়।[৬] অর্থাৎ জাতি চেতনার বিষয়টি এর মধ্য থেকে প্রকট হতে থাকে। যেমন **১৯৬২** সালের নির্বাচনে অমর রায় প্রধান (ফরওয়ার্ড ব্লক) মেকলিগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থী সত্যেন্দ্র প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। অমর রায় প্রধান উদ্বাস্তু হলেও স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সত্যেন্দ্র প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে জনগণ ভোট দেননি। সুতরাং একদিকে বাম-রাজনীতির জায়গাটা যেমন রয়েছে তেমনি জাতি প্রশ্নটি একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যথায় মাথাভাঙ্গা বিধান সভায় দীনেশ ডাকুয়ার (CPIM) নির্বাচন রাজনীতির জায়গাটি লক্ষ করলে বাম-বলয়ের ক্রমান্বিত জায়গাটি বোঝা যাবে।[৭] নিচের সারণিতে তা দেখান হয়েছে-

সারণি নং: ১ উত্তরবঙ্গে বাম বলয়ের প্রসরতা:

সাল	প্রাপ্ত ভোট	জয়/ পরাজয়
১৯৬২	১৫,৪৮২	পরাজিত
১৯৬৭	২৬,৮৭২	জয়ী
১৯৬৯	২২,৪৭৮	পরাজিত
১৯৭১	১৮,৩৮৬	পরাজিত
১৯৭২	১৮,১৭৩	পরাজিত
১৯৭৭	২২,৪৯৩	জয়ী
১৯৮২	৪৪,৭২৫	জয়ী
১৯৮৭	৪৯,০৯৩	জয়ী
১৯৯১	৫৫,৬০৪	জয়ী
১৯৯৬	৬৪,০৫২	জয়ী
২০০১	৬৮,৩৪০	জয়ী

তথ্যসূত্র: Dilip Banerjee: *Election Recorder- An analytical reference, Bengal, West Bengal, 1862-2012*, vol. 1, Kolkata, Star Publishing House, Six Revised, 2012.

সমাজের একটা অংশ ধীরে ধীরে বাম-বলয়ে ধাবিত হয়েছিল তা উপরিউক্ত সারণিটি সাক্ষ্য দেয়। দীনেশ ডাকুয়া একদিকে যেমন রাজবংশী সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতিবিদ অর্থাৎ একই সঙ্গে 'জাতি' ও 'শ্রেণি'র প্রশ্নটি জরিয়ে রয়েছে। উভয়ের এই সংঘবদ্ধতা এমনভাবে জরিয়ে আছে খুব সহজে বোঝার উপায় নেই একচুয়ালি কি হয়েছিল ? তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে ৭০র দশকের পর। বিশেষ করে ১৯৭৭এ ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে ভূমিসংস্কারের নীতি নিয়ে এসেছিল তাতে জমি বন্টনের সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কায় একটা বড় অংশের ক্ষুদ্র কৃষকের উত্থান হল। এর ফলে কিছুটা উৎপাদন বেড়েছিল প্রধানত টিউবয়েল বসিয়ে, সার বীজ দিয়ে কিংবা সরকারি সাহায্য নিয়ে। আয় বাড়ল, এক ফসলি জমি তিন ফসলি জমিতে পরিণত হল, সারা বছর কাজ পাওয়া গেল– এই সব ঘটনার ফলে একটা সামাজিক সুস্থিতি তৈরি হল। কিন্তু ১৯৮০র দশক থেকে এই চিত্র পাল্টাতে থাকে। উৎপাদন ব্যবস্থায় মন্দা এল। জমি ভেঙ্গে আরো টুকরো টুকরো হতে শুরু করল। এই ছোট জমিতে চাষ করে অন্নসংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে একটা অসংগঠিত শ্রমিক-স্তর (Informal sector) গজে উঠল। এরা গ্রামে থাকে অথচ কৃষিকাজ করে না। এর সংখ্যাটাও বাড়তে লাগল। এদের কীভাবে বামপন্থী আন্দোলনে নিয়ে আসবে তার ব্যাখ্যা বঙ্গের নেতারা দিতে পারল না। অর্থাৎ জমিকে ধরে ভাবনার পর্ব শেষ হল। এর বিকল্প হিসাবে শিল্পে মন দাও – নীতি উপর জোর দিল। যা সরকারের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আবার ১৯৯০র দশক থেকে উদারীকরণের রাজনীতি শুরু হলে রাষ্ট্র বেসরকারি পুঁজির উপর থেকে নিজের অধিকার হারাল। এর মধ্যে যে উচ্চ মধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ মানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল তারা অনেকটাই রাষ্ট্র নির্ভরতা থেকে সরে আসল।

ফলত তাদের কাছে সরকারি চাকরি থেকে বেসরকারি কোম্পানির চাকরি অনেক বেশি আকর্ষণ করল। বামপন্থী রাজনীতির একটা ঝোঁক ছিল রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকা। এর ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তার বিচার করার ক্ষমতা বাম নেতারা করতে পারলেন না বলে মনে করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সদ্য প্রকাশিত (২০২১) তার 'নাগরিক' নামক গ্রন্থটি বামপন্থী রাজনীতির সমালোচিত ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিকল্প ভাবনার জায়গাটিকে খুঁজে বের করার উপর জোর দিয়েছেন। যা বামপন্থী রাজনীতির সম্ভাবনাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করবে বলে ওনার বিশ্বাস।[৮] যাইহোক, ৭০র দশকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলে যে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের কথা বলেছিলেন তা রাজবংশীদের একটি অংশ মেনে নেননি। যার কারণে রাজবংশীরা তাদের সঙ্গে একাত্ব না হয়ে ভিন্নতার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছেন। এই জটিলতার জায়গাটি অনুসন্ধান করবে আলোচ্য অধ্যায়টি।

জাতি চেতনা নিয়ে শ্রেণি রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি আমাদের গবেষণার প্রতিপাদ্যতা হলেও শ্রেণির ব্যাখ্যা ও জাতি সত্তা উভয়েই একই সঙ্গে মিশ্রিত হলে তার যে নতুন রূপ প্রকাশ পায় তা রাজবংশীয়দের উপাদানগত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যাচাই করেছে আমাদের আলোচ্য লেখনীটি। ব্যক্তিমানুষের এই চিন্তন সমাজকে কীভাবে অস্পষ্টতার দিকে নিয়ে যায় তার একটি আভাস পাওয়া যাবে। যে আভাসের মধ্যে *'আমরা সকলেই এক সঙ্গে আছি'* তা কতটা সামাজিক প্রশ্নগুলোকে সমস্যায়িত (Problematize) করে তার আলোচনা রাখবে আমাদের সন্দর্ভটি।

১.বামফ্রন্টের ভাবাদর্শ

বঙ্গের কমিউনিস্ট মানসিকতা ও সংগঠন উত্তরবঙ্গে বিশেষত রাজবংশী জনমানসে তেভাগা পর্বে কতটা প্রভাব ফেলেছিল, তা বির্তকীত বিষয় বলে মনে হলেও

রাজবংশীরা বোধহয় এই প্রথম অনুধাবন করেছিল কীভাবে প্রচলিত প্রথা-প্রকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থাপন করে নতুন রাজনীতির পরিবেশ রচনা করা যায়। সমাজকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করার জন্য বঙ্গের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ভদ্রবাবুরা কীভাবে জাতির অভ্যন্তরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে তা অনুপূর্ব অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে এবং কীভাবে প্রচলিত সমাজকে শ্রেণির প্রেক্ষাপটে আখ্যান দিয়ে থাকে তারও আভাস লক্ষ করা যায়। মূলত কৃষকের অবস্থানের মাপকাঠিতে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে ক্রমের (Hierarchy) ধারণা প্রকট করেন বঙ্গের বামপন্থীরা। এই ভেদাভেদ প্রকট করে মূলত ‘শক্তি ও অর্থের’ (Power and Wealth) নিরিখে। ফলত প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য থেকে শ্রেণির ধারণা বিকাশ ঘটান সম্ভব নয় বলে তাদের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখে সমাজ বদলের ডাক দেয়। এটাকে একটা বাম আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যায়। সেই পথ ধরে বঙ্গের বাম-কর্মীরা আন্দোলনের তরঙ্গ তুলেছে। যেহেতু বঙ্গ একটি কৃষি প্রধান দেশ, সেকারণে বামেদের প্রকল্প শিল্প বা বাণিজ্য বা শহরমুখি জীবনে খুব বেশি জায়গা করে নিতে পারেনি। কৃষকেই এখানে আলোচনার প্রধান উপজীব্য। কৃষক ও গ্রামের সহায়সম্বলহীনদের স্বনির্ভর করে তোলার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমাজজীবনে ‘সমতা’ নিয়ে আসার উদ্যোগ শ্রেণির ধারণার সঙ্গে সমার্থক হয়ে ওঠেছে। কৃষক, অকৃষক সকলের হাতে জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি একপ্রকার ক্ষুদ্র কৃষক বানানোর অপর নাম হল বাম-রাজনীতি। এজন্য কতগুলো জনমোহিনী দাবি যেমন উৎপন্ন ফসলের তেভাগার দাবি বা অপারেশন বর্গা কৃষককে ঘিরে রচিত হয়। সেখান থেকে ন্যায্যতার প্রশ্ন, অধিকারের প্রশ্ন উঠে আসে। সেই অধিকারের প্রশ্নে অকৃষকরা যারা চাষ করে না কিন্তু উৎপাদনের পাশে থাকে যেমন মৈশাল, যে চাষবাসের তুলনায় মোষ চরিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে

সাচ্ছন্দবোধ করে, সে যদি এক টুকরো জমি পায় বাম রাজনীতির জায়গা থেকে, সেখানে তাঁর স্বতঃফুর্ততা কতটা প্রকাশ পায় (?), সে বিবেচনায় না গিয়ে সকলকে জমিতে জুরিয়ে দিয়ে 'সমতার' ভাষা প্রকাশ করেন। যা জাতি প্রশ্নে অনেকটাই দূরত্ববাচক বলা যায়। কারণ জাতির উৎপত্তিগত জায়গাটিতে ধর্মীয় প্রবণতা বেশ প্রভাবশালী। আর বস্তুবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার জায়গাটা অর্থ ও তার সামর্থ্যের বিচারে বিবেচ্য।[৯] সেইদিক থেকে উক্ত দুই দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ স্পষ্টতই প্রতীয়মান।

শ্রেণির নিরিখে অবস্থানরত সমাজকে (Existing Society) দুটি স্তরবিন্যাসে (Category) দেখার প্রবণতা রয়েছে। বিশেষত মালিক ও প্রজার সম্পর্ককে শোষণ ও দারিদ্রতার প্রশ্ন দিয়ে সমাজ ব্যাখ্যা করার এক নতুন উদ্যোগ বাম রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে। মালিকের আদিপত্য এবং প্রজার অধীনতার সম্পর্ক শোষণের নিরিখে দেখার প্রবণতা থাকলেও সবসময় যে মালিকের ভূমিকার কর্তৃত্বকারি হবে এমনটা মনে করেন না নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা। প্রজা বিদ্রোহ এমন এক ঐতিহাসিক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে কৃষক প্রতিরোধ থাকে। এই প্রতিরোধ কৃষকের নিজস্ব চেতনার বিকাশ বলে মনে করেন নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকরা। অর্থাৎ কৃষক আন্দোলনে কৃষকের চেতনার একটা নির্দিষ্ট রূপ ও স্বতন্ত্রতা থাকে। এই চেতনায় শ্রেণির হস্তক্ষেপ হলে তবে তা বিপ্লবে পরিণত হয় বলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন।[১০] তেভাগার ইতিহাসে কৃষক চেতনার বিষয়টি যার সঙ্গে বাম নেতৃত্বে ভাবনার পরিসর কখনই সমরূপে প্রতিভাত হয়নি। এমনকি জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক সবসময় শোষণ বা বঞ্চনা দিয়ে রচিত না হয়ে পারস্পরিকতার সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল বলে অশোক রুদ্র মনে করেন।[১১] উচুতলার কমরেডের সঙ্গে যেমন নিচুস্তরের কমরেডদের মনমালিন্য ছিল তেমনি কমরেডদের সঙ্গে কৃষক-কর্মীদের সর্ম্পক যতটা আপন আপন বলে

আমাদের সমাজকে ভাবিয়ে তোলে সেরকমটা বাস্তবে ঘটেনি। রংপুরের কৃষক নেতা লিখেছেন-

> সেসময় রংপুর জেলে বুদ্ধিজীবি কমরেড ছিলেন ডাঃ মারুফ হোসেন, সুধীন ধর, শান্তি সান্যাল, নারায়ণ ব্যানার্জী, দীনেশ লাহিড়ী, আবুল মকসেদ। কৃষক কমরেডরা অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যেতে পারেনি বলে বুদ্ধিজীবি কমরেডরা তাদের দেখতে পেলেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। গায়ে থু-থু দিয়েছে, মেথর হয়েও যেতে বলেছে। কমরেড দীনেশ লাহিড়ী এবং আবুল মকসেদ এই সব ব্যাপারে যুক্ত হন নাই। সাধ্যমত প্রতিবাদ করেছে। কমরেড সুধীর ধর প্রথমে যুক্ত থাকলেও পরে যখন মকসেদ তার ভুল বুঝিয়ে বলেন তখন তিনি বুঝতে পারেন।...প্রবীণ কমরেড দীনেশ লাহিড়ীর সাথেও তাচ্ছিল্ল আচরণ করা হয়। তাঁকে অকর্মন্য, অরাজনৈতিক বলে উপহাস করা হয়।...[১২]

উক্ত বয়ানে কৃষক চেতনার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকার পাশাপাশি নেতাদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা একে অপরের থেকে বুদ্ধিমান প্রমাণিত করার অনভিপ্রেত প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশিত হয় জাতিগত অবস্থান। সেই সূত্রে বাম আমলে রাজবংশীদের অবস্থান কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয় তার আলোচনাকে ধরে দেখাতে সচেষ্ঠ হয়েছে জাতিগত উপাদান কীভাবে বাম রাজনীতির জায়গাটিকে সুরক্ষিত করে। সেই সম্পর্ক যতটা পারস্পারিক তার তুলনায় সংগ্রামরত এবং এই সংগ্রামমুখি চিন্তা, পুরানো ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরে বিশ্বাস রাখে। এমন চিত্রপটেই তেভাগা পর্বের বিকাশ ঘটেছিল। শ্রমজীবী মানুষের 'অধিকারের প্রশ্ন'টি এই বিবতমান সংগ্রামের চালিকাশক্তি। একেবারে সমাজের চালচুলহীন মানুষকে নিয়ে রাজনীতি মনে হয় এই প্রথম শুরু হয়েছিল। কংগ্রেস রাজনীতির থেকে এই ভিন্নতা বাম নেতৃত্বের বাড়তি সুবিধা পেতে সাহায্য করে। যদিও বাম পলিসি খুব একটা পার্থক্য তৈরি

করতে পারেনি বলে মনে করেন রজ মালিক। কংগ্রেস রাজত্বে স্থানীয় নেতৃত্বের জায়গাটি গ্রামের এমন এক এলিটকে অনুসন্ধান করে যিনি প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অধিকারী। কিন্তু বাম রাজত্বে সেই নিচুশ্রেণির এলিট ও জাতের সমর্থককে ক্ষমতা প্রদান করে যাতে সেই ভদ্রবাবুর নেতৃত্ব বহাল থাকে। তিনি লিখেছেন-

> Where members had to come specifically from tribal or lower-caste wards, the high-caste village elite nominated their own clients as representatives of these groups.[১৩]

বাম-রাজনীতির এই অভিনবত্বে পুরানো সমাজের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হল ঠিকই কিন্তু তার আদর্শ থেকে গেল বাম নেতাদের নেতৃত্বে। এক জমিদারি তুলে অপর এক জমিদারি স্থাপন করা। সুদীপ্ত কবিরাজ এই জমিদারির নাম রেখেছে বামপন্থী জমিদারি।[১৪] এই জমিদারির চরিত্র যত না কাল্পনিক ও এককেন্দ্রিক তার তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল। এই মানসিকতা এতটাই একপেশে যা অপরের এমনকি অনান্য বামপন্থীদের সহ্য করতে পারতেন না। সবসময় পবিত্র পবিত্র ভাব নিয়ে অপরকে ছুৎ মার্গ করে রাখতেন। অন্যথায় কে চীন বা সোভিয়েতের কাছাকাছি আছে তার নিরিখে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতেন। এই ইউরোপ-কেন্দ্রিক চেতনার বিকাশ হলেও স্থানীয় সমাজ কাঠামো ও ইতিহাসের গুরুত্বকে আমল না দেওয়ার বিষয়টি বামপন্থীদের অবস্থানকে কিছুটা মলিন করে।

'সকলে এক সঙ্গে আছি' – এইভাবে ভাবতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বড় একটা শক্তি অর্জন করেছিল সে নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্ত এই ভাবনা দিয়ে বিরোধী শক্তি হিসাবে প্রতিরোধ তৈরি করা গেলেও শাসন পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কারণ বিভিন্ন ঘটনাকে বুঝতে চিন্তার বৈচিত্র্যতা থাকার সুবিধে আছে।

অন্যথায় একটি স্তরের উপর অপর একটি ভাবনা চাপিয়ে দিয়ে স্থানিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। এর বিরোধীতা হলে হিংসার সৃষ্টি হয়। ফলত যখনি বামফ্রন্ট সরকার বিরোধীতার সংমুখিন হয়েছে তখনি তার এই বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ আদিপত্য ও অধীনতার এই প্রশ্নটি এমন একটা গণ্ডি তৈরি করে যা ভয়ের মাপকাঠিতে বিচার্য। অনেকটা মধ্যযুগীয় ভাবনার প্রকাশ হিসাবে তার আবির্ভাব ঘটেছে। সেখান থেকেই অনেকটা ধর্মীয় অনুশাসন বাম-রাজনীতির ভাবাদর্শে পরিণত হয় বলে সুদীপ্ত কবিরাজের পরিভাষায় ব্যক্ত হয়েছেন। এই পটভূমিতে উত্তর-উপনিবেশিক কালে রাজবংশীরা কীভাবে বাম-রাজনীতির হিংসার শিকার হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন করেছে তার আলোচনা করেছে আলোচ্য অধ্যায়টি।

২. রাজবংশী জাতির গঠন প্রণালী

পঞ্চানন বর্মার জাতি আন্দোলন মূলত অতীত পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে গৌরবময় যুগের স্মৃতিচারণের মাধ্যম যা উপস্থাপন করে বর্তমানের নিরিখে তাদের প্রতিরোধ ও ঐক্যের ধারণাকে। রাজবংশী অতীত ও বর্তমানের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে বর্মা নিজের অবস্থান এবং জাতির প্রশ্নটি বঙ্গের রাজনীতিতে যুক্ত করেছিল। যা সম-ভাষাভাষী ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষজনদের একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে ভাবাতে সাহায্য করে এই পার্থক্যের মধ্যেকারে ঘটনাবলিকে। উক্ত ঘটনাবলী আবার কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করার সংগ্রাম আধুনিক জাতিবোধের জন্ম দিতে সাহায্য করে যা অনুপূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যবর্তী জীবনের ঘটনা ও তার অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করে যা এক স্বতন্ত্র জীবন ধারাকে প্রকাশ করে।

বর্মা মূলত কিছু দৃষ্টান্তের জায়গা থেকে রাজবংশীদের অনুসন্ধান করেছেন। সেই নিরিখে রাজবংশী জাতির ইতিহাস রচনায় অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্য অন্যতম হলেন উপেন্দ্রনাথ বর্মণ। তাঁর লেখনী প্রধানত আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির উপর দৃষ্টি রেখে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে ওনার ভাবনাচিন্তাকে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। প্রাক-আর্য সংস্কৃতি যুগে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মানুষের উপস্থিতি যেমন দেখা গেছে তেমনি আর্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। সেই সকল মানুষজন আক্ষরিক অর্থে অনার্য নামে আকাদেমির পরিসরে স্থান পেয়েছে। এই সকল মানুষজনের ব্যবহারিক জীবনের কিছু কিছু লক্ষণ সামনে রেখে রাজবংশী সমাজের আদিমতা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই পর্বে মানুষের ভাবনাচিন্তা এবং জীবনপ্রণালী যাকে রূপান্তর ঘটিয়ে আধুনিক সম্প্রদায়ের ধারণা পঞ্চানন বর্মা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ঠ হন। সেখানে মৈশালবন্ধু থেকে অধিকারী এবং সাধারণ রাজবংশী সমাজের সঙ্গে জোতদার বা দেওয়ানি সম্প্রদায়ের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। এঁদের সঙ্গে বঙ্গের বর্ণের ধারণা অনেকটাই দূরত্ব বাচক। একটি স্বয়ং সম্পন্ন জাতির অবস্থান লক্ষ করে বর্মা বঙ্গের বাঙালি জাতীয়তাবাদ থেকে বেড়িয়ে এসে রাজবংশীদের নিয়ে পৃথকীকরণের দিকে এগিয়েছিলেন এবং পরিশেষে আর্যকরণকে সমর্থন করে ক্ষত্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। বঙ্গের বিরুদ্ধে রাজবংশী জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় কোচবিহার রাজতন্ত্রে। কোচবিহার রাজ্যে ১৯০৯ সালে গঠিত হয়েছিল ‘স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল’। এর সদস্য হতে পারত সরকারি পদাধিকারিরা কিংবা রাজার মনোনিতরা। স্বভাবতই দেশের স্থানীয়দের যুক্ত হওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়নি। কারণ সরকারি পদাধিকারিরা সকলেই বহিরাগত। তখন সেভাবে স্থানীয় সমাজ থেকে শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠেনি। আবার যখন স্থানীয় সমাজ থেকে

শিক্ষিতের উদয় হতে শুরু করেছিল, তাঁরা চাকরি তো পাইনি বরং দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। তার প্রমাণ হিসাবে পঞ্চানন বর্মার নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়। কিন্তু ১৯৪১ সালে 'স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে'র সংশোধন আনতেই দেখা গেল স্থানীয় সমাজ থেকে ৮ জন প্রতিনিধি করার সুযোগ পেল। সতীশ চন্দ্র সিংহ রায়, খান চৌধুরী আমানাতুল্লা আহমেদ, আনসার উদ্দিন আহমেদ প্রমুখরা কাউন্সিলের সকল পদ দখল করে নিল। অর্থাৎ বাঙালিদের কাছ থেকে এই প্রথম রাজবংশী দেশি মানুষরা ক্ষমতা দখল করে। এই ক্ষমতা দখলের পিছনে রাজবংশী জাতি সত্তার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে।[১৫] এবার যদি লক্ষ করা যায় মৈশাল কিংবা অধিকারী সম্প্রদায়ের দিকে তাহলে স্পষ্টতই উভয়ের ব্যবহারিক জীবনের আচরণ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মৈশালের উপস্থাপনা এমন এক বেশভূষা ও আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় সেখানে অনেকটা রাখালের যাযাবর (Nomad) জাতীয় জীবন প্রকাশ পায়। সে যাযাবর নন, কোন এক জোতদারের রাখালিয়া। তাঁর স্থায়ী ঘর রয়েছে, সংসার রয়েছে। কিন্তু মৈশালের কাছে ঘর ও বাহির মধ্যে কোন অন্তরায় নেই। অর্থাৎ এই ভিন্ন আচরণ দিয়েই তাঁর পরিচিতি। এইভাবে স্বতন্ত্র আচরণ ও পেশার মধ্য দিয়ে জোতদার, দেওয়ানি, অধিকারী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রত্যেকের পেশা বা ধরন একই রকম নয় অথচ প্রত্যেকে রাজবংশী। এটি এক একটি জাতির অনুপম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন ইরাবতী কার্ভে।[১৬] মৈশাল সম্পদায় এখানে একটি গ্রুপ (Sub-Caste)। মৈশাল এবং অপরারপর সম্প্রদায়গুলো যখন এক সাথে মিলিত হয় তখন তৈরি হয় গ্রুপগুলির সংবদ্ধতা (caste-cluster)। জাতি সর্বদাই গ্রুপ (Sub-Caste) তৈরি করে। যেমন লক্ষ করা যায় অধিকারী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চক্রধারী এবং পত্রধারী এই দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জাতি ক্রমাগত তার

অভ্যন্তরে গ্রুপ (Sub-Caste) তৈরি করে। এই সম্পন্ন গ্রুপগুলো যে জাতির অভ্যন্তরে থাকে তাকে বলা হয় রাজবংশী জাতি। জোর করেই মনে হয় পরবর্তীতে বর্ণবাদী ধারণা জাতি ব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। চর্তুবর্ণের ধারণা অনৈতিহাসিক ও অলীক কল্পনা বলে মনে করেন নীহাররঞ্জন রায় যা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে জাতির এই গঠনগত কাঠামোটি অনেকটা চক্রাকারে অবস্থান করে। অনেকটা এইরকম-

চিত্র নং: ১

বৃত্তাকারে জাতি কাঠামোর চিত্র:

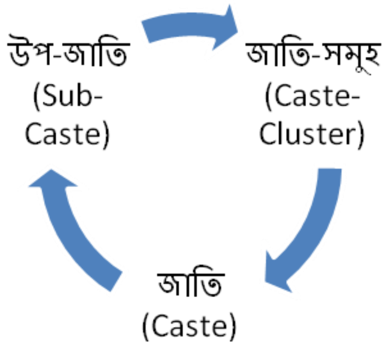

এর মধ্য দিয়ে জাতির স্বাধীনতা, ঐক্য এবং প্রতিরোধ প্রশ্নটি জরিয়ে থাকে।

৩. জাতি বনাম শ্রেণি

পঞ্চানেনর জাতি চেতনা এবং বঙ্গের ভদ্রবাবুদের শ্রেণির ধারণা এই দুইয়ের মতার্দশ অবস্থানরত সমাজকে (Existing Society) দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছে। পঞ্চানন বর্মা রাজবংশী জাতি উন্নয়নের প্রশ্নটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে-- ১. আধুনিক শিক্ষা, ও ২. রাজনৈতিক অধিকার। রাজবংশীর প্রচলিত প্রথা বা রীতিকে তিনি রাষ্ট্রনীতির এক অনুপম নির্দশন বলে মনে করতেন যা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় যা তিনি অভাব বোধ করেছেন তা

হল আধুনিক শিক্ষা। এজন্য তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে রাজবংশী সমাজকে পরিচয় করিয়েছিলেন। এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে সচেষ্ঠ হয়েছিলেন। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে সংযুক্তিকরণ হয়েছিল যা প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সেদিক থেকে পঞ্চানন বর্মাকে উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কারক বলা হয়েছে। রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিগত দিকটি এতে প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পুরানো আদব কায়দা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। অর্থাৎ শিক্ষা এবং রাজনীতির পাঠ নিছক সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনা নয় বরং তিনি এক নতুন ঐক্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্যথায় আধুনিকরণের সঙ্গে পরিচয় করার বিষয়টি ছিল অনেকটা অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়ে। তিনি এক প্রকার যান্ত্রিকতার জায়গা থেকে আধুনিক সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। এই পদ্ধতিটি যান্ত্রিক হলেও তার উপাদান জাতি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুন তাকে তিনি স্বাভাবিক করে তুলতে পেরেছিলেন। সেকারণে অতি অল্প সময়ে ক্ষত্রিয় সমিতি রাজবংশীদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। অন্যদিকে বঙ্গের বাম শাসনে রাজবংশী সমাজের সংযুক্তকরণ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে আকস্মিকভাবে, দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে। ১. রাজবংশী সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের চলন ঘরণকে ধরে, ২. সমাজের একটি অংশের অভাব ও দারিদ্রতাকে নিয়ে।

প্রথমত: দৈনন্দিন জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে 'ভাষা' একটি অপরিহার্য উপাদান। রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষা বামপন্থীদের কাছে বাংলা ভাষার উপভাষা বলে মনে হয়েছে। বঙ্গের বাংলা ভাষাই সরকারি ভাষা। এই ভাষার বাইরে 'স্বতন্ত্র ভাষা' হিসাবে রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষাকে স্বীকার করে নেওয়ার বিষয়ে

তাদের আপত্তি ছিল। মনে করা হয় বাংলা ভাষা হল প্রগতিশীলতার প্রতিক। তার নিরিখে রাজবংশীদের প্রচলিত ভাষাকে পশ্চাৎপদ করে তুলেছেন। প্রগতিশীল এবং পশ্চাৎপদ এই ব্যবধানে রেখে রাজবংশীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার প্রয়াস আসলে একটা আর্থিক জায়গা থেকে বিষয়টি ভাবাতে শুরু করেন। আর্থিক জায়গাটি হল বাংলা ভাষা সরকারি ভাষা। কোর্ট কাছারির ভাষা। এ ভাষার প্রতি আগ্রহশীল হলে অর্থাৎ চাকরি তথা আর্থিক ভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরদিকে 'অন্যের' ভাষার উপর নিজের শাসন বজায় রাখার প্রয়াস রাখে। রাজবংশীদের প্রচলিত ভাষা যা আজকের দিনে রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষা বলে বিবেচিত হয়েছে তা ব্যবহার করলে আর্থিক সাফল্য আসার সম্ভবনা নেই বললে চলে। এমন ভাবনাই প্রকট হয়েছে বাম-মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার 'উত্তরের গল্পে'।[১৭] তিনি 'ভাটিয়া'দের (ভাটির দেশ থেকে আসা মানুষজন বিশেষত দেশভাগকে ধরে) সামনে রেখে আলোচনাটি শুরু করেছেন। অন্যদিকে রাজবংশীদের মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার সংগ্রামকে ধরে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন। এতে দেখা গেল গ্রাম ছেড়ে যদি শহর জীবনে রাজবংশীদের থাকতে হয় তাহলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্ট হয়। সংকটের জায়গাটি হল রাজবংশী ভাষা ও তার ব্যবহারিকতা নিয়ে। যা রাজবংশী ও ভাটিয়াদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করে। ভিন্নতার জায়গাটি হল উত্তরবঙ্গের শহরগুলি ভাটিয়াদের দ্বারাই অনেকটা পরিপাটিত। কলিন্দ্রনাথ বর্মণের 'উত্তরবঙ্গ দর্শন' নামক রাজবংশী কবিতাতেও তার প্রমাণ মেলে--

'কোচবিহার গেনু জলপাইগুড়ি গেনু
গেনু শিলিগুড়ি শহর।
ক্ষত্রিয় গেনার ভাই একটিও নাই।
শহরত শুধু দালান ঘর'।[১৮]

একই পরিসরে উত্তরের গ্রাম ও শহর যেন দুই গোলার্ধ যেখানে বিবতমান দুই শিবির নিজ নিজ স্থান আলাদা করে নিয়েছে এবং পরস্পর পরস্পরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে আক্রমানাত্বক মনভাব নিয়ে। শহরগুলি যে ভাটিয়াদের দ্বারা ঘিরে রয়েছে তার অনেকটা আলোচনা আমরা দেখতে পাই পার্থ চ্যাটার্জির লেখাতে।[১৯] তার মতে ১৯৮০র দশকের মধ্যে যে দু এক জন বর্ণহিন্দু গ্রামগঞ্জে ছিল তারা শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। আশির দশকের মধ্যে যদি বর্ণহিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে তাহলে গ্রাম নিম্নজাতির দ্বারা এবং শহর উচ্চবর্ণের দ্বারা নির্ধারিত হল। অর্থাৎ গ্রাম ও শহর দেশভাগ পরবর্তীতে দুই ভাগে বিভক্ত হল। এক অর্থে শহর ও গ্রামের পূর্ব পরিচিতি থেকে গেল স্বাধীন ভারতে। তার পরিবর্তন হল না। পরিবর্তন হল ভূমিজ প্রশ্নে। একই সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধের কমিউনিস্ট পার্টি লড়াই করল তারাই ফিরে এল রাজ-শাসনে। রংপুরের কৃষক নেতা লিখছেন-

> ‘কমরেড আমাদের বাঘের মুখে ফেলা হল। যার বিরুদ্ধে লড়াই করলাম তারাই এখন রাজা হয়ে বসল। যে জোতদার তেভাগার লড়াইয়ে দেশ ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন রাজা হয়ে ফিরে এল’।[২০]

অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যারা আন্দোলন করল তাদের কোন পরিবর্তন হল না। গ্রাম ছাড়ার পর জমির সঙ্গে আর বর্ণহিন্দুদের সেইভাবে সম্পর্ক থাকল না। এই শহরবাসীদের বিশেষত রিফিউজিদের দাবি নিয়ে যে আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাম-লিডাররা। দেশভাগ পরবর্তীতে বিশেষত ১৯৫১ সাল থেকে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন ও ভূমিসংস্কার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এই সূত্রে অনেকেই বিভিন্ন ভাবে জমি লুকিয়ে রাখতে শুরু করেছিল। অবশেষে ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালে যথাক্রমে জমিদারি উচ্ছেদ বা ভূমিসংস্কার আইন

তৈরি হয়। এর মধ্যে জমিদাররা অনেকখানি জমি নিজেদের মধ্যে বন্টন করেছে বা টাকার বিনিময়ে আমলনামা দিয়ে অন্যদের বন্দোবস্ত করে দিতে পেরেছে। আইনও তৈরি হল অনেক ফাঁকফোঁকর রেখেই, যথা ব্যক্তিভিত্তিক সিলিং ও অকৃষি জমি, জলাশয়, বাগিচা, দেবোত্তর পীরোত্তর হিসাবে যত খুশি জমি রাখার অধিকার দিয়েই আইন প্রণীত হল।[২১] ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালের জমিদারি উচ্ছেদ বা ভূমিসংস্কার আইন মোতাবেক যে জমি কারচুপি করার সুযোগ ছিল, সেই সুবিধা গ্রহণ করে অনেকে দেশভাগ পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিণত হল। এরাই পরবর্তীতে প্রবল সমর্থক হয়ে উঠেছিল জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য। এই সুবাদে বামপন্থীরা একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দিল যা তাদের সমর্থককে পরিণত হল। এদের কাছে জাতি বিষয়টি অনেকটাই আফছা বা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। তার পরিবর্তে সেখানে আধুনিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শের নিরিখে ভদ্রলোকের সংস্কৃতি উপস্থাপিত হল। সে সংস্কৃতির প্রধান মানদণ্ড হল আধুনিক শিক্ষা। এখানে শালীন ভাষা (polite language) ই হল একটা প্যারামিটার যার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হলে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এই চর্চাটাতেই সমগ্রকে নিয়ে আসার একটা সংগ্রাম করতে বাধ্য করিয়েছিলেন বামফ্রন্ট সরকার। সেই অর্থে এটি একমাত্র তাদের সাংস্কৃতিক লড়াই, কেননা জমি বা শিল্পে বামদের আশভারি প্রভাব লক্ষণীয় নয় বলে। 'অন্য'কে এর জন্য লড়াই করতে হয়েছে জেন্টেলম্যান হওয়ার জন্য। বাংলা ভাষাকে শালীন ভাষায় মর্যদা দেওয়ার জন্য অনেকসময় অবাঙালিদের (যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করেন) এই স্তরে নিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে।[২২] এর প্রভাবে সংস্কৃতিগত আদিপত্য বর্ণহিন্দুদের নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে বাংলা ভাষাকে আব্যশিক করা হল না। কারণটা তার বয়ানে দেখে নেওয়া যাক। তিনি লিখেছেন--

> 'one should note here that unlike many other states of India, there have been no serious attempts in West Bengal to impose a mandatary use of Bengali in secondary schools and universities; instruction is carry out in English, Hindi Urdu, Nepali, and other languages in both government and private schools and colleges. Possibly, this is an indication of the sturdiness and self-confidence of the hegemonic culture formation built by the upper-caste Hindu elite in West Bengal'.[২৩]

কলকাতা-কেন্দ্রিক এই আলোচনা এবং কতিপয় উচ্চবর্ণের সৃষ্ট এই সংস্কৃতির সঙ্গে অপরকে যুক্ত করার যে পরিবেশ বাম জমানায় রাজনীতির একটা কৌশল হয়ে উঠল তাতে বর্ণের যোগসাজুয্য নির্মাণ করল শ্রেণির এক নতুন জমানা। অর্থাৎ শ্রেণির প্রশ্নটি শুধুমাত্র আর অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয় হয়ে থাকল না, বর্ণকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হল এক নতুন ইতিহাস। সেই ইতিহাস বাম কমরেডদের (গ্রাম থেকে শহরতলি সমস্ত স্তরের) চোখে পর্টি বেঁধে যে ন্যায়শাস্ত্রের বুলি শিখিয়েছিল তারেই হুবাহু প্রতিফলন সমাজে পড়বে তা বলা যায়। দীনেশ ডাকুয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ভাষা, বঙ্গের মার্জিত ভাষা এই নিরিখে শহর ও শহরাঞ্চলে পরিবেশ রচিত হল। সেখানে রাজবংশীদের থাকাটা মনে হয় অনেকটা অনুপ্রবেশকারীর মত। এমত অবস্থায় শহরাঞ্চলে রাজবংশী ভাষার প্রচলন শুধু দেখা যায় না নয়, কথা বলাটাও যেন একটা ছোট লোকের গণ্ডি তৈরি করে দেয়। কারণ রাজবংশীরা এই ভাষাতে কথা বলতে অনেকেই রাজি নয়। শহারঞ্চলে এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল সেখানে কতিপয় রাজবংশীর উপস্থিতি দেখা যেত যারা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে লজ্জা বোধ করত।[২৪] এই বিব্রতবোধ জন্ম দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ভদ্রলোকের

মার্জিত ভাষাকে উপস্থাপন করে সমতার বিধানকে রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। অসমতা থেকে সমতায় পৌঁছনোর সংগ্রাম ও তার পারিসরিক রাজনীতিতে রাজবংশীদের সংযুক্তকরণ এক অর্থে রাজবংশীদের ভাষার প্রতি বিসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। কারণ তা যে ভদ্রচিত ভাষা নয়। বাম সরকার শুধু ভাষা কেড়ে নিল এমনটাও নয়, কিছুটা রাজবংশীরা ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক রাজবংশী জানে না তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। অর্থাৎ সচেতনার অভাব যেমন স্পষ্ট ছিল তেমনি প্রগতিশীলতার প্রতিক হিসাবে বাম নেতারা বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন সকালে আমার এক বন্ধু বলেছিল *‘এই তোরা আচ থেকে ‘মাউসা’ কইস না। ভাল একটা নাম বেরাইছে। এলা কওয়া খাইবে মেসো। কমরেড দেগড়ত আলাপ করির ধরছে কয়জনের সঙ্গে, তাই মুই শুনলুং’।* (গ্রামের কমরেড রাস্তার ধারে কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছেন। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলছিলেন আমরা যাকে মাউসা বলে থাকি, এখন ভাল ভাষায় (বাংলা) তাকে বলে ‘মেসো’। এই কথা শুনে এসে সে আমাদের শেখালেন আজ থেকে মাউসাকে মাউসা বলা যাবে না, মেসো বলতে হবে) এই সচেতনতার (অভাবের) সুযোগ নিয়ে রাজবংশীদের বাঙালি করার উদ্যোগের মধ্যে শ্রেণির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। সেখানে জাতির নিজস্বতা নয় বরং বামদের সৃষ্ট পরিমন্ডলে বাংলা ভাষার সঙ্গে ইংরাজিতে পরিপাটি হওয়া অতি আবশ্যক করে তোলার কথা ভাবাতে থাকেন। প্রয়োজনীতার নিরিখে ভাষার ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার কৌশল আদতে বাংলা ভাষার আদিপত্য বজায় রাখা। যেমন সার্বিক ইতিহাসের (Total History) জায়গা থেকে ইতিহাস ব্যাখ্যা করার উদ্যোগ

বাম আর্দশের সমার্থক বলে বিবেচিত হয় তারেই অনুপম নির্দশন দেখতে পাওয়া যায় দীনেশ ডাকুয়ার বয়ানে।

দ্বিতীয়ত: সমাজের অভাব অভিযোগকে প্রাধান্য দিয়ে রাজবংশীদের বিভক্তকরণ- এইভাবে দেখার আর একটি অভিপ্রায় রয়েছে বাম নেতৃত্বের। অভাবের কারণ বলতে গিয়ে সমাজের একটি অংশের সঙ্গে অপর অংশটির মধ্যে অসমতার ভাবনাকে সামনে রেখে একে অপরকে আক্রমানাত্বক করে তোলেন। মিত্র ও শত্রু এই দুই মানসিকতা এমনভাবে সহবস্থান করে তার নিরিখে সমাজকে ভাবিয়ে তোলার কৌশল রাজনীতিতে জায়গা পায়, নীতির প্রশ্নকে বাদ দিয়ে।

৪. দেশভাগ পরবর্তীতে ভূমিসংস্কার ও রাজবংশী সমাজের রূপান্তর

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, তেভাগা সংগ্রামের দাবিগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল। কংগ্রেস আমলে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ এবং ভূমিসংস্কার আইন পাশ হলেও বাম আমলে তার বাস্তবায়ন ঘটেছিল বলে অনেকেই মনে করেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বাম সরকার ক্ষমতায় আসার পরবর্তীতে (যদিও এই কার্যক্রম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় থেকে শুরু হয়) সমাজজীবনে রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছিল। যার প্রভাবের কথা সচরাচর শোনা যায় বঙ্গের বিভিন্ন রাজনীতির প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত বলা যায় উত্তরবঙ্গের স্থানীয়দের জমি হারানো বিষয়টি উক্ত ঘটনার বহিঃপ্রকাশ। যা রাজবংশীদের নতুন করে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। পঞ্চানন পরবর্তীতে স্বাধীনতা এবং দেশভাগ রাজবংশী জাতি রাজনীতির বিষয়টি মূলত জমি হারানো এবং নতুন মানুষদের উত্তরবঙ্গে বাসস্থান গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছিল। এই বিষয়ে বির্তকের পরিভাষা গবেষক থেকে আন্দোলনকারীদের প্রায় অনুরূপ। তবে বাম-নীতির প্রতি রাজবংশীদের অনৈক্য শাসনের শুরুর থেকে আরাম্ভ হয়েছিল। এই

অনৈক্যতার প্রকাশ শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গের বহু প্রচলিত পুরানো রীতিকে উৎখাত করে বঙ্গের রাজনীতির প্রসরতাকে কেন্দ্র করে। পুরানো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হলেও তার জায়গায় এমনকি 'বিকল্প ব্যবস্থা' উপস্থাপিত করেছিলেন বামপন্থীরা ? যা তৈরি করা হয়েছিল তার সঙ্গে স্থানীয়দের যোগসূত্র কোথায় ? তার আলোচনা বুঝতে সাহায্য করবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অর্থাৎ নব-নির্মাণ পর্বে বামপন্থা নীতি কতটা সাধারণ মানুষের সহায়ক হয়ে উঠেছিল ?

প্রচলিত সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের বার্তা সামনে রেখে সংগ্রাম পরিচালনার দাবি করেছিলেন বামপন্থীরা। মূলত চাষির রাজনৈতিক চেতনাকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব নিয়েছিল বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যারা বাবু সংস্কৃতির ধারকও বটে। চাষি এবং শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের এই কথোপকথন শুরু হয়েছিল ১৯৩০র দশকের শেষ দিকে। বাম সংগঠন প্রতিষ্ঠার তাগিদে বাম কমরেডদের গ্রামে গিয়ে থাকার সময়কালে উভয় উভয়ের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিল। নতুন করে বেঁচে থাকার আনন্দ বিশেষ করে কমরেডদের নম্রতা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ বা নেতা হয়ে ওঠার জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন[২৫] তা করতে যেমন কমরেডদের অনুপ্রাণিত করেছিল তেমনি নতুন জনপদের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার মত মানসিকতা তৈরি করা এবং চাষিদের সঙ্গে জীবন কাটানো বাম নেতাদের মধ্যে মহানুভবতার জন্ম দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কোথাও যেন চাষির জীবনের সঙ্গে তারা নিজেদের এক করে নিতে পারেনি। কেননা, জীবন সংগ্রামের শেষে এসে কমরেডদের বলতে শোনা গেছে 'কত কষ্টের না সে জীবন ছিল'।[২৬] অর্থাৎ ত্যাগ, তিতিক্ষা, বিনয়ী এই এপিয়ারেন্স নিয়ে কমরেডদের আবির্ভাব ঘটেছিল গ্রাম সমাজে। সংগঠনের প্রারম্ভিক পর্বে যদি এই অভিব্যক্তি ওঠে আসে

তাহলে কতটা কৃষকদের সঙ্গে নেতৃত্বের যুক্ত করা যায় সে বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। অনুরূপ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় উত্তরের ফরওয়ার্ড ব্লক দলে নেতা ও মন্ত্রী অমর রায় প্রধানের আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন --

> "ছোটবেলায় দেখেছি জমির ধান কেটে আমাদের বাড়ির খোলানে সারি সারি করে ধানের পুঞ্জি দিত। তারপর মাঘ মাসে প্রথম দিকে খোলানে ধানের পুঞ্জি থেকে ধানের আঁটিগুলিকে ৯-১০ ফুট জায়গায় গোল করে ছড়িয়ে দেওয়া হত। তারপর ৫-৬ টি গরুকে গলায় দড়ি লাগিয়ে একজন কৃষক সেই ছড়িয়ে দেওয়া ধানগুলির উপর দিয়ে ঘোরাতে থাকত। ৩-৪ ঘন্টা পর খড় থেকে ধান আলাদা হয়ে গেলে দশ লরি বাঁশের ঢাকি দিয়ে মেপে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করা হত। অর্ধেক কৃষক বাড়ি নিয়ে যেত। আর অর্ধেক জন্মগত ভাবে চাষের জমির মালিক হওয়ার কারণে চাষ আবাদ না করেও, শ্রম না দিয়েও আমরা পেতাম। এসব কৃষকদের বলা হত আধিয়ার। এটাকে ধরে নিত স্বাভাবিক নিয়ম। 'চোখ বাঁধা কলুর বলদের' মত এইসব সহজ সরল মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেনি। কৃষক জাগরণের জন্য হরিপুরা কংগ্রেসের ডাক, স্বামী সহজানন্দের আহ্বান, 'লাঙ্গল যার জমি তার' স্বাধীন বুনিয়াদ আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির তেভাগা আন্দোলন কোন কিছুতেই এরা প্রতিবাদের ঝড় তুলতে পারেনি। এইসব হতভাগ্য গরিব কৃষক শুধুমাত্র নিজের কপালকেই দোষ দিয়ে নীরবে নিভৃতে নিঃশব্দে মৃত্য পদযাত্রী হয়েছে"।[২৭]

অন্যদিকে জমিদার শ্রেণির বিনাশের কথা উঠে আসলেও রাজবংশীরা জমিদার জোতদারদের বিনাশের কথা ভাবতে পারেনি। তার চিহ্ন তেভাগা পর্বে নেই। অথচ বাম সরকার ক্ষমতায় এসে জমিদারি বা জোতদারি ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিলেন। ফলে রাজবংশী কৃষকরা এই বিষয়টি কীভাবে নিয়েছিলেন এবং তার প্রতিক্রিয়াকে কীভাবে সরকার প্রতিরোধ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা করবে এই অধ্যায়টি। এই দুই প্রতিরোধ মুখোমুখি দাঁড়ালে তার থেকে সৃষ্ট পরিসর কীভাবে রাজবংশী জগৎতের বাইরে

উপস্থাপিত হয়েছিল? সেই সঙ্গে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজবংশী কৃষকরা তেভাগা সংগ্রামে জঙ্গি রূপ নিয়েছিলেন, মুসলিম কৃষকরা নয়।[২৮] সেই অর্থে তেভাগা সংগ্রামে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ছিল অগ্রণী ভূমিকায়। অথচ বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজবংশীরা সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল এর জটিলতার জায়গাটি বুঝতে সাহায্য করবে আমাদের অধ্যায়টি। অপরদিকে তেভাগার সংগ্রামে কৃষকদের উদ্দীপনাকে 'জঙ্গি' বলে বিবেচিত করলেও রাজবংশীদের দ্বারা কোন হিংসাত্বক ঘটনা সেভাবে লক্ষ করা যায়নি। কৃষকরা তাহলে কাদের বিরদ্ধে লড়তে গিয়েছিল ? সে প্রশ্নটির উত্তর কিছুটা বোঝা যাবে আলোচ্য অংশের আলোচনায়। এমনকি রাজবংশীরা পুলিশের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার তাগিদে তার বন্ধুক কেড়ে নিয়েছিলেন। সে বন্ধুক ত পুলিশের ক্ষতি করেনি। বন্ধুক কেড়ে নিয়ে পুকুরে বা ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবে বামপন্থীরা কীভাবে কৃষকদের মধ্যে জঙ্গি রূপ দেখতে পেয়েছিলেন ? এই স্ববিরোধী জিজ্ঞাসাগুলির নিরিখে আমাদের আলোচ্য অধ্যায়টি উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে বাম রাজনীতির প্রসরতা ও ব্যপ্তির জায়গাটি লক্ষ রাখবে।

বাম-শাসনের দীর্ঘ রাজনীতির পর্বে জাতি সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে রাজবংশীরা ব্যতিক্রম নয়। একারণে জাতিগত উপাদান বাদ দিয়ে শ্রেণির ধারণা প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আন্দ্রে বেতে মনে করেন।[২৯] অর্থাৎ শ্রেণি প্রশ্নটি অর্থনৈতিক বিষয় হলেও তার অনুধাবন প্রচলিত সমাজ কাঠামোর জায়গা থেকে আমরা প্রাপ্ত করি। সমাজ সংস্কৃতির মৌলিকতা যেমন বঙ্গের জাতি ব্যবস্থার একটি বিষয় তার অনুসন্ধান ব্যতিত দ্বন্ধমূলক সমাজের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা একপ্রকার সম্ভব নয় বলে মনে করেন আন্দ্রে বেতে। সেই অর্থে বাম কর্মসূচিতে

রাজবংশী সমাজের কথা উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে কীভাবে উঠে এসেছে ? পূর্বের অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রচলিত কৃষক সমাজের সঙ্গে জোতদারদের অনেকক্ষেত্রে মিল ছিল। স্থানভেদে প্রকরতা থাকা সত্ত্বেও রাজবংশী জমিদার, জোতদার, কৃষক এবং প্রজার যৌথতার নিরিখে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে নির্মিত হয়েছে অভিন্নতার কাঠামোতে যা 'Ethnic identity'র অনুরূপ। এদের থেকে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জমিদারদের পার্থক্য স্পষ্ট।[৩০] কেননা, বাঙালি হিন্দুরা বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গে এসেছেন প্রশাসনিক কাজে। প্রথম পর্বে কেরানি, ছোটখাট অফিসার, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক, ঠিকাদার ও খুচরো ব্যবসায়ী হিসাবে এরা এসেছেন। এদের মধ্যে পরে অনেকে বড়, মাঝারি বা ছোট জোতদার হয়েছেন। ব্রিটিশ আমলে বা তার পরের জমানায় বাঙালি ভদ্রলোকেরা জোতমালিক হয়েছিল নানান কুৎসিত উপায়ে, দেশজ মানুষের জনজাতিসুলভ সরলতার সুযোগ নিয়ে।[৩১] বৈকুণ্ঠপুরের দিকে তাকালে অনুরূপ চিত্র লক্ষ করা যায়। এখানে রাজ আমল থেকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বসতি দেখা যায়। এরা প্রায় সকলে জোতদার এবং জোতের লোভেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছে। এখানে মুসলমানদের মধ্যে অনেক সমৃদ্ধশালী পরিবার দেখা যায়। রাজবংশী এবং মুসলমানদের মধ্যে কোন হিংসার চিহ্ন নেই। এমনকি এক বাড়িতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরে রাজবংশী ও মুসলমান বাস করতে দেখা গেছে।[৩২] এখানকার লোকেরা স্বচ্ছন্দচিত্ত এবং নিজেকে বিলক্ষণ সুখি মানুষ বলে মনে করেন। কারণ জীবন ধারনের জন্য যেটুক প্রয়োজন তা তারা অনায়াসে লাভ করেছিলেন। তার অধিক প্রত্যাশা করেননি।[৩৩] সেই নিরিখে রাজবংশী সমাজ আত্মীয়তার বা বন্ধুসুলভ সূত্রে গ্রথিত যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। হয়তো এই কারণে জোতদার বা জমিদারদের উপর তেভাগা আন্দোলনে আক্রমনের কোন

চিহ্ন নেই। তবে জোতদার বা জমিদারদের কাছ থেকে জমি পাওয়ার আশা বাম নেতাদের কাছাকাছি থাকতে প্রজাদের উদ্বেলিত করেছিল। কারণ একদিকে প্রজাকে জমির পাট্টা করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস এবং উৎপন্ন ফসলের ৭৫% কৃষক আর ২৫% জোতদারের দাবি থাকবে যা প্রজার অভাব অনটনের দিন শেষ হয়ে যাওয়ার একটা স্বপ্নময় জীবনে আশা সঞ্চার করেছিল। প্রজাকে, জোতদার বা গিরির কাছে আর হাত পাততে হবে না যদি উপরিউক্ত দাবি পূরণ হয়। এমনি একটা বার্তা গ্রামগঞ্জে সে সময় প্রচারিত হয়েছিল বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের নীতি সেসময় সাধারণ মানুষকে বেশ অসুবিধেয় ফেলে দিয়েছিল। কংগ্রেসের লেভি আইন মোতাবেগ কোন কৃষক অতিরিক্ত ফসল ঘরে রাখতে পারত না। অতিরিক্ত শষ্য আদায় করার জন্য সরকারি অফিসাররা ধানের গোলা অভিযান করার সময় জুতো-মোজা পরে পবিত্র গোলায় পা দেওয়াটা কৃষক থেকে জোতদার কেউই ভালোভাবে নেয়নি। ফলে গ্রামের কৃষক, শ্রমিক এমনকি জোতদারদের একটি অংশ কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন।[৩৪] রাজবংশীদের অর্থকরী ফসলের মধ্যে তামাক চাষের নাম উল্লেখ করতে হয়। কংগ্রেসি আমলে তামাক চাষের জন্য লাইসেন্স বা সরকারের আদেশ নামার প্রয়োজন ছিল। কৃষকদের এটা একটা বড় সমস্যা ছিল। তার উপর কৃষক কতটা জমিতে চাষ করবে তার আগাম আনুমানিক হিসেব সরকারকে দিতে হত, জমি ও ফসলের। যদি কোন কারণে সেই অনুমানের তুলনায় চাষ ভালো হয় তাহলে অতিরিক্ত ফসল বিক্রি করার উপায় থাকত না। এই অসুবিধেগুলোর থেকে রেহাই পেতে একটা সময় গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছিল এবার *'ভোটে আন্ধুনি পাল্টের নাগিবে'* (নতুন সরকার আনা দরকার)।[৩৫] বাম সরকার গঠনে উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও অনান্য কারণগুলির মধ্য একটি হল কংগ্রেস জমানায়

রাজনীতি বলতে বোঝাত জমিদার বা জোতদারদের সেখানে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যেত না। সেই অর্থে বাম জমানায় সাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা বাম আর্দশের অনুসারী ছিল। সেকারণে সহজে অনেকেই রাজনীতিতে সঙ্গে যুক্ত হতে পারত। এই সুবিধে থাকা সত্বেও রাজবংশীরা খুব একটা রাজনীতি পরিসরে না এসে বরং 'ডারিঘরে' বসে গান বাজনা বা আড্ডা দিতে সাচ্ছন্দবোধ করতেন।[৩৬] কেননা কোচবিহার রাজতন্ত্রের দেশ, সেখানে রাজনীতির পরিমণ্ডল সেভাবে তৈরি হয়নি। যাইহোক, বাম আমলে কি উপায়ে জমি বন্টন হয়েছে কিংবা কারা নতুন করে জমি পেয়েছে সে বিষয়ে আলোচনায় না গিয়েও দেখা যায় বামপন্থী নেতাদের লেখায় ভূমিহীন কৃষক এবং গরীব মানুষ জমি পেয়েছিলেন।[৩৭] এই সকল গরীব মানুষদের সিংহ ভাগই ছিল রাজবংশী, ভাটিয়া, নমশূদ্র, আদিবাসী ও নেপালি কৃষক।[৩৮] যদিও সাক্ষাৎকারে দেখা যায় রাজবংশীদের তুলনায় অরাজবংশীরা বেশি জমি পেয়েছেন। কারণ রাজবংশীরা রাজনীতিতে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ না করায় অনান্যরা এর সুবিধে ভোগ করেছিল।[৩৯] তবে যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্টের জঙ্গি ভূমি দখল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে পুরনো ভাটিয়া, নয়া পূর্ব পাকিস্থানগত উদ্বাস্তু এবং নেপাল থেকে আগত নেপালিরা। খাস জমি দখলের সুযোগও এরাই বেশি নিয়েছিল। তুলনায় রাজবংশী ভূমিহীন কৃষক সেরূপ সুযোগ পায়নি।[৪০] রজ মালিক মনে করেন--

> 'The poorest bargadars are mostly from the scheduled castes and tribes who have never been able to form an effective organization of their own, and have generally been the ones left out of the barga-recording program due to fear and dependence on the propertied classes'.[৪১]

তবে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের লক্ষ ছিল --

> রায়তের জমি রাখার উর্দ্ধসীমা নির্ধারণ ও উর্দ্ধসীমা বর্হিভূত জমি সরকারে ন্যস্তকরণ, ন্যস্তকরণ জমি বন্টন, বর্গাদার নথিভুক্তি ও বর্গাদারকে চাষের নিশ্চয়তা প্রদান, ভূমিহীন খেতমজুর, মৎস্যজীবী ও গ্রামীন কারিগরদের ৮ শতক তথা ৫ কাঠা পর্যন্ত ন্যস্ত জমিতে স্বত্ব প্রদান, ভূমিসংস্কারে সুবিধা প্রাপক ও প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং রেকর্ড অব রাইট হালতক করা।[৪২]

এই লক্ষকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টি দফায় দফায় ক্ষমতায় গিয়ে বেশ কয়েক লক্ষ জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন এবং অপরাপর ছোটখাট সংস্কারের কাজ করে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাদের দ্বারা কৃষক জনগণের কর্মসংস্থান এবং জীবন জীবিকার কোন মৌলিক সমস্যা সমাধান হয়নি বলে অনেকে মনে করেন।[৪৩] ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ১২,৭৯,৯৪০ জনকে ভাগচাষি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তার মধ্যে তপশিলি জাতি ৩,৭৬,৯০৭ জন এবং আদিবাসী ১,৫৫,৭১৫ জন। আবার বলা হয়েছে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ১,৭৫,৯৪৩ জন খেতমজুর, কারিগর, মৎস্যজীবীকে বাস্তুজমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে।[৪৪] তা সত্ত্বেও জীবিকা ও কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা হয়নি বরং প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিয়ে নিজেরদের ক্ষমতাকে হাজির করেছে। নিচের বয়ানটিতে তার প্রমাণ মিলবে--

> 'বামজমানায় ছোট, মেজ, বড় মনসবদারদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে বুথের দায়িত্ব। ভোটের রাজনীতিকে আশ্রয় করে বিরোধী শূন্যতার দলীয় কর্তব্য কঠোরভাবে পালিত হয়েছে ঊনত্রিশ বছর জুড়ে। অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বুথে মনোনয়ন দাখিল করতে পারিনি গ্রামের পর গ্রাম। এই অসহায় গ্রামীন জনতা

> যারা সহজ, সরল, ধর্মভীরু, মানবিক বোধ সম্পন্ন সৎ গৃহস্থ ছিল (রাজবংশী) – বাম রাজনীতির পেষণে, ধর্ষনে, শোষণে, শাসনে ও অত্যাচারে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বৌ ছেলেমেয়ের হাত ধরে চলে গেছে রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লী, আসাম, যথার্থ সর্বহারা এই মানুষগুলির কাছে পঞ্চায়েত মানে দুঃস্বপ্ন'।[৪৫]

৪.১. জাতিগত ভাবনা রাজবংশীদের বাম-রাজনীতিতে যুক্ত করে

রাজবংশী সমাজ কাঠামোর দিকে লক্ষ রাখলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় 'দেওয়ানি প্রথা'র প্রভাব। সমাজ পরিচালনায় যা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করত। দেওয়ানির নির্দেশিত পথে পরিচালিত হত সমাজ। 'বহু কণ্ঠস্বর' এর পরিবর্তে একক প্রভাব দেওয়ানির চরিত্রে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। দেওয়ানির প্রতি সমষ্টির এই অনুমোদন - যাকে জমিদারি প্রথা বা জোতদারি প্রথা কিংবা স্বাধীন কৃষক বা দেওয়ানি যে নামেই বলি না কেন – তার প্রজামণ্ডলে সীমায়িত হলেও সামগ্রিক বিচারে তার কতগুলো 'কমন দিক' (Common way) এই গ্রুপগুলিতে স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ কতগুলো দল বা উপদলে (Groups and its sub group) বিভক্ত যা এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি করেছে। পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি বরং একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে পরিবার থেকেও কোথাও যেন পরিবার নেই, সমাজেই তার নিদর্শন। 'রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আড্ডা'তে (caste council) বয়স্ক ব্যক্তিসমূহের অনুতাপের একটি বিষয় হল--

> আজকের ছেলেপুলেরা বয়স্কদের মানতে চায় না। অথচ একসময় (বয়স্ক ব্যক্তিসমূহ) দেখেছি, যে কোন বাড়ির ছেলেপুলেদের শাসন করার অধিকার সমাজের যে কোন বয়স্ক ব্যক্তিদের ছিল। কুকর্মের হাত থেকে তাদের সবসময় বিরত থাকার প্রচেষ্ঠা করত। ছেলেপুলেরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত।[৪৬]

সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিসমূহের এই সভাকে *'দশের সভা'* বলা হয়। এখনো কোথাও কোথাও এই সভার অস্তিত্ব রাজবংশী সমাজে লক্ষণীয়। ফলত এক একটি গ্রুপে দেওয়ানিদের নিয়ন্ত্রণ বা অন্য গ্রুপের রাজবংশী দেওয়ানিদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকত যা দিয়েই সমগ্র সমাজকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। সেদিক থেকে রাজবংশী পরিচিতি দেওয়ার এটি একটি প্রক্রিয়া হলেও গ্রুপগুলির ভিন্নতা আলোচ্য গবেষণার স্বল্প পরিসরের আলোচনায় উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। অনুপূর্বের অধ্যায়গুলোতে সেরকম কিছু দৃষ্টান্তের কথা অনুচ্চারিতের মধ্যে রাজবংশী প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরে দেওয়ানির কর্তৃত্ব উক্ত গ্রুপগুলিতে যে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে বাম নেতৃত্বের স্পষ্ট ধারণা ছিল। সেকারণে নেতারা আন্দোলনের প্রথমার্ধে দেওয়ানিদের আন্দোলনে সংযুক্ত করতে বেশ উদ্যোগী ছিলেন। শ্রেণির ধারণা স্থাপিত করতে বাম নেতৃত্বের ভূমিকা এক্ষেত্রে একই সঙ্গে দেওয়ানি ও তার প্রজাকে সামিল করতে বেশ সমর্থ হয়েছিল। কিংবা এমনও হতে পারে বাম আর্দশের সঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য রাজবংশীরা নিজেরাই উদ্যোগী ছিল। কেননা, চক্রাকারে[৪৭] জাতি প্রতিরোধের যে দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় তাতে বাম-রাজনীতিতে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অনেকটা বলা যায় এই স্বতঃস্ফূর্ততা পরীক্ষামূলক (Experimental)। জাতি তার পরিসরে সবসময় চেষ্টা করে কীভাবে নতুন পথের সন্ধান করা যায়। জাতি অস্তিত্বের প্রশ্নে তার গতিপথে 'অন্যের' উপস্থিতি দেখলে তাকে আত্তীকরণ করে নেওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলত বামদের নির্দেশিত জীবনরেখা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হলে রাজবংশীদের একটা বাড়তি সুবিধে হয়েছিল এই নতুন পথের অভিজ্ঞতা নিতে। সেই অর্থে বামেদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ছিল 'ইচ্ছা প্রণোদিত'। জাতির ব্যবস্থার মধ্যে এটিই হল একটি রূপরেখা যা তার স্বাধীনতার

ধারণাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কিংবা বামেদের আর্বিভাব ঘটলে জাতি তার কর্তৃত্বের প্রশ্নে নিজের নিয়ন্ত্রণের বামেদের নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে রাজবংশীদের সঙ্গে একাত্ব হয়ে জাতির পরিধি বিস্তৃত করেছে। যেমন মোরঙ্গরা নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দিলেও সরকারি সুযোগ সুবিধে থেকে অনেকদিন বঞ্চিত ছিল। বাংলা-নেপাল সীমান্তে মেচি নদীর ওপারে নেপালের একটি ছোট্ট জায়গার নাম মোরঙ্গ। ওখানকার অধিবাসীদের রাজবংশীরা বলে মোরঙ্গিয়া। একসময় কোচবিহার মহারাজার অধীনে এরা চলে আসে। বলা হয় নেপাল রাজা সেনা হিসাবে এদের উপহার দিয়েছিলেন কোচবিহার রাজকে। সেই থেকে এরা কোচবিহারে থেকে যায় এবং রাজবংশী সংস্কৃতিকে ঘিরে জীবন পরিচালিত হয়। এদের সরকারি ভাবে রাজবংশী পরিচয়ে পরিচিত করেন দীনেশ ডাকুয়া।[৪৮] এমনকি রাজবংশী জাতি আন্দোলনের দিকে তাকালে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় মুসলিম, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা এবং গোর্খাদের দেখতে পাওয়া যায়।[৪৯] এদের সংযুক্ত করে অর্থাৎ নিজেদের অধীনে আনার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। অর্থাৎ অন্য গোষ্ঠীকে নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা জাতির আর একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। সেই জায়গা থেকে বাম নেতাদের রাজবংশীরা নিজেদের অভ্যন্তরে আনার জন্য ওদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলতে পারে। তবে সমতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আহবান এবং পরিশেষে সমবায় কেন্দ্রিক জীবনচর্চার ডাক রাজবংশীদের কাছে কোন নতুন জীবন দর্শন ছিল না। রাজবংশীদের প্রচলিত জীবন ধারা ছিল প্রায় অনুরূপ। চারুচন্দ্র স্যান্যাল রাজবংশী সমাজ কাঠামো এবং তার সামাজিক সম্পর্ককে উল্লেখ করেছেন *'সমবায় রূপে গ্রাম যখন কাজ করে'*।[৫০] দলবেঁধে শিকার করার সময়, অল্পজলে সবাই মিলে মাছ ধরার

সময়, বিবাহে, শ্মশানযাত্রায় এমনকি কৃষিকাজে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে ‘হাউলি’ প্রথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা তিনি সমবায় প্রথার অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। ফলত যে জাতি এই সামাজিক অভ্যাসের জায়গা থেকে সমাজ পরিচালনার অনুশীলন করেছিলেন, সে যদি জানতে পারে তা দিয়ে নতুন জগত রচনা করা যায় তাহলে বাম-কর্মীদের সঙ্গে রাজবংশীর সংযুক্তকরণ হওয়ার বিষয়টি ছিল সহজতর। তবে অনেকে ধারণা প্রসন করেন বামেদের সঙ্গে রাজবংশীদের এই সংযুক্তিকরণ পুরানো সমাজে চির ধরাতে সাহায্য করে। কেননা বাম-কর্মীদের ধারণা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও তার পোষক জমিদার এই দুইয়ের উৎপাটন সম্ভব হলে সমাজ শোষণ মুক্ত হবে, এই ধারণাকে কার্যকরি রূপ দিতে সুবিধে হয়েছিল ৭৭র পর সরকার ক্ষমতায় আসিন হলে। এখানে বামেদের আদর্শের সঙ্গে রাজবংশী সমবায়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। রাজবংশী সমাজ জমিদার, জোতদার, কৃষক, বা প্রজা সম্বলিত একটি স্বয়ং সম্পন্ন সমাজ। সেখানে এক ধরনের সমবায় ভিত্তিক সমাজ দেখা যায়। আর বামেদের চিন্তাভাবনাতে দেখা গেল জমিদাররাই সমাজের অন্বিষ্ট যার উৎপাটন সম্ভব হলে সমতার বিধান পালিত হবে। একই সঙ্গে বাম বয়ানে দেখা যায় রাজবংশী সমাজে অভাব অভিযোগ কথা। সেই অভাব থেকে মুক্তি পেতে রাজবংশীরা নিজেরাই তার উপায় খুঁজে নিয়েছিল। রাজবংশীর সম্পত্তি ধারণা এবং ন্যুনতম চাহিদা এই দুইয়েই কোথাও যেন নির্লিপ্ত জীবনকে অঙ্গিকার করে। তাদের কাছে অভাবের বিষয়টি ছিল একপ্রকার স্বাভাবিক একটা ঘটনা। এজন্য কাউকে দোষারূপ না দিয়ে নিজের কপালের বা ভাগ্যের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে জীবন মেনে নিয়েছেন বলে অমর রায় প্রধান মনে করেন। অমর রায় প্রধানের উপরিউক্ত বয়ানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। সেই অভাবকে হাতিয়ার করে বাম

সমবায়ের স্বপ্ন রাজবংশীদের যে অনুপ্রাণিত করেছিল তা বলা যায়। এইভাবে উত্তরবঙ্গে বাম সরকার প্রতিষ্টিত হল এবং এতে পুরানো ব্যবস্থাও ধসে পড়ল কিন্তু নতুন সমাজ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তার পরিকল্পনা না থাকায় উত্তরবঙ্গের সমাজব্যবস্থা কীভাবে ভেঙ্গে গেল তার কয়েকটি উদাহরণ অবতারণ করলে বোঝা যাবে বাম শাসনের নতুন সমাজব্যবস্থা এবং অভিপ্রায়কে।

৪.২. জমি বন্টন ও রাজবংশী সমাজ: প্রজা থেকে শ্রমিক শ্রেণির উত্থান

প্রথমত: জমিদারি এবং প্রজার ধারণা সমন্বিত উত্তরবঙ্গের সমাজ জমিসংস্কার ব্যবস্থায় উঠে গেলেও তাদের পুরানো ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা টিকে ছিল। কেননা, পুরানো ব্যবস্থার জায়গায় কোন 'বিকল্প ব্যবস্থা' বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অন্যথায় কোথাও কোথাও গিরি ও প্রজার মধ্যে জমি বণ্টনকে কেন্দ্র করে একটা বোঝাপড়া শুরু হয়েছিল। অনেক জোতদারেই আপোষের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে জমি বন্টন করে নিয়েছিলেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় অনেক জোতদার তাঁর প্রজাকে যে জমি চাষ করতে দিয়েছিল তার অর্ধেক জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়। আর বাকি অর্ধেক জমি প্রজা গিরিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৫১] এমনকি রেজিস্ট্রির অর্ধেক খরচও জমির মালিক সেরে দিয়েছিল।[৫২] এর ফলে প্রজা ও গিরির সম্পর্ক প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকল। এমনও হতে দেখা গেছে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগেই একটা বিরাট অঙ্কের জমি বন্টন হয়েছে। রাজস্ব বোর্ডের মতে, ১৯৮২ সালে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৭.৫ লাখ একক জমি ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। অন্যদিকে ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিধানসভায় উত্তর দিচ্ছেন ১৯৭৭র ২১শে জুন থেকে ১৯৮২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ১.২ লাখ জমি বিতরণ করেছেন। তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে ৬ লাখের অধিক একর ভেস্ট জমি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত

হওয়ার পূর্বেই বন্টন করা হয়েছে।[৫৩] অর্থাৎ জোতদার ও প্রজার মধ্যে জমি বন্টনের বিষয়টি সবসময় বিরোধাত্বক এমনটা বলা যায় না। এবং একই সঙ্গে বলা যায় বাম সরকার যেমনটা জমি বন্টনে নিজের সাফল্যকে দেখাতে চেয়েছেন, মনে হয় তা অনেকটাই অতিরঞ্জিত।

দ্বিতীয়ত: মন ও মানসিকতায় তারা জমিদার, জোতদার বা প্রজা ধারণাকে বহন করত। কিন্তু সকলকে জমির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ায় জমিদার মুক্ত সমাজ কাঠামোর একটা আভাস ফুটে ওঠেছিল। তবে তার ভিত্তি বা কাঠামোটি কীভাবে পরিচালিত হবে সে পথে ঠিকানা না থাকায় একটা বিভ্রান্তি স্বভাবতই জন্ম নিয়েছিল। এই অগছল পরিবেশে প্রজাদের অনেকে জমি পেয়ে স্বাধীন মনে করলেও এতদিন সে কাজ করেছিল গিরির অধীনে। অধীনতার জায়গা থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন নতুনত্বের সন্ধান করা যায় না। কেননা, জমি পাওয়ার বিষয়টি প্রজার কাছে গর্বের ছিল কিন্তু তাকে কি করে টিকিয়ে রাখতে হবে তার কৌশল জানা ছিল না। এতদিন গিরি বা দেওয়ানি যা শিখিয়ে দিয়েছিল তারা তার অনুকরণ করত মাত্র। এখন এই দায়িত্ব নিজেকে পালন করতে হয় এবং পালন করার সক্ষমতা থাকলেও অর্থনৈতিক জটিলতা সেক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বলা যেতে পারে। বর্গার নিয়মে প্রাপ্ত জমিতে প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা নতুন ইতিহাস হলেও উক্ত জমি চাষ করার জন্য যে উপকরণ দরকার তা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়নি যদিও তা প্রদানের অঙ্গিকার সরকার করেছিল। উক্ত উপকরণের অভাব এবং জমি চাষ করার পরিকল্পনা না থাকায় প্রজা জমি পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। অন্যথায় রাজবংশী সমাজে প্রবাদ আছে *‘পরের ধন ফাঁককেতে পেলে ফেক্কতে খায়’* অর্থাৎ সহজে কোন কিছু পেলে তার মূল্য হয় না।[৫৪] পরের

ধনকে নিজের সম্পত্তি করে নিতেও একটা আপত্তির জায়গা সৃষ্টি হয় বলে মনে হয়। অপরের সম্পত্তিকে লুট করে নেওয়ার কোন নজীর তেভাগা পর্বে নেই। অথচ সুযোগ ছিল। যাইহোক, জমির মালিক হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়াটি প্রজার জীবনকে প্রকৃত অর্থে এবার নির্মাণ করল শ্রমের রাজনীতির নিরিখে। যদিও এরিল্ড এঙ্গেলসেন রুড মনে করেন প্রজাদের জমি বন্টনের পর যে সমতার ধারণা তৈরি হয়েছিল, এই মুহূত্বকে আলোচনার প্রধান বিষয় করে তিনি দেখাতে চাইছেন প্রজা জমি পাওয়ার পরেই এক ধরনের ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন। সেই ক্ষমতার সঙ্গে উন্নয়নের প্রশ্ন সমাজকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। সেই পরিবর্তিত কাঠামোতে জাতি ব্যবস্থার অস্তিত্ব আর থাকছে না বলে অভিমত প্রকাশ করে। তার মতে জাতি ব্যবস্থার কাঠামোটি ‘রাজার’ মত। রাজা যেমন তার ভৌগলিক পরিসরে প্রজার জীবন রক্ষা করে এবং বিনিময়ে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে নিঃশর্তভাবে জাতির সেবা আদায় করে।[৫৫] অর্থাৎ একটা বিনিময় প্রথা জাতি ব্যবস্থাকে সঞ্চালিত করে। জাতি ব্যবস্থার এই লেনদেন বাম সরকারের জমি বন্টনের সময় থেকে বাড়তে থাকে। সেখানে জাতি বিষয়টি প্রাধান্য না পেয়ে বরং ক্ষমতা এবং সম্পত্তির ধারণা প্রধান মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। শ্রমের মধ্যে কীভাবে রাজবংশীদের যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে সেদিকে আলোচনা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেখা গেল জমি চাষির দখলে আসার পর তিনি জমি চাষ করতে পারলেন না উপকরণের অভাবে।[৫৬] অথবা এমন জমি প্রদান করা হয়েছে তা চাষ যোগ্য নয়। অন্যদিকে প্রজা, দেওয়ানির কাছ থেকে এত দিন ধরে যেভাবে পরামর্শ বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা[৫৭] পেয়ে এসেছিলেন এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা দূরত্ব এনে দিয়েছিল বাম-রাজনীতি। এই দূরত্বের মধ্যে দেওয়ানির জমির মালিক হয়ে বসলেন তার প্রজা। ফলত সম্পর্কটা শত্রু ভাবাপন্ন না হলেও একটা সন্দেহ তৈরি

হয়েছিল। এই অবস্থাতে প্রজাকে জমি বিক্রি[৫৮] বা বন্ধক[৫৯] রাখতে হয়েছে চাষের উপকরণ না থাকায় কারণে। এমনও হতে পারে ১৯৭৭ সালের পর এইসব অঞ্চলে ভূমিসংস্কার ও বর্গা অপারেশন সফলভাবে রূপায়িত হলেও বড় একটা অংশের কৃষক এই নতুন ব্যবস্থার পরম্পরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৬০] যাইহোক, প্রজার জমি থেকেও আর জমি থাকছে না। উপায়ন্ত হারিয়ে সে বাধ্য হচ্ছে দিন মজুরি শ্রমিকে পরিণত হতে। সত্তরের দশকে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতের কৃষকরা দ্রুতগতিতে জমি হারাচ্ছেন ও ভূমিহীন হয়ে কাজের অভাবে বেকার ও অর্ধ-বেকারে পরিণত হয়েছেন।[৬১] বাস্তবে, প্রজা থেকে মজুরি শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ঘটনা বোধহয় রাজবংশীদের শ্রমের মূল্যের ধারণার সঙ্গে পরিচিত করতে বাধ্য করে এই পর্বে। চিরাচরিত প্রথা-প্রকরণকে হারিয়ে সে জাতিগোষ্ঠীর উক্ত বাঁধন থেকে আলগা হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৭ সালে বঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে জ্যোতি বসু পশ্চিমী দেশে পাড়ি দেন এবং transnational company গুলিকে বঙ্গে বিনিযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন।[৬২] প্রজা জমি পেয়েও হারাল, শুধু জমি নয় একই সঙ্গে তার দেওয়ানিকে এবং রাজবংশী সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকের অনুপস্থিতি সমাজে দেখা দিল। এই দেওয়ানি ছিলেন এক সময়কার রাজবংশী সংস্কৃতির পালক ও ধারক।[৬৩]এমত অবস্থায় প্রজা কি করবেন? নিরুপায় হয়ে পরার যে চিত্র লক্ষ করা যাচ্ছে একে জাতির সহনশীলতার জায়গা থেকে ভাবলে বোঝা যাবে জাতির অগ্রসরতা বা স্থির হয়ে থাকার চিত্রকে। এ অবস্থায় জাতি নীরবতার ভূমিকা পালন করে। তার অর্থ এই নয় যে, সে তার অতীত ভুলে গেছে বরং এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিরোধের একটি কৌশল হিসাবে। এই গ্রুপের কণ্ঠস্বরকে জাগিয়ে তোলার জন্য জাতির অন্য অংশটি

(Groups) আবার সক্রিয় হয়ে উঠছেন বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।[৬৪] সক্রিয় হয়ে কাজ করতে বেশ কিছুটা সময় নিয়েছিল কারণ দেশভাগ ও তার সঙ্গে নতুন করে জীবন সংগ্রাম করার জন্য জাতি প্রশ্নটি অনেকটা সুপ্তভাবে থেকে গিয়েছিল। কেননা এই উক্ত দুই ঘটনায় শুধু প্রজা নয়, জমিদার বা জোতদারকে আঘাত করেছিল। জমিদারের জমি হারানোর ঘটনা অনুরূপ পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছিল।

৪.৩. জোত হারানো

সিলিং আইন অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমান জমি রাখার ঘোষণা জমির মালিকদের জমি আটকানোর জন্য পরিবার পরিজনের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হয়েছিল।[৬৫] ফলত একক কর্তৃত্বের জায়গায় অনেকের প্রভাব জমির উপর পড়তে শুরু করে। একটা বড় অংশের জমি এবার খন্ডে খণ্ডে পরিণত হতে লাগল। অন্যদিকে সিলিং আইনে একটা বড় অংশের জমি বেদখলে চলে গেল। এমনকি সরকারি কাজের সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে কিংবা জোতদারের জমির উপর সুনির্দিষ্ট ভাবনা না থাকায় জোতদারের বসতবাটি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হয়েছিল।[৬৬] এরপর দেখা গেল জোতদারের আর্থিক সংকট যা তাকে এবং তার প্রজাকে বিনির্মাণ করল শ্রমিকের অবস্থানে। আর্থিক সংহতি কেড়ে নিয়ে জোত মালিকদের এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসে যা চিরাচরিত অভ্যাস বদল করতে বাধ্য করে। রাজবংশীরা এতদিন অন্য জাতের লোকদের দিয়ে যেসব কাজ করিয়ে নিতেন, সেসকল কাজ এখন নিজেরাই করেন। তাতেও আর্থিক সংস্থান না মিটলে বাড়িঘর ছেড়ে দিল্লি, রাজস্থান, ভুটানে গিয়ে অদক্ষ শ্রমিকের কাজে ভিড়ে যায়।[৬৭] নিজের জমিতে নিজেরাই ভূমিহীন। এদের পরিচিতি হল শুধু ‘কাজের লোক’ হিসাবে।[৬৮] জমি বন্টনের মধ্য দিয়ে এই রূপান্তর রাজবংশী সমাজে প্রকট হয়েছে। জমি বন্টনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক

আন্দোলনের ক্ষেত্র গড়ে না ওঠায় প্রশাসনিক এবং আইনি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জমি ভাগাভাগি হতে দেখা যায়। এমন বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সৃষ্ট হয় যা জমিদারদের অবস্থানকে এক দু জেনারেশনের মধ্যে নিঃস্ব করে ফেলে।[৬৯] এর ফলে একদিকে পরিবারের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জমি বন্টন করা হয়েছে ছোট ছোট খণ্ডে। যে জমি দেখিয়ে না পাওয়া গেছে ব্যাঙ্ক থেকে লোন ও অনান্য সুবিধে। যার কারণে বামফ্রন্টের রাজত্বে সব থেকে বেশি ভূমিহীন চাষির চিত্র লক্ষ করা গেছে। কারণ যেটুক জমি ভাগচাষিরা পেয়েছিল তা দিয়ে পরিবারের ভরন পোষণ চালাতে পারেনি। বাধ্য হয়েই জমি অন্য কেউকে দিতে হয়েছে। অশোক রুদ্র লিখছেন--

> 'তারা যে যৎসামান্য জমির অধিকারি তাতে ভালো করে চাষ করা যায় না। তাতে চাষ করে যা খাদ্য উৎপাদন করা যায় তাতে পরিবারের পেট ভরানো যায় না। তাতে জমি যদি তারা নিজেরা চাষ না করে তো সেই জমির কি হল ? ঐ জমি তারা অপর চাষীদের ভাগে দিয়ে দিয়েছে। কাদের দিয়েছে? ...অধিকতর সচ্ছল চাষীদের। তারা নিজেরা কী করছে ? তারা খেতমজুর হয়ে গেছে...।[৭০]

এর মধ্য দিয়ে সামাজিক জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছে বিরাট আকারে যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা দেখতে পাই প্রণব বর্ধন, মিশেল লুকা, দিলীপ মুখ্যার্জি এবং ফ্রান্সিস্কো পিনোর '*Evaluation of Land Distribution in West Bengal 1967-2004: Role of Land Reforms and Demographic Changes*' এ।[৭১] জমি ভাগাভাগি করে দিয়ে যে সমতা বাম সরকার নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তা তো হয়নি বরং অসাম্য বেড়েছে কয়েক গুণ। ১৯৬৭ সালে গড়পড়তা জমি যদি দুই একক হয়, সেটা ২০০৪ সালে এক এককে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলত ভূমিহীন চাষির সংখ্যা অনেক বেড়েছে।[৭২] বামপন্থীদের এই পরিকল্পনাতে ভূমিহীন চাষিদের ক্ষুদ্র চাষিতে

পরিণত করার প্রয়াস ছিল। কিন্ত বাস্তবে এর মধ্য দিয়ে তাদের সীমাহীন দারিদ্রতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[৭৩] প্রজা ও জমিদারের এই রকমের পরিস্থিতি একপ্রকার নতুন করে বেচে থাকার সংগ্রাম যা তাদের বাধ্য করেছে গ্রাম ছাড়তে। দেশভাগ যেমন হাজার হাজার মানুষকে দেশ ছাড়া করিয়েছে তেমনি স্থানীয় রাজবংশীদের যাদের দেশ ছাড়তে হয়নি তারা ভূমিসংস্কারে দেশ না ছাড়লেও জমি ছাড়া হয়েছিলেন। ফলত উদ্বাস্তদের একটা বড় অংশ বাম-রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছে আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নিয়েছে আর রাজবংশীরা নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় জাতি রাজনীতিতে।

৪.৪. রাজবংশী জোতদার ও প্রজার সর্ম্পক

এই জোতদার একটা সময় প্রজাকে সন্তান সমতুল্য জ্ঞানে দেখতেন।[৭৪] সে খেয়েছে কিনা তার বিষয়ে তৎপর ছিলেন। তার যাবতীয় সুখ দুঃখের ভাগিদার ছিলেন। অনেক সময় দেখা গেছে প্রজার সংসার চালানোর জন্য গিরিকে জমি বিক্রি করতে হয়েছে।[৭৫] সেকারণে অনেক প্রজাই উদাসীন ভাবে জীবনযাপন করতে পারতেন। সেই উদাসীনতার যুগে জোতদারদের বাড়ির কাজকে প্রজারা নিজের কাজ বলে মনে করতেন। কেননা, অনেক আগেই উল্লেখ করা হয়েছে উদাসীনতা মানে কাজের বিরতি নয়। যার নজীর দেখা যায় প্রজাদের কাজ করার চিত্রটি লক্ষ রাখলে। উমেশ শর্মা ওনার *‘চিত্তে বৃত্তে ভাগচাষ’* নামক লেখায় (গল্পের) জমিদারের বাড়িতে প্রজার অবস্থান কেমন তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন-

> ‘ওরা (প্রজা) যে যার মত কাজ করে (জমিদার বাড়িতে)। কেউ পোয়াল পুঁজি করে রাখে। ধানের পাতান কেউ জড়ো করে গোবরের গর্তে ফেলে। সবাই বাড়ির লোক। যখন যে কাজ করে সবাই মিলেমিশে করে। কুলেশবাবু তো বড় জমিদার বা জোতদার নন। মেজাজটাও তার তেমন তিরিক্ষে ছিল না। আর জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, দার্জিলিং জেলায় জমিদার কোথায়? রায়কত রাজারা ছিলেন জমিদার।

> আর জোতদারের সংখ্যা এ তিন জেলায় পঞ্চাশ-ষাট জনের বেশি ছিল না। তবে কুলেশবাবুর মত জোতদার ছিল অনেক। তা কুলেশবাবুর সঙ্গে তার প্রজাদের খুব একটা অসন্তোষ ছিল না। প্রজাদের অভাব-অনটন মানে তো জোতদারেরও অভাব অনটন। চাহিদা যেখানে শুধু খাওয়া আর পড়ার– সেটা মেটানোর অসুবিধা কুলেশবাবুর ছিল না'।[৭৬]

শুধুমাত্র জোতদার আধিয়ারদের সুসম্পর্কই স্থাপিত হয়নি; প্রজাদের উন্নয়নে কিংবা গ্রামীন সমাজে স্কুল প্রতিষ্ঠার থেকে শুরু করে রাস্তা ঘাট তৈরি করা, পানীয় জলের জন্য কুয়ো বানান, জমি চাষ করার উপকরণ, জঙ্গল পরিষ্কার, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পূজা উৎসবে গরিব প্রজাদের জামা কাপড় বিতরণ করার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির জোতদারদের ভূমিকার কথা লিখেছেন কার্ত্তিকচন্দ্র সূত্রধর তার গবেষণা সন্দর্ভে।[৭৭]

৪.৫. আধুনিক রাজবংশী প্রতিরোধ

ভূমিসংস্কার পুরানো ঐতিহ্যের ধবংস সাধন করলেও বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন না থাকায় রাজবংশী সমাজ এক ভিন্ন পথের সন্ধান করতে শুরু করেন। ভিন্ন পথের সন্ধান করা রাজবংশীদের কাছে অপরিচিত নয়। গোটা সমাজ একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে নির্দিষ্ট পথের অনুসন্ধান করার অভ্যাস করেছিল সেই আদিম সমাজ থেকে। অনুসন্ধিৎসু এই মানব জাতি, জীবনে চলার পথকে আবিষ্কার করতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে যা তার জাতি প্রতিরোধ, স্বাধীনতা এবং ঐক্যের সহবস্থান বলা চলে। উদাহরণ হিসাবে আমরা মৈশাল বন্ধুর কথা বলা যায়। অনুপূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে মৈশালের জীবন ও তার ধারাকে। সেখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছেন সমতল ভূমিতে রাজবংশীদের বসবাসের ক্ষেত্র গড়ে উঠলেও জীবিকার সন্ধানে তারা বিপদসঙ্কুল (বনজঙ্গল) পথে বাড়ির বাইরে থেকে জীবন অতিবাহিত করত। সমতলভূমি এবং বনজঙ্গলের এই ধারাবাহিক জীবন অনেকটাই একঘেয়েমিতা

কাঠিয়ে ওঠার প্রক্রিয়া যা একদিকে নতুন অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির সন্ধানে সাহায্য করেছিল। এই ত্রিস্তরীয় উদ্দেশ্য সামনে রেখে রাজবংশীদের সমান্তরাল পথে যাত্রা যেমন তাদের সমাজ কাঠামোর অঙ্গ ছিল তারই প্রতিধবনি লক্ষ করা যায় উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে। অর্থাৎ রাজবংশীদের এক একটি গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসন্ধান করতে থাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির সঙ্গে বাউদিয়ার সম্পর্ক ছিল 'উদাসিন'- এই মনভাবের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনের অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র সমাজ যাতে সেই পথে ধাবিত না হয় সেজন্য সমাজপতিদের এক সজাক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ভাব জগতের সাথে বিচরণ করতে করতে একটা সময় পারিবারিক জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভবনার দিকে নিয়ে যায়। সুখবিলাস বর্মা, ভাওয়াইয়া গানের গায়ক, বলেছেন যে --

> 'মুষ্টিমেয় কতিপয় শিল্পী যারা দোতোরা, কুষান প্রভৃতি পালাগানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কেবল তাঁরাই দোতোরা বাজানোর দিকে ঝুঁকতেন। সত্যি বলতে কি, দোতোরা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ছিল যে দোতোরার বাদক গায়ক শিল্পীরা হয়ে থাকেন বাউদিয়া অর্থাৎ ভবঘুরে। সাধারণতঃ দেখা যেত যে এ ধরনের ব্যক্তির সংসারের প্রতি, পরিবারের প্রতি টান কম থাকে এবং সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র নিয়েই এরা ব্যস্ত থাকেন এবং সংগীত সূত্রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান।...দোতোরা বাজানোর বিরুদ্ধে তাই ছিল একধরণের নিষেধাজ্ঞা'।[৭৮]

জোতদার বা দেওয়ানিরাই ছিল এই সংস্কৃতি অনুপ্রেরণার এক স্তম্ভবিশেষ। মৈশালের গান যখন গ্রাম সমাজে জায়গা করে নিয়েছিল তখন থেকে সমাজকে উদাসীনতার পথে ধাবিত করে। এই ভাবনার থেকে মনে হয় উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞা। সে উদাসীনতা নজীর দেখা যায় বাদক ও গায়ক টগর অধিকারীর জীবনে।[৭৯] সেজন্য মনে হয় গায়ক বাদকরা সমাজে এক বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাদের

প্রভাব সমাজ জীবনে বেশ সাবলীল এমনটা বলা যায় উক্ত নিষেধাজ্ঞার সূত্র ধরে। রাজবংশীদের এই জীবন ধারা পঞ্চাননের নেতৃত্বে আধুনিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বটে, তা কিন্তু পুরোপুরি হয়নি। তার কারণ খুঁজতে গেলে বলতে হয় 'অন্যেরা' যেমন তাদের মান্যতা দেয়নি তেমনি তারাও তাদের পুরানো রীতিনীতি ছাড়তে চাননি। ইতিহাসের এই গতিধারাকে গুরুত্ব দিয়েই পঞ্চানন বর্মা আধুনিক রাজবংশী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ পঞ্চাননের আন্দোলনে গোটা রাজবংশী সমাজ অন্তর্ভুক্ত হল, এমনটা নয়। অন্তর্ভুক্ত না হওয়া অংশটি বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সেখান থেকে স্বরাজ বসুরা জাতির প্রতিরোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন[৮০] তবে তা কতটা জাতির প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলেছিল সঠিক বলা যায় না। কেননা ভিন্ন চিন্তা ও পথের সন্ধান করা যে জাতির অনুপম বৈশিষ্ট্য, সেখানে বামেদের নতুন চিন্তা তাদের প্রভাবিত করবে এমন নতুন তাতে কি আছে? এমনও তেভাগা পর্বে লক্ষ করা গেছে রাজবংশীরা তার জ্ঞাতি ভাইদের বিরুদ্ধে যাননি। এমনকি নকশাল আন্দোলনে রাজবংশীদের তুলনায় সাঁওতালদের ভূমিকা ছিল অগ্রণ্য।[৮১] সেই অর্থে রাজবংশীরা নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হতে চায়নি। অর্থাৎ তেভাগার প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার পুনঃবৃত্তি ঘটাতে চাননি। হয়ত বামেদের নির্দেশিত পথের স্বরূপ বোঝার জন্য তেভাগার রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিল এবং সে কারণে বঙ্গে এই নতুন আর্দশকে সর্বপ্রথম বাস্তবায়িত করতে রাজবংশীদের এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল।

৪.৬. **বামফ্রন্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া**

শ্রমিকের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার যে আয়োজন বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছিল তা পুরোপুরি হল, এমনটা হয়নি। এই সময় লক্ষ রাখলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গে প্রচুর চাবাগান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজবংশীরা তাতে অংশগ্রহণ করেনি বরং তারা জমি হারিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ খুঁজতে বের হয়েছেন।[৮২] চাবাগানের কাজের জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খন্ড থেকে সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওঁরাওদের নিয়ে আসা হয়েছিল।[৮৩] এরা শ্রমিক হলেও রাজবংশীরা শ্রম বিক্রি করতে রাজি ছিল না। অর্থাৎ বামফ্রন্টের শ্রেণি রাজনীতিকে রাজবংশী অস্বীকার করেছিল। যার ফলে রাজবংশীদের পুরানো অভ্যাস এবং কর্মকে অন্বেষণ করতে শুরু করেছিল নতুন করে। শ্রমের ধারণাতে সমাজকে রূপান্তরিত করার যে উদ্দ্যোগ বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছিল যুগপৎ একই সঙ্গে এই সময় বিকাশ লাভ করে। শ্রম বিষয়টির অনুপস্থিতি যেমনটা আমরা লক্ষ করেছিলাম 'হাউলি প্রথার' মধ্যে, তারই উপস্থিতি নিয়ে এসেছিল কমরেড়রা বর্গা প্রথার আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে। একই সঙ্গে রাজবংশী সমাজে আর একটি রূপান্তরণ ঘটল তা হল দেওয়ানি প্রথার মধ্যে যে রাজবংশীর অবিসংবাদী ভূমিকা তা স্থানান্তরিত হল কমরেডদের হাতে। দেওয়ানিদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টি ছিল বেশ জটিল এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ও বটে। ২৫ একরের উর্দ্ধে কোন রায়ত বা জোতদার জমি রাখতে পারবে না এই খবরটি বেশ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামগঞ্জে সারা ফেলানো প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। প্রজা থেকে জোতদার সকলেই এই বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের এই ডাক ছিল সকলকে সামিল করার তাগিদ নিয়ে। তাতে দু-একজন অংশগ্রহণ না করলে সরকার সে বিষয়ে সজাগ ছিল না। বরং অনুপস্থিতকারীর বাস্তুভিটা এই সুযোগে ভেস্টেড হয়ে গেছে। রেকর্ডকালীন সময়ে দেওয়ানির অনুপস্থিত থাকার কারণকে দীনেশ ডাকুয়া উপস্থাপিত করেছেন

রাজবংশী দেওয়ানির অক্ষমতা[৮৪] বলে। তিনি এমন এক দেওয়ানির কথা তার লেখায় উল্লেখ করেছেন, যে কোনদিন অন্যায় করেনি, ঠকিয়ে কারো জমি নিজের দখলে রাখেনি, যা করেছেন প্রচলিত নিয়মে। নিয়মের বাইরে গিয়ে সম্পত্তি বাড়ানো প্রশ্ন যখন তার বেলাই নেই, সে কেন অহেতুক জমি বাড়ির লোকেদের নামে বা আত্মীয়দের নামে লুকিয়ে রেজিস্ট্রি করাতে যাবে। ফলত সরকারকে জমি রেকর্ড করিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন আসতে পারে না। কারণ বে-নিয়মে জমি অধিকার করেনি। অর্থাৎ তিনি আইনের শাসনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চান না তবুত সে জড়িয়ে গিয়েছিল তার বাড়তি জমির প্রশ্নে। আইনের শাসন মোতাবেক একটা সময় বাড়তি জমি অর্থাৎ ৭৫ বিঘে জমির বাইরে থাকা জমি সরকারের অধিনে চলে যায়। সেখানে তাঁর বাড়িভিটে সহ অন্যান্য জমি সরকারের কবলে। তবুত তিনি কখনো কোর্ট কাছারি উকিলের কাছে যাইনি। নিজের সম্পত্তি আটকানোর বিভিন্ন কৌশল[৮৫] থাকা সত্ত্বেও সে পথে না গিয়ে সম্পত্তি খোয়ানোর গ্লানি বহন করার মানসিকতা বহন করতে হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে জোতদারের জমি হারানোর বিষয়টি ছিল আত্মসন্মান হননের সমান। তার প্রেক্ষিতে জোতদার নিজেকে অবসাধের দিকে অর্থাৎ উদাসীনতার দিকে নিয়ে গেছে। সে ভাবত, উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক জমি এবং পরে নিজে কষ্ট করে সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছে। সে সম্পত্তি চোর ডাকাত যদি নিয়ে যায় তা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু জেনে শুনে সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে বা নিজ হাতে রেকর্ড করিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, এ কোন নিয়ম ? তা তিনি মেনে নিতে পারেনি। এই মানতে না পারার মধ্যে জাতি প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। অথচ ডাকুয়া বাবু বিষয়টিকে দেখেছে অক্ষমতার জায়গা থেকে। জাতি প্রশ্নটি সবসময় তার নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিসরে সক্রিয়তা থাকলেও প্রগতিশীল, গণতন্ত্র বা আধুনিকতার প্রশ্নে কিছুটা বৈরিতা প্রকাশ বলে

অক্টভিও প্যাজ মনে করেন।[৮৬] প্রগতিশীলতাকে সামনে রেখে ডাকুয়া বাবু যেভাবে রাজবংশীদের উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন তাতে রাজবংশীদের অসারতাই ফুটে ওঠে। এই অসারতা সৃষ্টি করে সমতার ইতিহাস। যাইহোক, ক্ষমতার এই হস্তান্তরণ স্থানীয় নেতার হাতে অর্থাৎ ভুইপোর অবস্থার থেকে ওঠে আসা লোকেদের হাতে সঞ্চিত হয়। তাতে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ ছিল না বললে চলে।[৮৭] শ্রমের রাজনীতিতে আগ্রহ প্রকাশের অনিহ মনোভাব নিতান্তই বুঝতে সাহায্য করে দোদুল্যতার (ambivalence) চিত্রকে।

৫. বামপন্থীদের আখ্যানে শ্রমের রাজনীতি ও রাজবংশীদের অবস্থা

৫.১. অমর রায় প্রধানের ব্যাখ্যা ও রাজনীতি

এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে অমর রায় প্রধানের একটি লিখিত গ্রন্থ *‘উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ’* কে ধরে। অমর রায় প্রধান ১৯৩০ সালের ১৫ই আগষ্ট বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বোদা থানার বড়শশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও বড় হয়ে উঠেছিলেন কোচবিহারের হলদিবাড়িতে। তিনি জাতিতে রাজবংশী। ফরওয়ার্ড দলের নেতা ও মন্ত্রী যেমন ছিলেন তেমনি শিক্ষকতা, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, জনমত পত্রিকার বিশেষ সাংবাদিক ছিলেন। ২২ পৃষ্ঠায় লেখা উক্ত গ্রন্থটি তিনি দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ৬ই জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০০০ সালে গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লিখে পুনরায় তা প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের শরিক দল ছিল ফরওয়ার্ড দল। ফলত তিনি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধানসভার সদস্য এবং ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ লোকসভার সদস্য হিসাবে পর পর একই কোচবিহার লোকসভার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন

করেছেন। উন্নয়ন এবং তার আবডালে শ্রমের প্রশ্নটিকে রেখে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। শ্রমের প্রশ্নকে সামনে রেখে উন্নয়নের দাবি যৌক্তিকতা আনার চেষ্টা করেছেন। কেননা, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অসংখ্য বেকারের জন্ম হয়েছিল। এদের কাজের সন্ধান যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের উপস্থাপন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনীতার জায়গাকে ধরে ১৯৭০ সালে তিনি 'বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য, সেচের জলের জন্য, বিদ্যুতের জন্য এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ মাস্টার প্ল্যান চাই'– দাবি নিয়ে সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান করেন। উত্তরবঙ্গের শত খানেক মানুষ তাতে সামিল ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।[৮৮] উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন না হওয়ার জায়গাটিকে বিষয় করে উপেক্ষার দিকগুলো আলোচনায় নিয়ে এসেছেন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উৎপত্তি কারণ হিসাবে রাজবংশীদের অনুন্নয়নের প্রশ্নটিকে দায়ি করেছেন। এই সময় রাজবংশীরা, তাদের নিজস্ব ভাষা হিসাবে 'কামতাপুরি ভাষা'র স্বীকৃতি এবং অষ্টম তপসিলে অন্তর্ভূক্তকরণ– এই দাবিতে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছিল। ওনার রাজবংশী ভাষা নিয়ে অস্পষ্টতা এবং রাজবংশী ভাষা বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে ধারণা পরিস্কার করার জন্য একটি গবেষণামূলক কমিটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তিনি বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করেছেন। বঙ্গের বাংলা ভাষার আদি চর্চার জায়গাটি কোচবিহার রাজ্যেতে লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগে বঙ্গে একমাত্র হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্বকে ধরে রেখেছিলেন কোচবিহার নামক দেশীয় রাজ্যটি। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫১৫ সালে অহম রাজ সুখান ফঃ সূর্য্যনারায়নকে একটি চিঠি

লিখেছিলেন। সেই লেখা চিঠিখানিকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম প্রাচীন প্রামাণ্য দলিল বলে উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিকে নিয়ে শুধু বাংলা নয়, অসমিয়ারা এবং রাজবংশী সকলেই দাবি করেন এটি তাদের প্রাচীন ভাষার নির্দশন। এর সঙ্গে বাঙালি এবং অসমিয়ারা উভয়ে দাবি করেন রাজবংশীদের স্থানীয় ভাষা হল তাদের উপভাষা।[৮৯] বঙ্গ ও অসমের মধ্যবর্তী স্থানে কামতাপুরের অবস্থান হওয়াতে দুদিক থেকে কামতাপুরের উপর তাঁদের কর্তৃত্বের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। যাইহোক, অমর রায় প্রধান জাতীয়তাবাদী বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বঙ্গের বাংলাভাষাকে মানদণ্ডের বিচারে গুরুত্ব দিলেও রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষাকে গুরুত্ব দেননি। উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্নতার জন্য তিনি উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন না হওয়ার জায়গাটিকে প্রাদান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ঘিরে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা, চাবাগান গড়ে উঠলেও তাকে কেন্দ্র করে শিল্প কারখানা নেই এমনকি চা শিল্পের সদর দপ্তর কলকাতায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা, কৃষি কেন্দ্রিক শিল্প গড়ে না ওঠা, ১৯৭৬ সালে তিস্তা সেচ প্রকল্প গড়ে উঠলেও ২৫ বছর পরের ২০ শতাংশ জমিতে জল না পৌছান, তার উপর কেন্দ্র রাজ্য মিলে শাল সেগুন থেকে বনজ সম্পদকে হরণ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করা মত ঘটনা, বিদ্যুতের অভাব এবং কলকারখানা না থাকা এই সব ঘটনাবলীকে উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন কাজের পরিধি সীমিত যা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পুষ্ট করতে সাহায্য করছে।[৯০] উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, অবহেলিত এবং উপেক্ষিত এই গতিধারায় উত্তরবঙ্গকে দেখার প্রসঙ্গটি মূলত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মনভাবের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ক্ষমতা সীমিত। সেকারণে যৌথভাবে কেন্দ্র সরকারকে সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে বলে মনে করেন। কিন্তু দেশভাগের পর

কয়েক দশক পেরিয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন হয়নি, বেকার সংখ্যা বেড়েছে, কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি যা একদিকে 'লেবার শ্রেণি' গড়ে তোলার সমস্যা তেমনি জাতি আন্দোলনের আওয়াজকে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা সফল না হওয়ার ব্যর্থতা তিনি অঙ্কন করেছেন *'উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গে'*। ওনার অপর একটি বই *'জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে'* জীবনের শেষ পর্যায়ের এসে লিখেছেন। ২০১২ সালে। আর তিনি মারা গেলেন ২০১৩ সালে, ৮২ বছর বয়সে। এটি ওনার আত্মজীবনী। রাজবংশীদের আন্দোলন সম্পর্কে লিখছেন --

> 'উত্তরখণ্ড, উতজাস্, কামতাপুর ও সম্প্রতি গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন হল। সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে, সমস্ত আন্দোলনটাকেই বিচ্ছিন্নতা আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তথাকথিত প্রগতিবাদীরা। একবারের জন্য ভেবে দেখা হয়েছে কি ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে অনাহারে ত্রিশ লক্ষ বঙ্গবাসীর অকাল মৃত্যু হয়েছিল। তখন কুচবিহার রাজ্যে একজনও অনাহারে মরেনি, ১৯৪৭-৫০ সালের মধ্যে দেশে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ভেতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে গঙ্গা, যমুনা, পদ্মার জল লালে লাল হয়েছিল তখন কোচবিহারে হিন্দু- মুসলমানের দাঙ্গা হয় নি। অভিন্ন উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত হত কোচবিহার যা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত'।[৯১]

রাজনৈতিক জীবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র জীবন থেকে তিনি বাম মানসিকতা নিয়ে বড় হয়েছিলেন। তবে জীবনের শেষ অঙ্কে এসে রাজবংশী জাতি আন্দোলনকে আর বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে শোনা যাইনি। বরং রাজবংশীদের কথা না শুনে তাদের সহজে মুলস্রোত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটি কতটা যুক্তিসঙ্গত সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

৫.২. এস ইউ সি আই (SUCI) এর বয়ান

পশ্চিমবঙ্গের একটি বাম সংগঠন এস ইউ সি আই (সোস্যালিস্ট ইউনিট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া) ২০০৫ সালে *'উত্তরবঙ্গের জনজীবনের বর্তমান সমস্যা প্রসঙ্গে'* একটি ৩২ পৃষ্ঠার বই রচনা করেন (মানিক মুর্খাজি)। সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বইটি রচিত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ জনজীবনের বর্তমান সমস্যা বলতে তিনি বুঁঝিয়েছেন ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হয়নি। এই যন্ত্রনার থেকে মুক্তি পেতে যদি সেখানে আন্দোলন গড়ে উঠে ওনার কাছে তা ন্যায়সংহত বলে মনে হয়েছে। তিনি লক্ষ করেছেন অসংখ্যা বেকার মানুষের মিছিল যারা প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই বাসে ট্রামে করে গ্রাম থেকে কাজের খোঁজে শহরে চলে আসে। জনমজুর, মিস্ত্রী, জোগানদার, রিক্সাচালক, ভ্যানচালক, হকার, সব্জিবিক্রেতা, বাড়ির কাজের লোক, নানান পেশার লোক সারাদিনের জন্য শহরে আসেন। দিনান্তে কেউ সামান্য রোজগার নিয়ে, কেউবা কিছু জোগাড় করতে না পেরে খালি হাতে বাড়ি ফেরেন। কাজের এমন অভাব যে, অনেকে বাধ্য হয়ে পাড়ি দিচ্ছেন সুদূর কেরলে, রাজস্থানে, দিল্লী, বোম্বাই, হরিয়ানা, পাঞ্জাবে। এর পরবর্তীতে তিনি চাষবাস থেকে যাতায়াত এবং উত্তরবঙ্গের মাস্টার প্ল্যান কার্যকরি না হওয়া ঘটনাকে ধরে উত্তরবঙ্গকে অবহেলিত করে রেখেছে বলে মনে করেন। এর থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে বাজারি অর্থনীতির বিরুদ্ধে গণ-জাগরণ গড়ে তোলার যুক্তি তুলে ধরেছেন। রাজা মহারাজাদের আমলে উত্তরবঙ্গের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ছিল স্বয়ং সম্পন্ন। সেদিনের গ্রামের উৎপাদিত পণ্য বৃহত্তর জাতীয় বাজার অর্থনীতির পণ্য ছিল না। এখন সবকিছু জাতীয় বাজারের পণ্য হিসাবে যুক্ত হয়েছে। আর এর দর নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিপতিরা। ফলত চাষি তার ন্যায় মূল্য পান না। এই সমস্যাই জনজীবনে ক্ষোভের সঞ্চার করছে। এই সমস্য সমাধানের

জন্য উচিত ছিল বামফ্রন্ট সরকারের জনগণকে নিয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু বাম সরকার সে পথে পা বাড়ান নি। বরং কংগ্রেস-বিজেপি মত বাম সরকার লাঠি গুলি দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙ্গছে। পরিশেষে তিনি রাজবংশীদের জাতি আন্দোলনকে অবাস্তবিক ও ন্যায়সংহত নয় বলে মত প্রকাশ করেছে।[৯২]

৫.৩. দীনেশ ডাকুয়ার মতামত ও রাজনীতি

দীনেশ ডাকুয়ার একটি ছোট বই *‘কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী জনবিরোধী আন্দোলন’* র দিকে আলোকপাত করে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। যা প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩ সালে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা থেকে। বইটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ৩২ পাতায় রচিত। তিনি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতিতে রাজবংশী। পরবর্তীতে বাম-রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং এমএলএ এবং মন্ত্রী (তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগ এবং পর্যটন বিভাগ) হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। পেশাগতভাবে ওকালতিও করতেন। উত্তরবঙ্গের একজন বাম বরিষ্ট নেতাও বটে। তিনিই মনে হয় প্রথম রাজবংশী জাতি আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। বইয়ের শিরোনামটির দিকে লক্ষ রাখলে তা বোঝা যায়। বাম সরকারের আমলে কেন রাজবংশীরা জাতি আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন--

> “লক্ষ রাখতে হবে উত্তরবঙ্গে আলাদা রাজ্যের দাবি কখন ওঠে? যখন জোতদার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় থাকে না। স্বাধীনতার গোড়ার দিকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাসনে জোতদার-প্রতিক্রিয়াশীলদের কংগ্রেস দল ছিল। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব এমএলএ কংগ্রেসের ছিল। কিন্তু কোন দিক থেকে উত্তরবঙ্গব্যাপী আলাদা রাজ্যের দাবি

ওঠেনি। তখনো রাজবংশীরা ছিল। কিন্তু যেই ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হল এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রগতির হাওয়া উত্তরবঙ্গের মাটিতে ধাক্কা দিতে লাগল তখনি উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য গঠন করার জন্য উত্তরখন্ড দল গঠিত হল। সেই সময় উত্তরবঙ্গে ৪৫ জন এমএলএ এর মধ্যে ২৭ জন ছিল কংগ্রেসী। তখন উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য হলে কংগ্রেসী রাজত্ব অটুট থাকত। ভূমিসংস্কারের শ্লোগান উত্তরবঙ্গে ঢুকতে বাঁধা পেত। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭৭ হয়ে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ ইতিহাস হল গ্রামে ও শহরে, ক্ষেতে ও কারখানায়, খনিতে ও চা বাগিচায় আপামর সকল গরিব মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস। জমিদার জোতদারদের জমি বন্টন করে গরিব মানুষকে দেওয়ার ইতিহাস, কলকারখানায়, খনিতে, চা বাগিচায় শ্রমিক শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি ও বোনাসসহ নানান অধিকার অর্জনের ইতিহাস, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ না করার ইতিহাস।...এই ইতিহাস কার পক্ষে ? গরিব মানুষের পক্ষে। এই ইতিহাস কার বিপক্ষে ? জোতদার-মহাজন-পুঁজিপতি বিপক্ষে। তাই পশ্চিমবঙ্গকে টুকরো করে উত্তরখণ্ড, কামতাপুর হওয়া কার মঙ্গল ? জোতদার-মহাজন-পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিক্রিয়ার ধারক বাহকদের।...”[৯৩]

গরিব মানুষের অধিকার অর্জনের প্রশ্নটি ঘিরেই অনেকটাই বাম শাসনের ভিত্তি গড়ে ওঠেছিল। রাজবংশীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি যে বঙ্গের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিল তা অনেকটা বাম সরকারকে কেন্দ্র করেই। কারণ বামপন্থীরা শ্রেণি প্রশ্নটিকে সামনে রেখে শ্রমজীবি মানুষের অধিকারের জায়গাটি নিয়ে এসেছিলেন। তবে কেন তাহলে তিনি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন ? তিনি মনে করেন রাজবংশীদের আলাদা রাজ্যের দাবি এবং কামতাপুরী ভাষার দাবি তথ্যভিত্তিক ও ইতিহাস সম্মত নয়। কেন নয় ? তার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হল--

প্রথমত: তিনি মনে করেন উক্ত দাবি নিয়ে রাজবংশীরা বিভিন্ন নির্বাচনে জনগণের কাছে গেছেন, অন্যেরা দূরের কথা, রাজবংশী মানুষরাই তাদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে দিয়েছে। তারা বিরাট আশা করে রাজবংশীদের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু নির্বাচনে তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। তাঁদের নিজেরদের শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও যাদের সামান্য রাজনীতির জ্ঞান আছে তাঁদের কাছে এমনটি ছিল প্রত্যাশিত।[৯৪]

দ্বিতীয়ত: তিনি দেশি, ভাটিয়া (উদ্বাস্তু) এবং দেশভাগের বির্তক ধরে আলোচনা শুরু করেছেন। দেশভাগ পরবর্তীতে উদ্বাস্তুদের আগমন এবং উত্তরবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকলে উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজবংশীরা যে ভাটিয়াদের তুলনায় দূর্বল তা তিনি মনে করেন। এই রিফিউজিদের একটা বড় অংশ ছিল কৃষিজীবী। তাদের উন্নত প্রথায় চাষের প্রতিযোগিতায় দেশি মানুষরা- রাজবংশী ও নস্য শেখরা- পরাজিত হয়েছিল। এই অবস্থায় রিফিউজিদের উদ্যোগে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জমির দামও বেড়ে যায়। দেশি কৃষকরা জমির উৎপাদন বাড়াতে পারল না। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন রাজবংশীরা অলস এবং সেকেলে চাষের ধারাবাহিকতা থেকে বেড়িয়ে যেতে পারেনি। চরা দাম পেয়ে জোতদাররা তার বাড়তি জমি বিক্রি করে দিয়েছিল রিফিউজিদের কাছে। এমনকি দেশি জোতদাররা বাড়তি ফসলের আসায় আধিয়ারদের উচ্ছেদ করে ভাটিয়াদের (রিফিউজি) জমি আধি দিতে লাগল।[৯৫] রাজবংশীদের এই পরাজয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত করেছিল। যার কারণে বর্তমান সময়ে অনেকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দিন মজুরি করছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[৯৬]

তৃতীয়ত: রাজবংশীরা শুধু চাষবাসে নয়, ব্যবসাবাণিজ্যেও নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে পারেনি। অন্যদিকে ভাটিয়ারা ব্যবসাবাণিজ্য ও নানান কিছুর উপর ভর করে অল্প সময়ে অনেক এলাকায় অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। কোথাও কোথাও ভাটিয়াদের দেখে দেশি মানুষরাও (রাজবংশীরা) দোকান করেছে। কিন্তু সে প্রায় উঠে গেছে। জিজ্ঞেস করলে বলে যে, বাকিতে সব গেছে। যখন জিজ্ঞেস করা হয় ভাটিয়াদের দোকান কি করে টিকে আছে, উত্তর এসেছে, *'উমার মত ছোট লোক তো হামরা হবার না পাই'*। (উদ্বাস্তু ভাটিয়াদের মত রাজবংশীরা নিলজ্জ নয়, রাজবংশীদের ইজ্জত আছে, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করাটাই রাজবংশীদের ধর্ম এমন ভাবনাই উক্ত বয়ানে রয়েছে) *'উমরাও তো বাকি দেয়?'* (ওঁরাও ত বাকি দেয় ?) জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে-*'উমার কথা ছাড় ঠেকাত পড়লে ঠাংঙ্গোত পড়ে, ঠেকা মারলে মাথাত গুড়ায়'। হামরা কারো ঠাংঙ্গোত পড়ির না পাই, কারও মাথাও গুড়ির না যাই'।* (ভাটিয়াদের কথা ছাড়, বিপদে পড়লে মানুষের হাত পা ধরতে পারে আবার বিপদ কেটে গেলে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আমরা রাজবংশীরা বিপদে পড়লেও ওদের মত করতে পারি না) এই হল সাধারণভাবে ভাটিয়াদের সম্বন্ধে দেশী মানুষের চারিত্রিক মূল্যায়ন।[৯৭] তবে এটা ঠিক যে রাজবংশীরা কৃষিকাজ এবং পশুপালন ব্যতিত অন্য কোন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেনি। ফলত নতুন নতুন শহর প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে রাজবংশীদের উপস্থিতি সেভাবে চোখে পড়ে না। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করার কৌশলগত কাঠামোর সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করতে সাচ্ছন্দবোধ করেনি। তারা যে ব্যবসা বাণিজ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেনি তার প্রমাণ পাই একটি কবিতায়--

'রাজাহাট গেনু রানীরহাট গেনু

গেনু হাট মাটিগাড়া,

ক্ষত্রিয়র কিছুই দোকান নাই

চূড়ামুড়ির ঢাকি ছাড়া![৯৮]

বাজার মুখি চিন্তাভাবনা এদের মধ্যে একপ্রকার দেখা যায় নি। বাজার থেকে পণ্য কিনে বিক্রয়যোগ্য করে তোলা বেশ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে রাজবংশীদের সংযোগ নেই বললে চলে। পণ্য ক্রয় করে বিক্রি করা তো দুরস্ত, যেখানে বাড়ির শাক সবজি, ফলমূল ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বাজার জাত করায় ক্ষেত্রে রাজবংশীদের ছিল ঘোর আপত্তি।[৯৯] কেনাবেচার সম্পর্ককে একপ্রকার সমাজের বাইরেই রেখে দিয়েছিল। তাদেরকে যদি বলা হয় তারা ব্যবসা করতে পারে না, অন্যরা পারে, যেমনটা বাম নেতা দীনেশ ডাকুয়া বয়ান দিয়েছেন, সেই নিরিখে রাজবংশী প্রশ্নটাই আর থাকে না। কারণ এটা তাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। কেন কেনাবেচাতে তাদের আপত্তি এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে রাজবংশী সত্তার সন্ধান করা যেতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে। ধরুন, কোন এক ব্যক্তি বাড়ির উঠানে শাক চাষ করছিল। যেটুক জমিতে চাষ করেছে তাতে সেই শাক নিজে খেয়ে পাশের বাড়ির আরও কয়েক ঘর লোক খেতে পারবে। এর বেশি সে চাষ করেনি। অথচ তার জমি আছে, অনেকটা বেশি করে চাষ করলে বাজারে বিক্রি করতে পারত। সে পথ কখন অবলম্বন করেনি। কিংবা বাড়িতে অনেক ফলমূলের গাছ রয়েছে- একসময় ছিলও রাজবংশী বাড়িগুলিতে- সে ফল কখন বাজারে নিয়ে যাইনি। বিক্রি করতে তো পারতেন জিজ্ঞেস করলে বলে, *'না হামরাই খাই, টারিবাড়ির চেংরা চেংরিওরাও খায়, কিসের জন্য বেচাই, সবাই মিলে খাই'*। (আমরা নিজেরা খাই এবং পাড়া প্রতিবেশিদের ছেলে মেয়েরা এলে খাই, কিসের জন্য বিক্রি

করব ? আমরা সবাই মিলে খাই।) এই সবাই বলতে গিরি ও প্রজার একটা পারস্পরিকতার সম্পর্ক দেখা যায় যেখানে গিরি তার শুধু পরিবার নয়, প্রজাকে নিয়ে যে তার পরিবার এমন ভাবনাই লক্ষ করা যায়। তাই গিরি বলছেন *‘হামরাই তো খাই’*। আর বিক্রির কথা উঠলে বলে *‘হামরা এত ছোট লোক নোমাই’* (আমরা এত ছোট লোক নই, ফল বা সবজি বিক্রি করে সংসার চালাতে হবে)। স্পষ্টই উপরের বয়ানে বোঝা যাচ্ছে বাজারের সঙ্গে অর্থাৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজের বৈপরিত্য। অথচ বাম আখ্যানে সবসময় একটি কথা উঠে এসেছে *‘গিরি প্রজাকে ঠকায়* (গিরি প্রজাকে শোষণ করে)। এক্ষেত্রে আর একটি উদাহরণ দেওয়া হল। মনে করুন, প্রজা ধান ওঠার মরসুরের আগে গিরি কাছে ৫ মণ ধান ধার নিয়েছে। ধানের মরসুমে প্রজাকে ১০ মণ ধান পরিশোধ করতে হয় প্রচলিত নিয়মে। অর্থাৎ যা নিয়েছে তার দ্বিগুণ দিয়ে পরিশোধ করতে হয়। ৫ মণ ধান যখন নিয়েছে তার দাম মরসুমের থেকে অনেক বেশি ছিল। তার উপর যদি ভাদোই মাস (ভাদ্র মাস) হয় তাহলে ত ঘরে ঘরে অভাব শুরু হয়। সে সময় ধানের দাম বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই সময় গিরি ধান বিক্রি করলে যে টাকা পাবে সেই টাকার ধান প্রজার কাছ থেকে নিত মরসুমে। এতে তো লাভ লোকসানের কিছু নেই বরং গিরির কিছুটা লোকসান লক্ষ করা যায়। ভাদ্র মাসে ধান বিক্রি করলে গিরি নগত টাকা পেত কিন্তু প্রজাকে ধার দিলে সে ধানের বদলে ধান পেয়েছে, সে ধান কাচা ধান, শুকনো নয়। অথচ এর ব্যাখ্যা বাম বয়ানে উঠে এসেছে ভিন্ন ভাবে। তবে এর স্থান ভেদে বৈচিত্রতা ছিল। বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকাগুলিতে যেমন অরাজবংশী জোতদার বা জমিদারদের ভূমিকা ছিল বেশি, সেখানে শোষণের মাত্রাও ছিল বেশি। সেই স্থানগুলিতে কৃষক প্রতিরোধ যেমন তৈরি হয়েছিল, অন্যথায় তা দেখা যায়নি। এই

শোষণ বঙ্গের কৃষক শোষণের জায়গা থেকে ভাবা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনও হয়েছে। তার প্রভাব স্থানীয় জোতদারদের মধ্যে কিছুটা পড়েনি এমনটা বলা যাবে না। তবে বঙ্গের নিরিখে উত্তরবঙ্গকে একই আসনে বসিয়ে ভাবলে বিষয়টি অতিরঞ্জিত হতে পারে। বঙ্গের সমগ্রতার নিরিখে বাম কমররেডরা উত্তরবঙ্গের কৃষকদের অবস্থান লক্ষ করেছেন। যার কারণে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আলোচনায় উঠে আসেনি। আবার আমরা ডাকুয়ার ব্যাখ্যার দিকে নজর রাখব।

চতুর্থত: গ্রামে রাজবংশীদের আদিপত্য থাকলেও শহরে তাদের দেখা যায় না। ফলত এটাকেও তিনি একধরনের ব্যর্থতা বলে মনে করেন।

পঞ্চমত: চাকরি ক্ষেত্রেও রাজবংশীরা অনেকক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। সংরক্ষণের সুবিধা পেলেও অনান্য তপশিলিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছেন। তার উপর কংগ্রেস আমলে ভাটিয়াদের স্বজন-পোষণের খেলায় রাজবংশীদের চাকরিতে প্রবেশের পথ বন্ধ ছিল। যেটুক পথ খুলেছে বাম সরকারের ৩৪ বছরে। ফলত দেশি ভাটিয়ার এই লড়াই এবং রাজবংশীদের পিছিয়ে পড়ার জায়গা থেকে আলাদা রাজ্যে দাবি যুক্তিসম্মত নয় বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।[১০০]

ষষ্ঠত: ভাষা বিষয়ক জায়গা থেকে কামতাপুরী ভাষা স্বীকৃতির প্রশ্নটি রাজবংশীরা যে সামনে নিয়ে এসেছে তা তিনি বাংলার কথ্য ভাষা বলে অভিমত প্রদান করেছেন। যদিও তিনি ভাষাবিদ্ নন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন বাংলা ভাষার দুটি সর্বব্যাপী রূপ আছে। একটি সাধু ভাষা অপরটি চলতি ভাষা। চলতি ভাষা কিন্তু এলাকাভেদে স্থানীয় কথ্য ভাষা নয়। এই সাধু ও চলতি ভাষা ছাড়াও ঢাকা, মৈমনসিংহ, মেদিনীপুর, কোচবিহার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন কথ্য ভাষা আছে। উত্তরবংলার ‘দেশি ভাষা’ এরকমেই একটি স্থানীয় কথ্য ভাষা বলে মনে করেন।[১০১] কিন্তু দুর্ভাগ্য যে

উত্তরবাংলার কিছু স্থানীয় মানুষ এই কথ্য ভাষাটিকে সরকারি মাতৃভাষায় স্থান দিয়ে সমস্ত লেখাপড়া, বইপত্র, দলিল দস্তাবেজ এই ভাষায় লেখার দাবি করে আসছে। এই স্থানীয় কথ্য ভাষার নাম দিয়েছেন কামতাপুরী ভাষা। দাবিদারদের ভাষায় এমন দাবির জায়গাটি উঠে এসেছে তাদের পুরানো পরাক্রম রাজাদের অস্তিত্বের অবস্থান থেকে। তিনি আবার বলছেন শুধু উত্তরবঙ্গে নয় ভারতের নানা জায়গায় এরকম পরাক্রম রাজা ছিল। তাতে কিন্তু যায় আসে না।[১০২] আলাদা রাজ্যের দাবি এবং কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতি বিষয়ক বিষয়ে ডাকুয়া বাবুর পরিউক্ত মন্তব্য আমাদের বুঝতে সাহায্য করে রাজবংশীদের দাবি যুক্তিসম্মত নয়। তবে ডাকুয়া বাবুর পরিভাষা ও তার ব্যাখ্যা যে অতি সাধারণ তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সেই সাধারণ মতামত একপ্রকার ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণ করার জায়গা থেকে প্রকাশ করা গেলেও সাধারণভাবে তা ব্যক্ত করা একপ্রকার কঠিন বলেই মনে হয়। তার এই উপস্থাপনায় জাতির স্বতন্ত্রতা যেমন দেখা যায় না তেমনি রাজবংশী প্রশ্নটি উদ্বাস্তুদের নিরিখে শুধুমাত্র 'পরাজিত কৃষক' হয়ে রইল। এর সঙ্গে তিনি আরও যোগ করে বললেন 'রাজবংশীরা হিংসাত্মক', ভাটিয়াদের উন্নয়নকে সহ্য করতে না পেরে বিচ্ছিন্নতার পথে পা বাড়িয়েছে। এই বিদ্বেষ ভুলে দেশি-ভাটিয়া সকলকে একসঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আসতে হবে। যেমন বন ও উদ্যান সৃষ্টি, পশুপালন ও মৎস্য চাষের দ্বারা কৃষক জীবনে আয় বৃদ্ধি, জমিতে উদ্বৃত্ত যুবক-যুবতির হাতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য শিল্প কারখানার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। এ লড়াইতে দেশি, ভাটিয়া, হিন্দু মুসলিম সকল কৃষককে একাকার হতে হবে।[১০৩] সকলকে একারকার হতে হবে কিন্তু প্রশ্ন হল এই উন্নয়নের ধারা কি রাজবংশীরা আদতে চেয়েছিল ?

ডাকুয়ার উপরিউক্ত আলোচনায় উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত বা অবহেলিত এই বিষয়ে সহমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তবে ওনার *'কামতাপুরী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য'* নামক একটি ছোট্ট লেখায় উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত তার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেই ব্যাখ্যার বিষয় অনেকটা অমর বাবুর *'উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ'* আলোচনার অনুরূপ। তিনি বলেছেন কলকাতার প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের অবস্থান দূরত্ববাচক। 'স্বাধীনতার পর, ফারাক্কা সেতু নির্মিত হলেও মাঝখানে পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) অবস্থান করায় আগের চেয়ে দূরত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। ফলে অবস্থানগত অসুবিধা যদি পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হয়, তবে উত্তরবঙ্গের বেলায় সে কারণ বর্তমানে ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা বজায় আছে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও'।[১০৪] দেশভাগের পূর্বে অধুনা বাংলাদেশের লালমনি হাট জংশন হয়ে চ্যাংরাবান্ধা, পাটগ্রাম হয়ে মাল জংশন পর্যন্ত যে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেললাইন ছিল কলকাতার সঙ্গে ডুয়ার্সের যোগাযোগের একমাত্র উপায়, সেটা বর্তমান বাংলাদেশে পড়ে যাওয়াতে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে প্লেন বাঘডোগরা থেকে প্রত্যেকদিন চলে না। দেশভাগের পরবর্তীতে কলকাতার প্রান্তীয় অঞ্চল যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, সুন্দরবন যতটা উন্নতি হয়েছে সেই নিরিখে উত্তরবঙ্গ বিশেষত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলা পিছিয়ে রয়েছে।[১০৫] ভৌগলিক দূরত্বের পাশাপাশি তিনি বলেছেন বাঙালিদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গবাসী একই নৃতাত্বিক পরিচিতি নয় বলে সাংস্কৃতিক জগত কিছুটা স্বতন্ত্র। ভাষার ক্ষেত্রে তা অনুপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যাকে দীনেশ বাবু বলেছেন বাংলার কথ্য ভাষা। এরা যে অনান্যদের থেকে আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ তা তাদের ভাব, ভাষায়, খাদ্যে ব্যবহারে স্পষ্টই লক্ষ করা যায়।[১০৬] পরবর্তীতে এ অঞ্চলে আর্যিকরণ হলেও স্বতন্ত্রতা থেকে গেছে। বিশেষত সমাজে নারীর স্বাধীনতা

ছিল, বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের নিরামিষ খাওয়ার নিয়ম ছিল না। তাতে মনে হয় আর্য প্রভাব এদের মধ্যে পড়লেও হিন্দুত্বের গোঁড়ামি এদের তেমন স্পর্শ করেনি বলে তিনি মনে করেন।[১০৭] তবে উন্নয়নের প্রশ্নে তিস্তা প্রকল্প, বিদ্যুৎ সহ উত্তরবঙ্গের নদী ভাঙ্গন রোধ করার ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা উত্তরবঙ্গের অস্তিত্বের সঙ্কট তৈরি করেছে বলে তিনি মনে করেন।[১০৮] এর পরবর্তীতে তিনি *'কামতাপুরীদের হতাশা ও জঙ্গিপনা'*[১০৯] নামক প্রবন্ধে রাজবংশীদের আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছেন উক্ত বয়ানে। ওনার উপরিউক্ত গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা আলোচ্য প্রবন্ধে অনুরূপ হলেও এখানে রাজবংশীদের কার্যকলাপকে 'জঙ্গি' তকমা দিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। উত্তরখণ্ড, উতজাস বা কেপিপি আন্দোলন- মূলত রাজবংশী জাতি আন্দোলন যা গণ-সমর্থনের অভাব এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে তিনি রাজবংশীর হতাশা বলে উল্লেখ করেছেন। আর এই হতাশাই রাজবংশীদের সন্ত্রাসবাদী কাজে যুক্ত করেছিল বলে মনে করেন। এই অস্ত্র তুলে দিতে সাহায্য করেছেন জমিদার জোতদার মদতপুষ্ট পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন সংগঠন। এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সময় শিক্ষিত রাজবংশী না থাকায় যেমন তারা চাকরি বাকরিতে সুযোগ পায়নি, আর সেই সুযোগে ভাটিয়ারা অফিস আদালতে ভিড় জমাতে শুরু করে। রাজবংশীদের এই বেকার অংশ এবং পরবর্তীতে এদের একটি অংশ লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারাও কাজের সুযোগ পাইনি। তার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন সে সময় কাজের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ওনার নিজের বয়ানে লিখেছেন 'সুতরাং আজ রাজবংশী যুবকেরা অনেকেই যখন কাজের বাজারে নামার যোগ্যতা অর্জন করেছে, তখন দেশে কাজ নেই'।[১১০] এরাই জোতদার জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাম সরকারের উন্নয়নকে

বাধা দিতে চায় বলে মন্তব্য করেন। তবে দীনেশ ডাকুয়া জীবনের শেষ অঙ্কে এসে একটি বই ফরোয়ার্ড করতে গিয়ে লিখেছেন 'আমি গর্ববোধ করি পঞ্চানন বর্মার জায়গায় জন্মগ্রহণ করে এবং মার্কসবাদী চিন্তা দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েও আমি সংস্কারক পঞ্চানন বর্মার ভক্ত'।[১১১] রাজবংশী প্রতিনিধি হিসাবে বাম কমরেড দীনেশ ডাকুয়ার এই অবস্থানান্তরণ দেখে মনে হয় তিনি *'বাঙালি রাজবংশী* নামক এক নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিলেন বাম সরকারের রাজত্বে। যারা শারীরিক ভাবে রাজবংশী এবং মন ও মানসিকতায় বাঙালি। এরাই হয়ে উঠেছিলেন রাজবংশীদের জননেতা। কেননা, ডাকুয়া বাবু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন পর্যটন মন্ত্রী থেকে অবসর নেওয়ার পর সাধারণ বাম কমরেড মত জীবন কাটিয়েছেন এবং উত্তরের অনান্য নেতাদের পরমর্শদাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন।[১১২] ফলত ওনার প্রভাব যে অন্য নেতা নেতৃদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তা বলাই বাহুল্য। অনেকটা বঙ্গের ভদ্র বাবুদের সংস্কৃতিকে বাম শাসনের পরিমন্ডলে নিয়ে এসেছিলেন। উপনিবেশিক শাসনের যেমন উদ্দেশ্য ছিল এমন কিছু বাঙালিকে তৈরি করা যারা শারীরিক ভাবে বাঙালি হলেও মন ও মানসিকতায় সাহেবের ভূমিকা পালন করবে। তারেই অনুরূপ চিত্র ফুটে ওঠে বাম নেতৃত্বের মানসিকতায়। অর্থাৎ উপনিবেশিক শাসনকে হুবাহু অনুকরণ করে বাম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় ছিল। দীনেশ ডাকুয়া বাঙালি মানসিকতা বহন করলেও তাকে নেতৃস্থানীয় বাম নেতারা রাজবংশী হিসাবে বিবেচিত করেন। তার প্রমাণ পাই ওনার নিজস্ব বয়ানে--

'জাতপাতটা হয়তো বিবেচনায় ছিল না তবে ঘটনাচক্রে আমি রাজবংশী মন্ত্রী বলে অন্তত রাজবংশী সমাজে গণ্য হয়েছি। আসামের নির্বাচনে প্রচার করতে গেলে, সেখানকার পার্টিও আমাকে রাজবংশী এলাকায় বক্তিতা করতে পাঠিয়েছিল এবং আমাকে দেশি ভাষায় বক্তিতা দিতে সেখানকার কমরেডরা অনুরোধ করেছিল'।[১১৩]

রাজবংশী মন্ত্রী হিসাবে তিনি রাজনৈতিক জীবনের মধ্যগগনে এসে রাজবংশীদের অভিহিত করেছেন 'হিংসাত্বক রাজবংশী', 'জঙ্গি' ও 'কাল্পনিক সম্প্রদায়'- এই ভিন্ন ভিন্ন অভিধাতে। আবার জীবনের শেষ পর্বে এসে বলছেন তিনি নিজে 'পঞ্চাননের ভক্ত'। চিন্তার এই বৈপরীত্য তার জীবনে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে অর্থাৎ শ্রেণিসংগ্রামের অভ্যন্তরে জাতি বিষয়কে প্রসন করার জায়গা থেকে রাজনৈতিক নেতা হয়ে ওঠার বাস্তবিকতা আমাদের সামনে ফুটে ওঠেছে। বঙ্গের বাম নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এটি একটি নজীর বলা যেতে পারে। এজন্য ডাকুয়া বাবু রাজবংশীদের যেমন অস্বীকার করেছেন এবং বাম শাসনকে স্থিতি দিতে রাজবংশীদের উপকরণ ব্যবহার করতেও পিছপা হননি। এখানে রাজবংশী উপকরণ বলতে সংস্কৃতি কথা বলা হয়েছে। ওনার আত্মজীবনীতে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় --

১৯৯৬ সালে ৯ই আগষ্ট কোন কারণে (কারণ উল্লেখ নেই) পুলিশ ফালাকাটার দুজন স্কুল ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করেন। এই ঘটনা অনেকটাই পার্টিকে জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তা তার লেখায় আভাস পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তিনি পার্টিকে পুর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ফালাকাটায় তিনদিন ব্যাপী ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করেন। একাজে তাকে সাহায্য করেছিল ফালাকাটার বিধায়ক কমরেড যোগেশ বর্মণ। উৎসব আয়োজন করার জন্য ডাকুয়া বাবু, যোগেশ বর্মণ, জেলার ডি.এম. কে নিয়ে সরকারিভাবে ফালাকাটার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে সভা করেন। গোলাগুলির পর ডি.

এমের ডাকে হলেও প্রকৃত পক্ষে পার্টির ডাকে এই প্রথম সভাতে লোকজন কিছুটা জড়ো হয়েছিল। ফালাকাটার জোনাল কমিটির সেক্রেটারি সহ গোটা পার্টি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে এলোমেলো সমর্থকদের আবার গুছিয়ে তোলার সম্ভব হয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[১১৪]

এই দৈত্যতার মধ্যে ওনার অবস্থান কি হবে বাঙালি না রাজবংশী ? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। তা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৮৭ সালে তিনি তপশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। বাম আমলে এই দপ্তরটি যে খুব গুরুত্ব পায়নি এবং ছোটলোকদের দপ্তর বলে সবস্তরের মন্ত্রীরা অবহেলার চোখে দেখতেন তা তিনি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তবে জাতিগতভাবে তিনি তো ছোট লোক আবার ছোট লোকদের মন্ত্রী - এই জায়গাটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সচেতনার জায়গাটি আম্বেদকরের জীবনের ঘটনাবলী ও আম্বেদকরের সংগ্রাম তাকে উপলব্ধি করিয়েছিল বলে তিনি লেখনীতে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ জাতি বিষয়ে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস নীরব থাকলেও তিনি বিষয়টি ভুলে গেছেন এমনটা নয় বরং তিনি লিখেছেন ‘শ্রেণিসংগ্রামের সাথে সমান্তরালভাবে যে জাতি সমস্যা (সংগ্রাম না হলেও) অনভিপ্রেত হলেও এটা বাস্তব সত্য, এটা সব কমরেড বুঝতে চান না। আমাদের পার্টির এটা একটা সমস্যা’।[১১৫] উক্ত দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি দপ্তরে কিছু সংস্কার করেন এবং সংরক্ষণের বিষয়ে তৎপর ছিলেন। কেননা, অনেক সময় সংরক্ষণের ধারা মানা হত না। উচ্চবর্ণের মানুষ সেই পোষ্টগুলি কারচুপি করেন বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সহায়তায় উত্তরবঙ্গে রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম দিকে এই বিষয়টি পার্টির অনেকে পছন্দ করেননি। তা তিনি উল্লেখ করেছেন। সুখবিলাস বর্মার সহায়তায় তিনি

অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। বর্মা জাতিতে রাজবংশী এবং সে সময়কার আই. এ. এস অফিসার। তিনি নিজে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের গায়কও বটে। ফলত সংগীত সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। এই দপ্তরে তিনি ১৪ বছর মন্ত্রীত্ব করেছিলেন। ছোটলোকদের প্রতি দীনেশ ডাকুয়ার টান যে ছিল উপরিউক্ত আলোচনাতে কিছুটা লক্ষ করা যায়। সেকারণে ২০০১ সালে এই দপ্তর থেকে সরিয়ে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী করা হয়েছে বলে একটা সুপ্ত অভিযোগ তিনি লেখাতে ফুটে তুলেছেন।

জাতি আন্দোলন দমন করার কাজে তাকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। একাজ যেমন লেখনী দ্বারা হয়েছে, অন্যথায় পার্টির নির্দেশে তাকে করতে হয়েছে।[১১৬] অন্যদিকে ছোটলোকদের জন্য কিছু করতে হবে এই সংগ্রামও তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। একটা সময় তিনি রাজবংশী না বামপন্থী এই জটিল বিষয়টি ওনার জীবনে ধাঁধার মত অস্পষ্ট ছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন --

> ‘যোগ্যতার বিচারে, না সম্প্রদায়ের বিচারে, আমাকে মন্ত্রী করা হল, সে ধাঁধাটা আমার কোনদিন পরিষ্কার হয়নি। যদিও সম্প্রদায়টাই পার্টির প্রধান বিবেচ্য ছিল এবং তাতে ছাত্র রাজনীতিতে যে মূল্য পেয়েছিলাম, সে মূল্য দেওয়া হয়নি’।[১১৭]

জাতি ও শ্রেণি প্রশ্নে কোন দিকে গুরুত্ব আরোপ করবে সে বিষয়ে ওনার সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাই একটা সময় বলেছিলেন জাতি দ্বন্দ্বকে বড় করে দেখলে শ্রেণি দ্বন্দ্ব গুরুত্ব হারায়। আবার শ্রেণি দ্বন্দ্বকে বড় করে দেখলে জাতি দ্বন্দ্ব গুরুত্ব হারায়।[১১৮] এই কারণে বঙ্গের বাম আন্দোলনে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বাদ দিয়ে বাম শাসন কায়েম হয়েছিল বলা যায়।

৬. উত্তর-উপনিবেশিক কালে রাজবংশী জাতি আন্দোলন

দীনেশ ডাকুয়া মনে করেন রাজবংশী জাতি প্রতিরোধ দেশভাগ পর্বে এসে ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশেষত উদ্বাস্তু প্রশ্নটিকে সামনে রেখে রাজবংশীদের অবস্থান উপস্থাপন করেছেন তাতে পরাজিত জাতির চিত্র ফুটে ওঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজবংশীরা পরাজিত এবং এই পরাজয় একসময় তাদের ভাটিয়াদের প্রতি হিংসাত্বক করে তোলে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ডাকুয়ার এই বক্তব্য অনেকটাই শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বরাজ বসুর অনুরূপ। এই মতামতের সূত্র ধরে তিনি উত্তর-উপনিবেশিক কালে রাজবংশীদের জাতি আন্দোলনের উৎপত্তিগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে ইতিহাসে দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যায় রাজবংশীরা হিংসাত্বক, এই ঘটনা তার অতীত নির্মাণ করেনি। বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় উত্তরবঙ্গ জঙ্গির দেশ হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।[১১৯] এই নির্মাণ যে অনেকটাই বাম সরকারের তা বলা যেতে পারে। শুধু বাইরে নয়, উত্তরবঙ্গের ভেতরেও একটা সময় এমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছিল সেখানে কেউ উচুস্বরে কামতাপুরি নামটি উচ্চারণ করতে ভয় পেত। এমন একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন সবাই সবাইকে ভয় পেত। আমরা স্কুল জীবনে এই সব দেখে এবং শুনে বড় হয়েছি। যাইহোক দেশভাগ পর্বে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্তাক্ষয়ী সংগ্রাম দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গে তার নজীর পেলে নি। এমনকি আসাম বা ত্রিপুরাতে ‘বাঙাল খেদাও’ আন্দোলন হলেও উত্তরবঙ্গে তার চিহ্ন নেই বরং রাজবংশীরা উদ্বাস্তু মানুষের পাশে থেকে তার নতুন ‘বাধ্য জীবন’ সংগ্রামকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের বয়ানটিতে--

> ‘দলে দলে হিন্দুর ঘর চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি, জাগা জমি, ঘর বাড়ি, ধনসম্পত্তি ফেলেয়া জিয় কিনা হাতত নিয়া কাহ কায় এক পিন্দনে রাত্তির অন্ধকারত পালেয়া

> আসিবার ধল্লেক। সেই সময় হিন্দুস্থানের রাজবংশী জোতদারের ঘর জাইতা অনজাইতা হিন্দুভাই হিসাবে সগাকে জাগাজমি দিয়া, বাড়ি ঘর দিয়া রিফুজিলাকে সাহায্য করেছিল। গরুচড়ার ডাঙ্গা, খেড়বাড়ির ডাঙ্গা, জঙ্গলবাড়ির ডাঙ্গা বিনা পয়সায় রিফুজিলাকে বাড়ি করিবার দিছিলো। এইঠে রাজবংশী সমাজের উদারতা, দানশীলতা, অথিতিপরয়নতা প্রমাণ হয়'।[১২০]

রাজবংশী সমাজের আদিসত্তার একটি রূপ উক্ত বয়ানে লক্ষ করা যায়। কারণ যে জাতি দোতরা বাজিয়ে গান করে জীবন অতিবাহিত করত তাদের কীভাবে হিংসাত্বক বলা যায় ? হিংসাত্বক নয়, বিদ্রোহী হতে পারে যেমনটা দেখা গেছে রংপুরে সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহে। রাজবংশীরা ভাটিয়া বিদ্বেষী- এই ব্যাখ্যা বাম-রাজনীতির। বিদ্বেষের জায়গাটি রাজবংশী জাতি আন্দোলনে উঠে এসেছে একটু ভিন্ন ভাবে, অর্থাৎ এর বিপরীত অর্থকে সামনে রেখে। দেশভাগের পর ভাটিয়ারা ধীরে ধীরে সমাজে স্থায়িত্ব পেলে রাজবংশীদের প্রতি বিরূপ আচরণ করেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। রাজবংশী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি উচ্চবর্ণের বিসুলভ আচরণ থেকেই প্রতিবাদের ভাষা উঠে আসে। অনুপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে শহরে রাজবংশীদের খুঁজে পাওয়া যায় না, ভাটিয়াদের দ্বারা উত্তরবঙ্গের শহরগুলো জনসমারোহ। সেই পরিসরে রাজবংশীদের হেয় করে দেখার থেকে সংঘবদ্ধতার প্রশ্নটি উঠে আসে। সংঘবদ্ধতার প্রশ্নটি এখানে 'চ্যালেঞ্জ' স্বরূপ বলা চলে। তার ভিত্তি রাজবংশীরা প্রতিষ্ঠা করেন এইভাবে– *'বিপদে আমাদেরেই বাপ ঠাকুরদারা ওদের আশ্রয় দিল, ইজ্জত বাচাল, জমি দিল আজ আমাদেরকেই অপমান করে'*। এই পটভূমিকা রাজবংশীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়। ১৯৭৬ সালে তৈরি হয় *'উত্তরবঙ্গ তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সংগঠন* বা *'উতজাস'*। এটি মূলত ছাত্র সংগঠন হলেও পরবর্তীতে এর দাবি এবং জনপ্রিয়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে

সাধারণ সমাজে প্রভাব বিস্তার করে।[১২১] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীদের কর্তৃত্ব থাকলেও শহরাঞ্চলের প্রতিচ্ছবি একেবারেই বিপরীত। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে উভয় স্থানের উভয়ের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি জোড়াল হয়ে উঠেছিল। ফলত রাজবংশীদের আন্দোলনকে জোরাল করতে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। যেমন *'উত্তরখণ্ড*, *'কামতাপুর গণ পরিষদ'*, *'অল কামতাপুর স্টুডেন্ট ইউনিয়ন'* (আকসু), *'কামতাপুর পিপলস্ পার্টি'* (কেপিপি), *'কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন'* (কে.এল.ও.), *'দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ এ্যাসোসিয়েশন'* (জিসিপিএ) এইসব সংগঠনগুলি চক্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনগুলির দাবি ও আন্দোলনের পরিভাষা প্রায় অনুরূপ। সাংগঠনিক আদব কায়দা কিছুটা স্বতন্ত্র। যেমন কে.এল.ও.রা সশস্ত্রভাবে আন্দোলনের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। উতজাস আন্দোলনের কয়েকবছর পূর্বে ১৯৬৯ সালে 'উত্তরখণ্ড দল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে নতুন করে 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠার পর সমিতির সদস্যের একটি অংশ সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ছিল অনেকটা উত্তরবঙ্গে কোন রাজনৈতিক দল না থাকার জায়গাটিকে ধরে। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি দলের অস্তিত্ব রয়েছে তার নেতৃত্ব কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও উত্তরবঙ্গে সেরকম কোন দলের অস্তিত্ব না থাকায় উত্তরখণ্ড নামে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ নামে দল প্রতিষ্ঠা করেন বলে যুক্তি উপস্থাপনা করেছেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা সেই শাসকের ভূমিকাতে আসতে চাইছে। এই আসার জায়গাটা অনেকটা অবমাননা বা অবহেলার প্রশ্নকে সামনে রেখে। কলকাতার দলগুলোর উত্তরবঙ্গকে নিয়ে বিমাতৃসুলভ মনভাব লক্ষ করেছেন রাজবংশী সমাজের শিক্ষিত মহলের একটি অংশ। 'উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত' এই প্রশ্নটি রাজবংশীরাই বোধহয়

সর্বপ্রথম জনসম্মুখে তুলে ধরেন এবং পরবর্তীতে বাম নেতারা তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন অমর রায় প্রধান এবং দীনেশ ডাকুয়ার উপরিউক্ত বয়ানের কথা বলা যায়। সেই অবহেলা বা বঞ্চনা থেকে ১৯৮০ সালে রাজবংশীরা 'কামতাপুরের স্বতন্ত্রতার দাবি' নিয়ে উত্তরখণ্ড দলের কর্মসূচি প্রস্তুত করেন।[১২২] কামতাপুর স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি জনসন্মুখে আসলে বঙ্গের রাজনীতিতে একটা নতুন বিষয় যুক্ত হয়, তা হল বঙ্গের বিভক্তিকরণ। এতে বামপন্থী নেতাদের বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল বলে মনে করেন উত্তরখণ্ড দলের সহঃসভাপতি হরিমোহন বর্মণ। তিনি লিখেছেন এই আওয়াজ ওঠা মাত্রই অনেক জননেতা (বাম নেতা) বড় বড় মিটিং করে বলতে শুরু করেছিলেন--

> *'হামেরা কাচুয়া হাতে এত বড় হনু কিন্তুক কোনদিন কামতাপুর রাজ্যের নাম শুনি নাই। কামতাপুর বুলিয়া কুন রাজ্য যে আছিলো তাহ জানিনা। একটা নয়া দল (U.K.D) দেশটাক ভাগ করিবার তানে শয়তানী নিকিলাইছে। হিলা বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্রান্ত। ভাইসব উমার কথা না শুনেন'।*[১২৩]

(ভাষান্তর: আমরা ছোট থেকে বড় হলাম কোনদিন কামতাপুরের নাম শুনিনি। কামতাপুর রাজ্য ছিল আমরা জানি না। উত্তরখণ্ড একটি নতুন দল, দেশটাকে বিভক্ত করার চক্রান্ত করছে। এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। এদের কথায় কেউ কান দিবেন না)।

অপর দিকে কংগ্রেস নেতৃ সবিতা দেবী লিখেছেন--

> '...এবারই কমলবাবুর (গুহ) হাঁটু কাঁপছে গ্রেটারের বিরুদ্ধে মিটিং, মিছিল এবং সর্বাত্বক চালানোর নির্দেশ গেছে দলীয় কর্মীদের কাছে। দিনহাটার রাজধানীতে মহাসম্রাট ঘনঘন সমাবেশ ডাকছেন'।[১২৪]

উপরের বয়ানগুলিতে দেখা যাচ্ছে রাজবংশী জাতি আন্দোলন একসময় মুলস্রোতের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। যাইহোক, হরিমোহন বর্মণ বলেছেন কামতাপুর রাজ্যের কথা বঙ্গের ইতিহাসে স্থান পায়নি। সেকারণে বাম নেতারা অনেকে

আঁতকে উঠেছেন কামতাপুরের নাম শুনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কামতাপুরের ইতিহাস বঙ্গের ইতিহাসে যুক্ত না করে বাঙালির আদিপত্য উত্তরবঙ্গে চাপিয়ে দিয়েছেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১২৫] অর্থাৎ কামতাপুরের কথা না জেনেই কি বাম নেতারা একে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে দাবি করেছেন ? অন্যথায় বঙ্গের ইতিহাসের এই একমাত্রিকতা কি বিচ্ছিন্নতার বহিঃপ্রকাশ ? হরিমোহন বর্মণ ১৯৮৯ সালে *'উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্য কতদূর যুক্তি গ্রাহ্য*[১২৬] নামে ১৬ পাতার একটি ক্ষুদ্র বই রচনা করেন। ওঁনার পৃথক রাজ্যের যুক্তির দিকে তাকালে বুঝতে সুবিধা হবে কীভাবে কামতাপুর রাজ্যের স্বতন্ত্রতাকে উপস্থিপিত করেছেন।

৬.১. কামতাপুর রাজ্য গঠনের যুক্তি: হরিমোহন বর্মণ

প্রথমত: তিনি সাংবিধানিকভাবে পৃথক রাজ্যে গঠনের জন্য যা প্রযোজন তার নিরিখে যুক্তিকে উপস্থাপন করেছেন। সেই দিক বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ আলাদা করা জন্য মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত: আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্য গঠনের ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি পৃথক রাজ্যের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই নজীর দিয়ে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করার যুক্তি দিয়েছেন। যেমন বোম্বাই, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশকে ভেঙ্গে দুটো করে রাজ্য করা হয়েছে। আসামকে ভেঙ্গে পাঁচটি রাজ্য করা হয়েছে। সেই নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে ভেঙ্গে দুটো রাজ্য করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত: পৃথক রাজ্যে সৃষ্ট হলে সরকারের কি ধরনের সুবিধে হতে পারে সেই দিকে নজীর রেখে বক্তব্য রেখেছেন। উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য হলে কেন্দ্র সরকারে কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা অর্থাৎ স্বতন্ত্র রাজ্য হলে সরকারকে প্রতিবছর ভরতুকি দিতে হবে কিনা সে জায়গাটি বিবেচনা করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। উত্তরবঙ্গে যত

প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তা ব্যবহার করে রাজ্য পরিচালনা করা যেতে পারে বলে মনে করে। বিশেষত চা, পাট, তামাক, কাঠ, বনভূমির ভেষজ সম্পদ, বাঁশ, ডলোমাইট, কয়লা, তামা, বক্সাইট, জিপসাম প্রভৃতি খনিজ সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি খরস্রোত নদীকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে উত্তরবঙ্গকে শিল্পোন্নত করা যায়। এছাড়াও ক. বনজ ভেষজ দিয়ে ঔষধ কারখানা হতে পারে, খ. বাঁশ ও নরম কাঠ দিয়ে কাগজ শিল্প হতে পারে, গ. পাট দিয়ে পাট শিল্প হতে পারে, ঘ. ডলোমাইট দিয়ে সিমেন্ট শিল্প হতে পারে, ঙ. তামাক দিয়ে চুরুট ও সিগারেট শিল্প হতে পারে।

চতুর্থত: রাজ্যের আয়তন ও লোকসংখ্যার নিরিখে ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম এই সব রাজ্যের তুলনায় উত্তরবঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্যা অনেক বেশি। সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গ একটা পরিণত রাজ্য হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। যার বর্তমান জনসংখ্যা দেড় কোটি। (তাদের কামতাপুর রাজ্যের সীমানা উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাকে নিয়ে করা হয়েছিল)[১২৭]

পঞ্চমত: কেন কামতাপুর নামকরণ করা হয়েছেন উত্তরবঙ্গ না করে তার উত্তর দিয়েছেন এই ভাবে- বোম্বাই এর নাম পরিবর্তন করে মহারাষ্ট্র কিংবা মাদ্রাজ থেকে তামিলনাড়ু করা হয়েছে। সেই অর্থে উত্তরবঙ্গের বদলে কামতাপুর নামকরণ করা হয়েছে। এই নামকরণের পিছনে তিনি স্থানের অতীত ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কামতাপুরের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যা তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছেন *‘কামতাপুর রাজ্যের কাহিনী’ নামে*।[১২৮] এখানকার শাসকদের পরাক্রম যেমন তিনি তুলে ধরেছেন তেমনি মুসলিম শাসকদের হাত থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে শাসন করার নজীর দেখিয়েছেন।

ষষ্ঠত: পৃথক রাজ্যের কারণ বলতে গিয়ে তিনি কলকাতা-কেন্দ্রিক শাসন থেকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হয়নি এবং হবেও না বলে মনে করেন। উপরন্তু উত্তরবঙ্গবাসীর প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে দেখার প্রবণতা তাদের পৃথক রাজ্যে স্থাপনের দিকে নিয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত এই পরিভাষা অনুপূর্বে বাম বয়ানের জায়গা থেকে উল্লেখ করে হয়েছে। সেই নিরিখে এনার বক্তব্য অনুরূপ বলা যায়।

সপ্তমত: পৃথক রাজ্য হলে উত্তরবঙ্গবাসীর কি লাভ হবে? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন যে কেন্দ্র সরকার প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গের জন্য এখন প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। পশ্চিমবঙ্গের যা আয়তন তার চার ভাগের এক ভাগ হল উত্তরবঙ্গ। সেই ধারা মোতাবেগ ২৫০ কোটি টাকা উত্তরবঙ্গের প্রাপ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ উত্তরবঙ্গের জন্য ৫০ কোটি টাকাও ব্যয় করে না।

অষ্টমত: উত্তরবঙ্গ নতুন করে রাজ্য হলে তার সীমানা নতুন করে তৈরি করতে হবে না। প্রাকৃতিক সীমানাই উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে রেখেছে।

৬.২. আধুনিক জাতি আন্দোলন ও রাজবংশীদের আদিসত্তার প্রকাশ

বামপন্থী নেতাদের বয়ান এবং আন্দোলনকারীর দেওয়া ব্যাখ্যা এই দুইয়েই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ধারণা লাভ করা যেতে পারে কীভাবে কামতাপুর বঙ্গের রাজনীতিতে আলোচনায় বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। বঙ্গের পাঠ্যপুস্তকে কামতাপুরের ইতিহাস সংযুক্ত না হওয়ার ঘটনা যেমন রাজবংশীদের একটি অংশের কাছে বঞ্চনা বলে মনে হয়েছে তেমনি বাম নেতাদের কাছে তা মিথ বা উপকথন হওয়ার কারণে স্বীকৃতি আদায় করতে পারিনি। রাজবংশীদের কাছে যা ইতিহাস বামপন্থীরা তাকে মিথ বলে এড়িয়ে গেছেন। এতে উভয়ই দ্বান্দিকতায় জড়িয়ে পরে। এই সংগ্রামে রাজবংশীরা জনসচেতনা প্রসারে *'বঞ্চনা'* নামক ভাষ্যকে প্রকট

করে রাজনীতির পরিসরে। অন্যদিকে সরকার রাষ্ট্র শক্তিকে ব্যবহার করে ভীতি সৃষ্টি করে রাজবংশীদের আলাদা করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। এই আলাদা করে দেওয়ার জায়গা থেকে বিচ্ছিন্নতা কিংবা সন্ত্রাসের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা থেকে রাজবংশী অতীত ইতিহাসের দাবি তথা স্বতন্ত্র রাজ্যে গঠনে প্রস্তাব উঠে এসেছে। জন্ম হল **১৯৯৬** সালে *'কামতাপুর পিপলস পার্টি'* বা কেপিপি। আন্দোলনের দাবির ভাষা পূর্বের ন্যায় হলেও আন্দোলন অনেকটাই বলিষ্ঠ আকার নেয়।[১২৯] কোন আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে তা স্থিমিত হয়ে পড়ে। সেই শ্লথ অবস্থাকে সক্রিয় করতে 'কামতাপুর পিপলস পার্টি' নামকরণ করে একটি নতুন দল গড়ে তোলেন। অর্থাৎ একটি রাজবংশী গ্রুপ অপর গ্রুপকে সক্রিয় করার তাগিদ থেকে নতুন নতুন দল গঠনে সাহায্য করে। এতেও যখন সুবিধে করতে পারছেন না তখন দেখা গেল আর একটি সংগঠনের তৈরি হতে। **১৯৯৮** সালে *'দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এসোসিয়েশন'* নাম দিয়ে নতুন দল গড়ে তুললেন।[১৩০] চক্রাকারে এই সংগঠনগুলির উৎপত্তিগত দিকটি রাজবংশী জাতির আদিসত্তার একটি বিকল্প রূপ। অনুরূপ দাবিকে সামনে রেখে বিভিন্ন পরিভাষায় দাবি আদায়ের কৌশল অবলম্বন করে পারস্পারিকভাবে চতুর্দিক থেকে চারটি প্রধান দল (উত্তরখণ্ড, উতজাস, কেপিপি এবং দি গ্রেটার কোচবিহার এ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠা করেন। এটিকে জাতি প্রতিরোধে এক অন্যমাত্রা বলা যায়। কীভাবে জাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা যায় তার জন্য বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ব করতে দেখা যায়। অনেক সময় বলা হয় সংগঠকদের মনমালিন্যের কারণে বা ক্ষমতার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্তকরণের প্রশ্নে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মনে হয় বিষয়টি সেরকম নয়। রাজবংশী জাতির এটি একটি প্রতিরোধের মাধ্যম বলা যায়। কারণ নির্দিষ্ট লক্ষবিন্দুকে সামনে রেখে সমান্তরাল পথে প্রস্থান করে- এটা

আদিমতার অভিব্যক্তি। আবার একটা সময় সবাই একেই জায়গায় মিলিত হয়। যেমন লক্ষ করা যায় প্রজা, জমিদার, মৈশাল এবং গাড়িয়াল সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন পথে এগিয়ে গিয়ে আবার সংঘবদ্ধ হয়েছে। এই সংঘবদ্ধতার অপর নাম হল রাজবংশী। তারেই অনুপম নির্দশন লক্ষ করা যায় আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। এমনকি বাম সরকারের প্রতি সমস্ত রাজবংশী সমাজ ঝুঁকে গিয়েছিল এমনটা নয়। তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের নেতারা যেমন অমর রায় প্রধান বা কমল গুহরা কীভাবে ভোট পেতেন! এমনকি বামপন্থী দল থেকে বেড়িয়ে জাতি রাজনীতি করা নজীরও আছে। গ্রেটার আন্দোলনের সুপ্রিমো বংশীবদন বর্মণ তো দীনেশ ডাকুয়াদের দলের লোক ছিলেন।[১৩১] অর্থাৎ শ্রেণি থেকে জাতি রাজনীতিতে উত্তরণ ঘটার ঘটনা বুঝতে সাহায্য করে জাতি তার অভিজ্ঞতা মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে রাজবংশী ও শ্রেণির মধ্য একটা মিলগত দিক রয়েছে, সেই জায়গা থেকে তাদের সংযুক্তি ঘটতে পারে এবং বিযুক্তির প্রশ্নে জাতি তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়। সব শেষে বলা যায় রাজবংশীরা সমষ্টিবাচকভাবে নিজের প্রতিরোধ তৈরি করে। তার প্রমাণ আমরা পাওয়া গেল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে। ১১টি দল[১৩২] একত্রিত হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছিলেন। অর্থাৎ চিত্রটা *'ছাতার মত'*, প্রয়োজনে প্রকাশ করেছে নতুবা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। প্রগতিবাদীরা রাজবংশীদের এই গতিশীলতাকে বুঝতে পারেননি বলে বার বার জাতি প্রশ্নের সন্মুখিন হতে হয়েছিল। অথচ রাজবংশীরাই প্রথম বাম চিন্তাভাবনাকে তেভাগার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসেন বঙ্গের রাজনীতিতে। এই বুঝতে পারা এবং না পারা মধ্য দিয়ে রাজবংশী প্রশ্নটিকে স্থিমিত করে দিয়ে বাম-রাজনীতির কার্যকলাপ তৈরি হয়েছিল। এই যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ছিল তার সংস্কৃতিকে

ধরে। যা বাম আন্দোলন প্রসারের একটি পন্থা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তা নিম্নে আলোচিত হল।

৭. বঙ্গের শ্রেণি ইতিহাস ও রাজবংশী সংস্কৃতি: ব্যাখ্যা ও রাজনীতি

আলোচ্য সন্দর্ভ রচনার শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে শ্রেণি রাজনীতি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে জাতিগত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। সেই নিরিখে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি ব্যবহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বামেদের সম্পর্ক স্থাপনে তা কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছে তার একটি আলোচনা রাখব।

জাতিগত উপাদান আন্দোলনে যুক্ত হলে স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে আন্দোলনকে সংপৃক্ত করা সহজ হয় এবং জনগণের সঙ্গে সংগঠকদের বোঝাপড়া অনেকটাই কাছাকাছি চলে আসে। তারেই অনুরূপ বয়ান লক্ষ করা যায় বাম সংগঠকদের লেখনীতে --

> তাঁরা (সংগঠনের নেতারা) ঘনিষ্টভাবে নারী-পুরুষ সবার সাথে অন্তরঙ্গ ভাবে মা, বৌদি, ভাই, ভগ্নি, বন্ধু সম্পর্কে মিলেমিশে যান। নাম ধরে ডাকা তুই, তুমি সম্বোধন সাধারণ হয়ে ওঠে। আলাপ-আলোচনায় পার্টি আন্দোলনের লক্ষ্য, পদ্ধতি, শোষনহীন মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, নারী মুক্তির কথা, নতুন ভাবধারার কথা আলোচনা হত। পার্টি সাহিত্য পাঠ হত। বাড়ীর মেয়েরা সব সময় বৈঠকে যোগ দিতেন না। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন। সুযোগ পেলেই নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে ধরতেন। নিজেদের অবস্থার কথা, আশা-আকাঙ্খার কথা বলতেন। তাতে বিবাহিত জীবনের সমস্ত দুঃখ আঘাতের কথাও থাকত।...[১৩৩]

'নাম ধরে ডাকা তুই, তুমি সম্বোধন সাধারণ হয়ে ওঠে'। এই বাক্যটি রাজবংশী ভাষা রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়। তুমি কে রাজবংশী ভাষায় 'তুই' বলা হয়। এই 'তুই' এর

রূপান্তর তুমিতে আসার আবডালে বঙ্গীয় ভাষার রাজনীতি কীভাবে রাজবংশী সমাজকে বাংলা ভাষাতে অর্ন্তভুক্ত করে তার একটি এটি নজীর। যাইহোক, সংগঠন গড়ে তোলা এবং আন্দোলন ব্যপ্তির অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে জাত বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায্য করে। বাম আন্দোলনের প্রসার হেতু কখন কখন রাজবংশীদের অস্তিত্বকে বাম নেতারা মৌখিকভাবে বৈধতা প্রদান করেছিল। অন্যদিকে রাজবংশীরা কামতাপুরী ভাষাকে অষ্টম তপসিলে যুক্ত করা জন্য আন্দোলন গড়ে তুললে তা অবাস্তব, কাল্পনিক- পরিভাষা দিয়ে আন্দোলন দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। এই দৈত্যতার (Paradism) মধ্য দিয়ে রাজবংশীদের জীবন ও সংস্কৃতি পরিচালিত হয়েছে তাদের ৩৪ বছর রাজত্বে। আমরা প্রথমে দেখব সাম্যবাদী ভাবনা এবং বামফ্রন্ট সরকারের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে নিবারণ পন্ডিত এর উদ্যোগকে।

৭.১. নিবারণ পন্ডিত (১৯১২-১৯৮৪)

নিবারণ পন্ডিত ১৯১২ সালের ২৭ই ফেব্রুয়ারী, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহাকুমার সগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ছোটবেলার থেকে সংগীতের প্রতি আগ্রহ তাঁকে পরবর্তীতে বাংলার লোককবি ও গায়ক হিসাবে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হতে সাহায্য করেছিল। একসময় সাম্যবাদী ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তাঁকে ছোটবেলার থেকে অভাব অনটন নিয়ে বড় হতে হয়েছিল। সেই অভাব মেটানোর জন্য বিড়ি বাঁধার কাজ করে দিনাতিপাত করতেন। দেশভাগের পর তিনি ও তার পরিবার কোচবিহার জেলা এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সংসার চালানোর জন্য তিনি পুরানো ব্যবসাকে পুনরায় শুরু করেন। তাঁর গানে প্রতিবাদের ছায়া প্রকাশ পেত। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর তাঁর গান মঞ্চে থেকেও প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই

নয়, বাম মঞ্চের উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে তাঁর গান স্থান পেয়েছিল। ফলত বুঝতে অসুবিধে হয় না বাম আন্দোলনে নিবারণ পন্ডিতের অবদান। আমরা আলোচ্য অংশে শুধুমাত্র রাজবংশীদের নিয়ে যে সব গান তিনি রচনা করেছিলেন তা নিয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তাঁর গানে একদিকে দেখতে পাওয়া যায় রাজবংশী সমাজের পরম্পরা কথা এবং একই সঙ্গে সেই পরম্পরার থেকে বেরিয়ে যাবার কিছু ইঙ্গিত। অর্থাৎ পরপম্পরা বাম ঘরনার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। তাঁর লেখা একটি গান ১৯৭৬ সালে গণনাট্য থেকে প্রকাশিত হয়। গানের কয়টি লাইন এখানে তুলে দেওয়া হল--

‘আরে ও মোর বন্ধু দরদীয়া

(বুঝি দেখ) কায় বানাইল্ তোমাক্ নবীন বাউদিয়া ।।

কোন দোষত্ গেইল্ তোর ভিটামাটি

বেচেয়া খাইলেক্ কুল্লে গয়নাগাটিরে

কোন দোষত্ শেষ থালাবাটি, খাইলেক্ তুই বেচেয়া।।...

কি আছে তোর ভয় ডর

বাঁচির বাদে লড়াই কররে

মরবি যদি মরে যা তুই বাচার লড়াই করিয়া’।। ...[১৩৪]

উক্ত গানটি রাজবংশী ভাষায় রচিত হলেও বাংলা ভাষার শব্দ মাঝে মাঝে স্থান পেয়েছে। যেমন নবীন (নয়া), শেষ (শ্যাস)। তোমাকে, কে নতুন করে বাউদিয়া বানাল। ভিটেমাটি কোন দোষে শেষ হয়ে গেল তোমার। তোমাকে আজ সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এই জীবন যখন তোমার হল, ভয় করে কি হবে বরং ভয় না করে শেষ লড়াইটা করে যা। গানটির হল এই সারসংক্ষেপ। স্পষ্টতই লক্ষ করা যায় জমি জায়গা হারানোর পর কেউ বাউদিয়া বা ভবঘুরে হয়েছে। তবে

রাজবংশী সমাজে বাউদিয়ার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে একেবারে ভিন্ন মতামতকে ধরে। সেই মতামতের জায়গাটা অনেকটা এই রকম- বাউদিয়া হয়ে ওঠার জন্য কাউকে জমি হারাতে হয়নি বরং বাউদিয়া হয়ে যাওয়ার পশ্চাতে উদাসিনতার প্রসঙ্গটি জরিয়ে ছিল। যার কারণে ঘর বাড়ি বিষয় সম্পত্তি সবেই গুরুত্বহীন। তার নজীর দেখা যায় রাজবংশী একটি কবিতায়--

তোরে বাদে

'তোরে বাদে বাউদিয়া হলুং, চিতান্ ভাওয়াইয়া
দ্যাওয়ায় দ্যাওয়ায় ম্যাঘ-ম্যঘালির অচিন্ গাওয়াইয়া

তোরে বাদে আব্বাসুদ্দীন, নায়েব আলিরঘর
আকাশ বাতাস মাতাল করে বচ্ছর বচ্ছর

তোরে বাদে পাহাড় থাকি হলুং অক্ত-নদী
এক্কে কথায় ছাড়িয়া দিলুং আজ্যপাটের গদি'...[১৩৫]

বাউদিয়া জমি জায়গা বিষয়ে উদাসিন। এমনকি ভাওয়াইয়া গানের নেশায় ঘর বাড়ি, শয়সম্পত্তি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে উদাসিন জীবনকে বেচে নিয়েছে। কিন্তু পন্ডিতের গানে দেখানো হয়েছে জমি হারানোর মধ্য দিয়ে বাউদিয়ার আবির্ভাবকে। একই সঙ্গে জমি ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বাম ঘরনার মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজকে প্রতিফলিত করার এই প্রচেষ্টা একদিকে বাম আন্দোলনের প্রসরতা প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। অন্যথায় একে রাজবংশী সমাজকে নতুন করে নির্মাণ করার উদ্যোগ বলা যায়। তাঁর অপর একটি গান দেশভাগ পরবর্তীতে উদ্বাস্তুদের নতুন সংগ্রাম নিয়ে লেখা হয়েছে। গানটির হল--

মূর্খ্যু গিদাল হামরাগুলা ভাওয়াইয়া গান গাই

হাল বাড়ীর কামাই সারি দুতারা ডাঙ্গাই

সুখ দুঃখের কথা যেলায় মনতে পড়িল

চট্‌কা সুরে দুতারা ডাং, বাজিয়ারে উঠিল ।।

স্বাধীন হইনু ঘর হারাইনু নাই আর ভিটেমাটি

পরার ভূইয়ত ঘর বান্ধিয়া পরার ভূইয়ত খাটি

দিন মনে সেই আড়াই টাকা মজুরি পাইয়া

মাইয়া ছাওয়ায় রুটি চাবাই আন্ধারত বসিয়া।।...[১৩৬]

গানটি ১৯৭৬ সালে গণনাট্যে প্রকাশিত হয়েছিল। অশিক্ষিত গিদাল (গায়ক) আমরা, ভাওয়াইয়া গান গাই। কাজ করতে করতে (বিশ্রামের সময়) দুতারা বাজাই। দুঃখের কথা মনে পড়লে দুতারা বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গান করি। স্বাধীন হয়ে ঘর হারিয়েছি, জমি ভিটেমাটিও। এখন পরের জমিতে থাকি, পরের কাজ করি। সারাদিন কাজ করে আড়াই টাকা মজুরি পাই। সেই পয়সায় রুটি খাই বউ বাচ্ছা মিলে অন্ধকারে বসে। এই হল গানের ভাষা। বোঝাই যাচ্ছে উদ্বাস্তু মানুষের জীবনকাহিনী এতে তুলে ধরা হয়েছে। দেশভাগ তাদের জমি জায়গা ভিটেমাটি সব কেড়ে নিয়ে স্বাধীন করেছে। বাধ্য হয়ে অন্যের জমিতে বাড়ি করতে হয়েছে এবং সেই ব্যক্তির জমিতে মজুরি খেটে দিন কাটছে। দেশভাগের পর তিনি কোচবিহারে চলে আসেন। ফলত কোন স্থানীয় মানুষের জমিতে ঘর করে উদ্বাস্তুরা জীবনযাপন করছে তারই চিত্র তিনি গানে তুলে এনেছেন। তবে দেশি মানুষের আতিথেয়তা, বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা এমনকি বিপদে জমি জায়গা দিয়েও সাহায্য করার প্রসঙ্গটি বিভিন্ন পরিভাষায় এমনকি জাতি আন্দোলনে ওঠে এসেছে। যেমন--

> দেশভাগ ও তৎসহ সাম্প্রদায়িকতার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ শরণার্থী দলে দলে কোচবিহারে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানকার অধিবাসীরা মানবিক সহমর্মিতায় তাদের (উদ্বাস্তু) স্থান দিয়েছিল। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই।[১৩৭]

এজন্য বাড়ি করার জন্য জমি ক্রয় করেছেন এমন কোন ইঙ্গিত গানটিতে নেই। আবার যার জমিতে থাকতে দেওয়া হয়েছে তার বাড়িতে কাজ পেয়েছেন। কাজ করছেন পয়সার বিনিময়ে। বলা হয় পতিত জমি অনেক সময় ভাটিয়াদের দেশি মানুষ দান করেছেন ঘর বাড়ি তৈরি করার জন্য। এই গান তারেই অভিব্যক্তি। কিন্তু মজুরি বিষয়টি এখানে নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে। কারণ তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং বাম রাজনীতিতে শ্রমের বিষয়টি নিয়ে আসার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন। রাজবংশী ঘরে খাবার দাবারের অসুবিধা না থাকলেও টাকার অভাব ছিল এমনটা বেশ শোনা যেত।[১৩৮] হয়ত মজুরির ব্যবস্থা তত দিনে গ্রাম বাংলায় চালু হয়েছিল। আর একটি গানে জমি দখল, রেকর্ড এই নিয়ে লেখা হয়েছে। গানটি হল--

ও কিরে হালুয়া
দখল রাখ ভুঁই দখল লেখাইয়া।
গিরিওলার ফাসার ফুসুর তুই কেনে শুনিসনা?
কনে তুই দেখিয়াও দেখিসনা, উয়ার দুমদুমি কোনা
হাল তুলিবার বুদ্ধি কত তোকে মারিয়া।।
হালুয়ার নাম রেকর্ড হইবে, ভুঁইটা চাষ করিছে যে
নগদ জরীপ নামিবে, হালুয়া নামটা বসিবে
হালুয়ার নাম রেকর্ড কর তুই জুট বান্ধিয়া।।
এবার যদি হালুয়া নাম রেকর্ডভুক্ত হয়
হালুয়া না পুছা আর নয়, নাই উচ্ছেদের আর ভয়

ব্যাঙ্ক সেলাই ঋণ যোগাবে তোকে ডাকিয়া।।[১৩৯]

'হালুয়া' অর্থাৎ চাষি, যে জমি (ভুঁই) চাষ করছে, তাকে সেই জমি দখল করে রাখতে বলা হচ্ছে। রেকর্ডে নাম লেখাতে হবে। জোট বেঁধে হালুয়ার নাম রেকর্ডে তুলবে- এমন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে গানটিতে। একবার *'হালুয়া'*র নাম রেকর্ড হলে গিরি তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। *হালুয়া*র মর্যাদা বাড়বে। জমির মালিক হলে ব্যাঙ্ক এসে লোন দিবে। গানটির এই হল সারমর্ম। অর্থাৎ গিরির উপর হালুয়াকে নির্ভরশীল থাকতে হবে না যদি নিজের নামে জমি রেকর্ড করাতে পারে। হালুয়ার নামে জমি হলে গিরির কাছে হাত পাততে হবে না। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিতে পারবে। হালুয়া অর্থাৎ প্রজার জীবনের এক রূপান্তর ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসার বার্তা লক্ষ করা যায় উক্ত গানে। গানের মধ্য দিয়ে এই প্রচার আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছিল যা অন্যদিকে প্রজাকে বাজার অর্থনীতির মুখমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ভূমিসংস্কারের নামে চাষি থেকে শ্রমিক তৈরি করার উদ্যোগ চলছিল বামপন্থার নীতিতে তারেই আভাষ ফুটে উঠেছে আলোচ্য গানটিতে। গানের মধ্য দিয়েও যে রাজনীতি করা যায় সেটা রাজবংশীরা না বুঝলেও ভাওয়াইয়া যে তাদের মাটির গান, আপন গান, আপন ভাষায় যখন গানের সুর ভেসে ওঠে, এতে রাজবংশীরা আবেগে মিশে গেলে আশ্চর্য হবার কি আছে!

গানটি বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিনীতি ও অপারেশন বর্গাকে সমর্থন করে লেখা। গানটি রচিত হয়েছিল ১৯৭৯ এ। 'নন্দন' আষাঢ় সংখ্যায় ১৩৮৬তে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য সময় পর্বে জোতদারের জমি খাস হবে - এই প্রতিধ্বনি গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। কারণ জোতদাররা এই সময় নিজের আত্মীয় পরিবার পরিজনদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করতে শুরু করেন।[১৪০] এমতাবস্থায়

নিবারণ পণ্ডিত তাঁর গানের মধ্য দিয়ে বার্তা ছড়িয়ে দিতে লাগলেন *‘হালুয়া’* ভাই যে যেখানে জমি চাষ করতে, সেই জমি দখলে রাখ এবং নিজের নামে রেকর্ড করাও। একা না পারলে সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে চল। জমি দখল রাখার একটা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। কেননা জোতদার জমি নিজের পরিবারে সদস্যদের নামে রেজিস্ট্রি করাতে শুরু করে দিলে উচ্ছেদ হওয়ার বিপদ সামনে চলে আসে। জমি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে চাষিদের সংঘবদ্ধ করার জায়গা থেকে এই গানটি রচিত হয়েছিল। তা যে ব্যাপক আকার ধারণ করে তা বোঝা যায় নিচের বয়ানটিতে--

> ভাগচাষি উচ্ছেদের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। সেখানে উত্তরবঙ্গ বাদ পড়েনি। উত্তরের শিলিগুড়ি মহকুমার ওরাই অঞ্চল তো ছিলই সঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে ছড়িয়ে পড়ে। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার ভাউরাগুড়ি গ্রামে ঝুমুরালি মিঞা, ফয়েজুদ্দিন প্রমুখকে উচ্ছেদ করলে কৃষকরা সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। জলপাইগুড়িতে ময়নাগুড়ি থানার ওদলাবাড়ি গ্রামের দীর্ঘদিনের আধিয়ার খেমের আলিকে জোতদার ভবেশ রায় উচ্ছেদ করে। মালদা জেলাতেও উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত হল। জেলার কৃষক সমিতির সম্পাদক শান্তি দাস গাজোলে, কৃষক নেতা বদ্রি দুবে, তামিজুদ্দিন মিঞা, নিমাই মূর্মু প্রমুখ বামনগোলা, হব্বিপুর এলাকায় উচ্ছেদ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৪১]

উপরিউক্ত আলোচনা ইঙ্গিত দেয় যে, রাজবংশী কৃষ্টি সংস্কৃতিকে সামনে রেখে বাম আন্দোলনের জায়গাটি উত্তরবঙ্গের জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে। এমনই আর একজন লোকশিল্পী ছিলেন টগর অধিকারী। তাঁকে নিয়ে বাম কমরেডদের আন্দোলন প্রচারের জায়গাটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

৭.২. টগর অধিকারী (১৯১২-১৯৭২)

টগর অধিকারী জাতিতে রাজবংশী। তিনি *'কানা টগর'* নামে সমাজে পরিচিতি পেয়েছিলেন। মনে হয় অন্ধ ছিলেন। দোতরার যাদুকর হিসাবে অনেকেই তাঁকে পরিচিতি দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে দোতরাকে তিনি দিয়েছিলেন নতুন প্রাণ। গান এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন বলে অনেকেই তাকে ওস্তাদ বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ১৯১২ সালে কোচবিহার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। গান শিখেছিলেন সুরেন বসুনীয়ার কাছ থেকে। ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের গুরুও ছিল সুরেন বসুনীয়া।[১৪২] অল্পদিনের মধ্যে তাঁর প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ে। সুরেন বসুনীয়া প্রথম গান রেকর্ড হয়েছিল কলকাতায় আর সেই গানের দোতোরা বাদক ছিলেন টগর অধিকারী।[১৪৩] ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘের বোম্বাই সম্মেলনে তাঁকে কোচবিহার জেলার প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কয়েকজন কর্মীর উদ্যোগ ছিল। এর পরে ১৯৫২ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে সারা ভারত শান্তি সন্মেলনে তিনি যোগদান করেন। কলকাতা এবং বোম্বের অনুষ্ঠানে যোগদান করার ফলে অনেক বড় বড় শিল্পী ও শুধিবৃন্দ কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিলেন। ফলত তাঁর যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা বাম আন্দোলন প্রসারে বিশেষ কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছিল। মনীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী একজন সর্ব সময়ের বাম-কর্মী ছিলেন। ১৯৪৩ সালে কুড়িগ্রামের খলিলগঞ্জ হাটখোলার মাঠে তিনি এক জনসভার আয়োজন করেছিলেন। টগর অধিকারীর সমন্ধে বলতে গিয়ে তিনি নীচের বয়ানটি উল্লেখ করেছেন। সেই জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড সুধীর মুখার্জি এবং শচীন ঘোষ। সভায় দু একটা গান হল কিন্তু আশানুরূপ লোক হল না। এই সময় মঞ্চে এলেন টগর অধিকারী-

'তাঁর দোতোরা যেন কথা বলে উঠল।...তাঁর দোতোরার মূর্চ্ছনা মানুষকে ঘর থেকে বের করে এনে সভায় জড়ো করল। দোতোরার তারে 'জোগাড়' (উলুধবনি) শুনে সভার পাশ্ববর্তী বাড়ির মেয়েরাও নিজ নিজ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। জনসমাগম দেখে উপলব্ধি করলাম তাঁর দোতোরার জাদুর মহিমা।... কিছুক্ষণ পরে আবার তাঁর দোতোরার বাজনা ও গান হবে এই আশ্বাস দিয়ে আমরা সভা শুরু করলাম এবং শেষ করলাম'।[১৪৪]

শ্রেণিসংগ্রামের নিরিখে রচিত তাঁর একটি গান এখানে তুলে দেওয়া হল--

'ধনীর বাড়ির কামাই করে কোন শালা

ডাইলত পানি এক গালা

ই বেলার ভাত ও বেলা

ধনীর বাড়ী কামাই করে কোন শালা'।[১৪৫]

কোচবিহার জেলার বিশিষ্ট নেতা এবং জেলা সম্পাদক চন্ডী পাল, দেবগ্রামে রায়ডাক নদীর উপর যে সেতু নির্মাণ হয় তা টগর অধিকারীর নামে খোদিত করেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন 'টগর অধিকারী ছিলেন যথার্থ অর্থে জনগণের শিল্পী। তাঁর প্রতিভার প্রতি আমরা যথার্থ সুবিচার করতে পারিনি। তাঁর দোতরার বাদন যিনিই শুনেছেন তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন।...'[১৪৬] অথচ টগরের শেষ জীবন কেটেছে ভীষণ দারিদ্রতা নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় গান করে ভিক্ষা তুলে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে আসার সুযোগ পেয়েও তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এই তাঁর সাচ্ছন্দবোধ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে তার শৈল্পিক জীবনধারাকে। গ্রাম্য সমাজের জীবনযাত্রা যেখানে তাঁর অন্যতম ভাবনার উৎস সেখান থেকে সরে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করা একপ্রকার যে অসম্ভব তা তাঁর জীবন পটে লক্ষ করা যায়। এই রেখাচিত্র অনেকটা

আধুনিকতার বিপরীত স্থানে অর্থাৎ Caste constitute a reality that is indifferent to the idea of the Nation.[১৪৭] তা সত্ত্বেও সমাজের ক্রমে মধ্যে যে বর্ণের ধারণা ও তার অভ্যন্তরিন পার্থক্য অসাম্যের উপস্থাপনা করে থাকে, তার নিরিখে বাম ঘরনা প্রকাশ পেয়েছে। এই অসাম্যের থেকে সাম্যের উত্তরণ ঘটে বাম জমানায়। সেখানে জাতি প্রশ্নটির অস্তিত্ব আর থাকছে না বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ ২০০৪ সাল সালে প্রাইমারী স্কুলে মিডডে মিল চালু হলে নিম্নজাতের রাঁধুনিদের হাতে রান্না খেতে উচ্চবর্ণের ছাত্রদের পিতামাতারা আপত্তি জানিয়েছিল।[১৪৮] এর পূর্বে ১৯৯২ সালে চুনি কোটালে আত্মহত্যা বাঙালি ভদ্রলোক সমাজকে এক বড় ধাক্কা দিয়েছিল। লোধা-শবর জনজাতির প্রথম স্নাতক ছিলেন চুনি কোটাল। শিক্ষা জীবন থেকে কর্মজীবন সর্বত্রই বৈষম্য ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করেছিলেন।[১৪৯] নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্ধ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন শিক্ষাজীবনে কোনদিন ভাবতে হয়নি জাতপাত কি! আমরাই পড়তাম ফলত জাতপাতের প্রশ্নটি আসেনি। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের দ্বারাই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ছিল। নিম্নজাতের অংশগ্রহণ ছিল না বলেই জাতপাতের মুখে পড়তে হয়নি। সেই জন্য মনে হতে পারে বঙ্গ জাতপাতহীন। কিন্তু বিষয়টি সেরকম নয়। আসলে জাতি ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ না হওয়ার কারণে এই রকমটা হয়েছে বলে মনে হয়। বামেরা তাদের কাঠামোতে জাতিকে রাজনৈতিক চরিত্র দেয়নি, সমাজজীবনের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত তাদের পার্টিতন্ত্রের প্রবল আদিপত্য, এই সব কিছু মিলে বর্ণহিন্দুদের আদিপত্যকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য কোন প্রতিযোগীতা রাখেননি। ফলত বাম জমানায় জাতি ব্যবস্থা উঠে গেল বা জাতি প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলল এমনটা বলা যায় না। বামরাজত্বে কিছুটা সামাজিক পরিচিতিগুলির পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন এড্রিল

এঙ্গেলসেন রুড। তিনি মনে করেন প্রভু-ভৃত্যের (Patron-Client) সম্পর্কের জায়গাটি একপ্রকার অসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে যা জাতি ব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য। এই অসাম্যকে আলোচনার বিষয় করে নতুন যে পরিস্থিতির উদ্ভাবন হল তাতে জাতি তার বৈধতা হারিয়ে ফেলে। এই নব উদ্ভূত পরিস্থিতি এক সাংস্কৃতিক আদর্শকে সামনে নিয়ে আসে এবং যার নিয়ন্ত্রক ছিলেন অবশ্যই বর্ণহিন্দু। রুড সাহেব একে বলেছেন 'Bengali Modarnist Tradition'.[১৫০] রুডের বক্তব্য পার্থ চ্যাটার্জির উপরিউক্ত বক্তব্য প্রায় অনুরূপ বলা চলে। এই সংস্কৃতি নির্ভর ব্যবস্থাপনা বামফ্রন্ট শাসনের ভিত্তি হয়ে উঠে।

পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজত্বের সাংগঠনিকতা যেমন বর্ণহিন্দুদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে বাইরের সমাজে আসতে পারেনি তেমনি রাজবংশীদের উপস্থিতি সেই বর্ণের বর্গে প্রতিভাত হয়েছে 'অন্যে'র নিরিখে। ভিন্নতা উপস্থাপন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা রাজবংশীদের তকমায়িত করেছেন। শাসকের এই ষড়যন্ত্রকে[১৫১] রাজবংশীরা মান্যতা দেয়নি। অপরদিকে বামপন্থীদের অবস্থানকে রাজবংশীরা চিহ্নিত করেছেন সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক শাসক হিসাবে। উভয়ের বিপরীতমুখী ভাবনার পিছনে লুকিয়ে ছিল জাতি বিদ্বেষ। এই গণ্ডি বাম নেতারা অতিক্রম করতে পারেননি বলে অনেকটা লিবারেল চিন্তাভাবনাকে প্রাধান্য দেয়। যেমনটা ব্রাহ্ম আন্দোলন ভগবানের অস্তিত্ব মানেননি অথচ ধর্মের গণ্ডির বাইরে আসতে পারেনি। অনুরূপ পন্থা বাম শাসন অনুসরণ করে নিজের সুপ্ত ইচ্ছেকে প্রকাশ করতে দেয়নি। যা অনেকটাই বাইরের থেকে সাম্যতাকে বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু জনগণ ধর্মীয় ভাবনার বাইরে বেড়িয়ে আসার কোন উপক্রম দেখায়নি। তার প্রমাণ হিসাবে আবুল মনসুর আহমেদের নিচের বয়ানটি তুলে ধরা হল—

অক্টার্লনি মনুমেন্টের নিচে শ্রমিক জনসভায় চার ঘন্টা ধর্ম বিরোধী বক্তৃতা করি (বঙ্কিম মুর্খাজি)। করতালিও পাই। কিন্তু সভা শেষে মুসলিম শ্রমিকরা টিপু সুলতানের মসজিতে এবং হিন্দু শ্রমিকরা কালি মন্দিরে ঢুকে পড়ে। এবার কি করি বলুন ত ?

এর প্রত্যুতরে আবুল মনসুর আহমেদ বলেছেন—

এটাই আসল সত্য। আমার মনে হয় চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সকলে এবং প্রত্যেকে যেদিন কমিউনিস্ট হৈয়া যাবে সেদিনও তারা হিন্দু কমিউনিস্ট ও মুসলিম কমিউনিস্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত থাকিবে।[১৫২]

এই উপরিউক্ত ভাবনার গভীরে লুকিয়ে ছিল জাতির প্রাধান্য বজায় রাখা। এই কারণে রাজবংশীদের উত্থান তাদের কাছে বিরক্তার প্রকাশ বলা যেতে পারে। সেই বিরক্তি প্রকাশ করতে বামপন্থীরা এমন একটা ছোটলোকের গণ্ডি তৈরি করে দেয় যার থেকে রাজবংশীরা আজও বের হতে পারেনি।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সত্যব্রত দত্ত: *বাংলার বিধানসভার একশো বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র*, (কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ২১৪।
২. সরোজ চক্রবর্তী: *মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে: সুরাওয়ার্দি থেকে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত: ১৯৪৭-১৯৬২*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা, দে বুক স্টোর, ১৯৭৭), পৃ. ২৫২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।
৪. সত্যব্রত দত্ত: *বাংলার বিধানসভার একশো বছর: রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র*, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৯।
৫. রূপ কুমার বর্মণ: *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ*, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২), পৃ. ৬১।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
৭. Dilip Banerjee: *Election Recorder- An analytical reference, Bengal, West Bengal, 1862-2012*, Vol-1, (Kolkata, Star Publishing House, Sixth revised edition, 2012), pp. 362, 389, 414, 445, 478, 503, 540, 570, 604, 640 & 704.
৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: নাগরিক, প্রবন্ধ সংকলন, (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০২১)।
৯. Octavio Paz: *In light of India*, (Landon, The Harvill Press, 1995), p. 47.
১০. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: *'কৃষকবিদ্রোহ ও রাষ্ট্র বিপ্লব*, অনিল আচার্য (সম্পা): তিন দশকের গণআন্দোলন, (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৮), পৃ. ১৯।
১১. অশোক রুদ্র: *'ভূমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন*, কললেন্দু ধর (সম্পা): স্বাধীনতার-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, (কলকাতা, দেশকাল, ১৯৫৯)।

১২. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫), পৃ. ১৫৭।

১৩. Ross Mallick: *Development policy of a Communist government, West Bengal since 1977,* (Landon, Cambridge University Press, 1993), p. 129.

১৪. সুদীপ্ত কবিরাজ: *মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান,* (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০২২), পৃ. ২৮০।

১৫. সৌমেন নাগ: ভূ-ভাগের নাম কোচবিহার, দেবব্রত চাকী (সম্পা): উত্তর প্রসঙ্গ: একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, প্রথম খন্ড, *(কলকাতা, ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০১১)*, পৃ. ১০১-১১৬।

১৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Irawati Karve: *Hindu Society - An Interpretation,* (Decan College, Poona, Sangam Press Private Ltd. 1961).

১৭. দীনেশ ডাকুয়া: *উত্তরের গল্প,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ৫২-৬৩।

১৮. কলীন্দ্রনাথ বর্মণ: *উত্তরবঙ্গ দর্শন,* গিরিজাশঙ্কর রায় (সম্পা): সাতভাইয়া (রাজবংশী কবিতা সংকলন), (শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ২১-২২।

১৯. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Partha Chaterjee: '*Partition and Mysterious disappearance of Caste in Bengal*', Uday Chandra, Geir Heierstad and Kenneth Bo Neilsen (ed): The politics of Caste in West Bengal, (New Dilhi, Routledge, 2016), pp. 83-102.

২০. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

২১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী): কৃষকের হাতে জমি চাই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, (কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫), পৃ. ৪।

২২. Uday Chandra, Geir Heierstad and Kenneth Bo Neilsen (ed): *The politics of Caste in West Bengal,* Op.Cit., p. 97.

২৩. Ibid, p. 97.

২৪. নিখিলেশ রায় (সম্পা): রাজবংশী একাদেমী বই-১, (শিলিগুড়ি, রাজবংশী একাদেমী, ২০০৭), পৃ. ১৮; তিনি লিখেছে এক অধ্যাপক তার কাজের মাসিকে একখানি রাজবংশী ভাষায় লেখা পত্রিকার কথা পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। এই ভাষায় বই লেখা যায় শুনে মাসি বিস্মৃত হয়ে বলেছিলেন 'আমার এইলা নইজ্যা নাগা ভাষা দিয়া বই লেখা যায়'...

২৫. Arild Engelsen Ruud: *poetics of Village Politics, the making of West Bengal's rural communism,* (London, Oxford University Press, 2003), p. 33.

২৬. অবনী লাহিড়ী: *তিরিশ চল্লিশের বাংলা: রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে,* রণজিৎ দাসগুপ্ত (সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা): (কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯), পৃ. ৭৭।

২৭. অমর রায় প্রধান: জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে, (মালদা, সংবেদন, ২০১২), পৃ.২৩ (আনন্দ গোপাল ঘোষ, কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর (সম্পা)।

২৮. অবনী লাহিড়ী: *তিরিশ চল্লিশের বাংলা: রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

২৯. আন্দ্রে বেতেই: *'কৃষি ব্যবস্থায় শ্রেণীর স্বরূপঃ জোতদারদের কথা'*, অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা): বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, (কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৮), পৃ. ১৮২।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৩১. ভাস্কর নন্দী: *উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালী, কামতাপুরি এবং আদিবাসী-ঝাড়খন্ডী পরিচিতি,* (কলকাতা, সি পি আই (এম-এল) প্রকাশনী, সন্তোষ রাণা কতৃক ১২১/৩ পূর্বাচল কালীতলা রোড), পৃ. ৬।

৩২. জগদীন্দ্রদেব রায়কত: *রায়কত বংশ ও তাঁহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,* সৌমেন্দ্র প্রসাদ সাহা, আনন্দ গোপাল ঘোষ, (সম্পা): (মালদা, সংবেদন, ২০১৩), পৃ. ২৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩৪. রায়, হরিপদ: *গণ আন্দোলনে কোচবিহার,* (কলকাতা, অ্যালবাট্রস, ২০১৯), পৃ. ১২৮।

৩৫. মন্টু বর্মণ [৭০] *সাক্ষাৎকার:* নেন্দারপাড়, জোরপাটকী, মাথাভাঙ্গা, ২২শে মে, ২০১৯।

৩৬. শরৎ রায় [৭৩] *সাক্ষাৎকার:* গোলকগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, ২৩শে অক্টোবর ২০১৯।

৩৭. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী): *কৃষকের হাতে জমি চাই,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩৮. অশোক ভট্টাচার্য: *'উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে'*, পরিতোষ দত্ত, চিত্রভানু সরকার (সম্পা): উত্তরবঙ্গের রাজনীতি হিংসা ও সম্প্রীতি, সহজপাঠ, (বি/১৩৮ ডি বাঘাযতীন বাজার, কলকাতা, ২০০১), পৃ. ১৪।

৩৯. শরৎ রায়: *সাক্ষাৎকার:* প্রাগুক্ত।

৪০. আনন্দ গোপাল ঘোষ: *'উত্তরখণ্ড অন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট'*, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, (কলকাতা, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০), পৃ. ৫০৯।

৪১. Ross Mallick: *Development policy of a Communist government, West Bengal since 1977*, Op.Cit., p. 53.

৪২. পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়: *ভূমি ও ভূমিসংস্কার: সেকাল একাল,* (কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭), পৃ. ২৯১।

৪৩. বদরুদ্দিন উমর: *'সত্তর শতকের কৃষক আন্দোলন'*, অনিল আচার্য (সম্পা): সত্তর দশক, সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯১), পৃ. ৭৬।

৪৪. পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার: (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৪), পৃ. ১৪।

৪৫. সবিতা রায়: প্রসঙ্গ: গ্রেটার কোচবিহার, রমেন্দ্র নারায়ণ দে (সম্পা): দিন বদলের ডাক, অশান্ত কোচবিহার – শান্তি ফিরবে কবে? শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৮, *(দিনহাটা, কোচবিহার, অনামিকা প্রেস, ১৪১২),* পৃ. ১৫।

৪৬. রাজবংশী বয়স্ক ব্যক্তিদ্বয়ের আলোচনাতে প্রায়শ শোনা যায় উক্ত বয়ানটি।

৪৭. Octavio Paz: *In light of India*, Op.Cit., p. 48.

৪৮. দীনেশ ডাকুয়া: *যা দেখেছি, যা বুঝেছি,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১০), পৃ. ১৯৬।

৪৯. Arijit Mandal: *Struggle for Kamtapur: Haunting specters and changing Pantheons, A study into the political ideas of the Kamtapuri movement*, M.Phil Dessartation, (Calcutta, Centre for studies in social sciences, 2014), p. 92.

৫০. চারুচন্দ্র স্যান্যাল: *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী,* তৃপ্তি সান্ত্রা (অনুবাদ), (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭), পৃ.২৪৪।

৫১. মন্টু বর্মণ: *সাক্ষাৎকার:* প্রাগুক্ত।

৫২. সমীরণ দত্তগুপ্ত: *তিস্তাতটরেখা,* (কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০), পৃ. ১৭০।

৫৩. Profulla Roy Choudhary: *Left experiment in West Bengal,* (New Delhi, Patriot Publishers, 1985), pp. 159- 160.

৫৪. রাজবংশী সমাজে প্রচলিত গল্পগুজব এমনভাবে উত্থাপন করা হত তার একটা নৈতিক সারমর্ম থাকত। সেই উপলব্দি দিয়ে সমাজকে বিবেচনা করা যেত। যাকে আমরা কিস্সা বা রূপকথা বলতে পারি। সেই রূপকথা পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় সমিতির বয়ানে উঠে এসেছে। এই কাহিনীকে ধরে রাজবংশী অতীত অনুসন্ধানে সচেষ্ট ছিলেন পঞ্চানন বর্মা। এখানে আমরা এমনি একটি রূপকথা তুলে ধরেছি যার নাম দেওয়া হয়েছে 'রাখালের গল্প'। বিস্তারিত জানতে দেখুন- শামসুজ্জামান খান (সম্পা): *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, দিনাজপুর,* (ঢাকা, বাংলা একাদেমি প্রেস, ২০১৪), পৃ ১০২-১০৪।

৫৫. Arild Engelsen Ruud: *'from client to supporter: economic change and the slow change of social identity in rural West Bengal'*, Uday Chandra, Geir Heierstad, and Kenneth Bo Nielsen (ed): the politics of Caste in West Bengal, Op.Cit., p. 194.

৫৬. উমেশ শর্মা [৭৭], *সাক্ষাৎকার:* জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর, ২০১৯।

৫৭. সমীরণ দত্তগুপ্ত: *তিস্তাতটরেখা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

৫৮. কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর: *সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি: প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ,* (মালদা, সংবেদন, ২০১৩), দেখুন প্রাক্-কথন।

৫৯. সমীরণ দত্তগুপ্ত: *তিস্তাতটরেখা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

৬১. বদরুদ্দিন উমর: *'সত্তর দশকের কৃষক আন্দোলন'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

৬২. Profulla Roy Choudhary: *Left experiment in West Bengal,* Op.Cit., pp. 151-153.

৬৩. রমেন্দ্রনাথ অধিকারী: *'টগর অধিকারী: জীবন ও সংগীত সাধনা'*, দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, (কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, লোকশিল্পী টগর অধিকারী স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা সমিতি, ২০০৩), পৃ. ৩৪; Rup Kumar Barman:

Contested Regionalism: A new look on the History, Culture change and Regionalism of North Bengal and Lower Assam, (New Delhi, Abhijeet Publication, 2007), p. 130.

৬৪. স্বাধীনতার উত্তরপর্বে বিশেষত ৭০ এর দশকে উত্তরবঙ্গে দেখা গেল রাজবংশীরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে, অনেকটা নিজস্ব কায়দাতে। নিজস্বতা, তাদের সাংগঠনিক রূপ যা অনেকটা আধুনিক সংগঠনের ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে – উত্তরখন্ড, উতজাস, কেপিপি বা গ্রেটার কোচবিহার নামে।

৬৫. দীনেশ ডাকুয়া: *উত্তরের গল্প,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; বিস্তারিত জানতে দেখুন, পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়: *ভূমি ও ভূমিসংস্কার, সেকাল একাল,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২৩৬।

৬৬. দীনেশ ডাকুয়া: *উত্তরের গল্প,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; হরিমোহন বর্মণ: 'রাজবংশী সমাজের সেইকাল আর এই কাল', নিখিলেশ রায় (সম্পা): ডেগর, ভাষা- সাহিত্যে- সংস্কৃতির নয়া দুনিয়া, পথথম বর্ষ, দুতিয়া সংখা, *(শিবমন্দির, দার্জিলিং, নর্থ বেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, ২০০৪)*, পৃ. ১২।

৬৭. হরিমোহন বর্মণ: '*রাজবংশী সমাজের সেইকাল আর এই কাল',* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

৬৮. উত্তরবঙ্গ সংবাদ: ১৮.০৭.১৯৯৪।

৬৯. উমেশ শর্মা [৭৭], *সাক্ষাৎকার*: জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর, ২০১৯; কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর: *সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতিঃ প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ,* প্রাগুক্ত, দেখুন প্রাক্-কথন।

৭০. অশোক রুদ্র: *'ভূমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন*, কললেন্দু ধর (সম্পা): স্বাধীনতার-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, (কলকাতা, দেশকাল, ১৯৫৯), পৃ. ১৩৯।

৭১. Pranab Bardhany, Michael Luca, Dilip Mookherjee, Francisco Pino: *Evaluation of Land Distribution in West Bengal 1967-2004: Role of Land Reforms and Demographic Changes*, (Harvert/Business/School, Working Paper 14-066, January 20, 2014).

৭২. প্রণব বর্ধন: *বাংলার জমি ও বাংলার কৃষক,* সমর সেন স্মারক বক্তৃতা ২০১৩, (কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬), পৃ. ৩৩।

৭৩. অশোক রুদ্র: *'ভূমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৭৪. মন্টু বর্মণ: *সাক্ষাৎকার*: প্রাগুক্ত; উমেশ শর্মা: *চিত্তে বৃত্তে ভাগচাষ,* (কলকাতা, বইওয়ালা, ২০০৭), পৃ. ১৪৪।

৭৫. মন্টু বর্মণ: *সাক্ষাৎকার:* প্রাগুক্ত।

৭৬. উমেশ শর্মা: *চিত্তে বৃত্তে ভাগচাষ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

৭৭. বিস্তারিত জানতে দেখুন, *Kartik Chandra Sutradhar: Land revenue systems, Land reforms and agriculture relations in Jalpaiguri, (Khasmahal to Operation Barga*), Doctoral thesis, university of North Bengal, p. 134.

৭৮. সুখবিলাস বর্মা: 'দোতোরার জাদুকর টগর অধিকারী', দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৭৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত।

৮০. Swaraj Basu: *Dynamics of a Caste Movement, the Rajbansis of North Bengal, 1910-1947,* (Delhi, Manohar, 2003), p. 119. তিনি মনে করেন রাজবংশী জাতি আন্দোলন বা তাঁদের ঐক্যতা ছিল এক প্রকার কাল্পনিক।

৮১. Moumita Ghosh Bhattcharyya: '*The story of the lives and sufferings of the Rajbanshis of North Bengal'*, Debi Chaterjee (ed): Voice of Dalit, Vol 2, No 2, (Kolkata, MD Publictions Pvt. 2009), p. 130.

৮২. অমর রায় প্রধান: *উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ,* (হলদিবাড়ি, কোচবিহার, দৈনিক বসুমতী, ২০০০), পৃ. ১০ক; কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর: *সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি: প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

৮৩. Ranjit Das Gupta: *Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947,* (Delhi, Oxford University Press), 1992, p. 22.

৮৪. দীনেশ ডাকুয়া: *উত্তরের গল্প,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১৫।

৮৫. নামে বেনামে সম্পত্তি লুকিয়ে রাখার একটা বাড়তি সুবিধে লক্ষ করা যায় ১৯৫৩ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইনে এবং ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্কার আইনে। কীভাবে জমি লুকিয়ে রাখা যেত তা জানতে দেখুন, পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়: *ভূমি ও ভূমিসংস্কার, সেকাল একাল,* প্রাগুক্ত।

৮৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন, Octavio Paz: *In light of India*, Op.Cit.,

৮৭. ব্যক্তিগত আলোচনা গোপাল লস্কর, মাথাভাঙ্গা লোকাল কমিটির সম্পাদক। তিনি পূর্ব বঙ্গের থেকে দেশভাগ পরবর্তীতে মাথাভাঙ্গায় চলে আসেন। জাতিতে রাজবংশী। ওনার বক্তব্যের লক্ষ করা যায় স্থানীয় রাজবংশীদের রাজনীতিতে আসার প্রক্রিয়াটি ছিল শ্লথ। প্রথম ভাগে উদ্বাস্তুরা, দ্বিতীয় ভাগে স্থানীয় মুসলিম এবং শেষ পর্যায়ে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করেন।

৮৮. অমর রায় প্রধান: *উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ,* (হলদিবাড়ি, কোচবিহার, দৈনিক বসুমতী, ৬ই জানুয়ারি, ১৯৭৩), পৃ. ৪।

৮৮.ধর্মনারায়ণ বর্মা: *কামতাপুরী ভাষা-সাহিত্যের রূপরেখা,* (তুফানগঞ্জ, কুচবিহার, অন্তময়ী প্রিন্টার্স, ২০১৭), পৃ. ১; হরিমোহন বর্মণ: *কামতাপুরি ভাষা,* (জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০১)।

৯০. বিস্তারিত জানতে দেখুন অমর রায় প্রধান: *উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ,* প্রাগুক্ত।

৯১. অমর রায় প্রধান: *জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৯২. বিস্তারিত জানতে দেখুন মানিক মুখার্জি: *উত্তরবঙ্গের জনজীবনের বর্তমান সমস্যা প্রসঙ্গে,* (কলকাতা, গণদাবী প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৫)।

৯৩. দীনেশ ডাকুয়া: *কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ২৮-২৯।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৯৬. দীনেশ ডাকুয়া: *কামতাপুরী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ৮।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৯৮. কলীন্দ্রনাথ বর্মণ: *উত্তরবঙ্গ দর্শন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৯৯. উমেশ শর্মা: *সাক্ষাৎকার:* প্রাগুক্ত।

১০০. দীনেশ ডাকুয়া: *কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ -১৫।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১০৪. দীনেশ ডাকুয়া: *কামতাপুরী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

১০৯. পরিতোষ দত্ত, চিত্রভানু সরকার (সম্পা): *উত্তরবঙ্গের রাজনীতি, হিংসা ও সম্প্রীতি, সজহপাঠ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-১৪।

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১১১. Sukhbilas Barma: *Indomitable Panchanan: An objective study on Rai Sahib Panchanan Barma*, (New Delhi, Global Vission Publishing House, 2017), p. xv.

১১২. দীনেশ ডাকুয়া: *যা দেখেছি, যা বুঝেছি, (*কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১০), পৃ. ২১০-২১১।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭-২০৮।

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

১১৮. আনন্দ গোপাল ঘোষ: 'উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গের অস্থিরতার উৎস ও সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতিতে তার প্রভাব', সঞ্জয় সাহা (সম্পা): *(তিতির একটি সাহিত্য পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৯),* পৃ. ১১৭।

১১৯. এখানে নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লখে করি। মাস্টার্স্ করার সময় কলকাতার যে বাড়িতে থাকতাম, সে বাড়ির মালিক একদিন জিজ্ঞেস করছিল উত্তরবঙ্গে আমরা কি করে থাকি? ওনাকে বললাম- বুঝতে পারলাম না কি বলছেন। তারপর বলল ওখানে নাকি সবাই জঙ্গি? প্রশ্নটা শুনে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। ওনারা কীভাবে ভাবেন উত্তরবঙ্গকে নিয়ে। মনে হয় এই ভাবনাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

১২০. হরিমোহন বর্মণ: 'রাজবংশী সমাজের সেইকাল আর এই কাল', নিখিলেশ রায় (সম্পা): ডেগর, ভাষা- সাহিত্যে- সংস্কৃতির নয়া দুনিয়া, পথথম বর্ষ, দুতিয়া সংখা, *(শিবমন্দির, দার্জিলিং, নর্থ বেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, ২০০৪),* পৃ. ১২।

১২১. বিমল চন্দ্র বর্মণ: *উত্তর উপনিবেশিক কালে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অবস্থান ও সঙ্কটঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উত্তারাংশের একটি তুলনামূলক আলোচনা,* অপ্রকাশিত এমফিল ডিজারটেশন, (কলকাতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), পৃ. ১৭৩। রাজবংশী জাতি আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Rup Kumar Barman: *Contested Regionalism, A new look on the History, Culture change and regionalism of North Bengal and Lower Assam*, Op.Cit.; Nirmal Chandra Roy: *The origin, growth and the decline of the Uttarkhanda Dal (1969-1987*), unpublished thesis, (Darjeeling, Department of History, North Bengal University, 2015).; Arup Jyoti Das: *Kamatapur and the Koch Rajbanshi Imagination*, (Assam, Montage Media, 2009).; Sukhbilas Barma (ed): *Socio-Political Movement in North Bengal (A Sub- Himalayan Tract*), Vol- I & II, (New Delhi, Global Vission Publishing House, 2007).

১২২. হরিমোহন বর্‌মণ: *মোর নিজের কাথা,* (পশ্চিম খয়ের বাড়ি, রাঙ্গালীবাজনা, আলিপুরদুয়ার, ২০১৯), পৃ. ৩৫। এটি তাঁর আত্মজীবনী। তিনি উত্তরখণ্ড দলের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দলের সহঃ সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছেন।

১২৩. হরিমোহন বর্মণ: *কামতাপুর রাজ্যের কাহিনী,* (রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ২০০৫), পৃ. ১।

১২৪. সবিতা দেবী: *প্রসঙ্গ: গ্রেটার কোচবিহার,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৬।

১২৫. হরিমোহন বর্মণ: *কামতাপুর রাজ্যের কাহিনী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২।

১২৬. হরিমোহন বর্মণ: *উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্য কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য,* (রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ১৯৮৯)।

১২৭. হরিমোহন বর্মণ: *মোর নিজের কাথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১২৮. হরিমোহন বর্মণ: *কামতাপুর রাজ্যের কাহিনী,* (রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ২০০৫)।

১২৯. রমেন্দ্র নারায়ণ দে (সম্পা): দিন বদলের ডাক, অশান্ত কোচবিহার – শান্তি ফিরবে কবে? শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ-৩, সংখ্যা-১৮, *(দীনহাটা, কোচবিহার, অনামিকা প্রেস, ১৪১২),* পৃ. ২৪।

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৩২. **রাজনৈতিক দলগুলি** হল: ১। কামতাপুর পিপলস পার্টি (নিখিল রায়), ২। কামতাপুরী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (তপতি মল্লিক), ৩। গ্রেটার কুচবিহার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (নির্মল বর্মণ), ৪। গ্রেটার কুচবিহার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (লালুচাঁদবাবু), ৫। উত্তরবঙ্গ সমাজবাদী পার্টি, ৬। প্রোগ্রেসিভ পিপলস পার্টি (কিরণ কালিন্দী), আদিবাসী সংগঠন, **সামাজিক সংগঠন-** ৭। বিশ্বরাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ, ৮। কামতাপুরী রাজবংশী সমন্বয় কমিটি, ৯। ক্ষত্রিয় সমিতি, উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার সংগঠন, ১০। কামতা কালচারাল সোসাইটি, ১১। রাজবংশী অফ নর্থ বেঙ্গল, Facebook group. তথ্যটি মাথাভাঙ্গার পরিমল বর্মণের কাছ থেকে সংগৃহিত।

১৩৩. সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

১৩৪. কঙ্কণ ভট্টাচার্য: *নিবারণ পণ্ডিতের গান,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, (কলকাতা, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০০৮), পৃ. ৯০।

১৩৫. সন্তোষ সিংহ: *দোতোরার ডাং,* (শিলিগুড়ি, রাজবংশী একাদেমি, ২০১২), পৃ. ২৯।
১৩৬. কঙ্কণ ভট্টাচার্য: *নিবারণ পণ্ডিতের গান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
১৩৭. প্রতুল কুমার চক্রবর্তী: 'গ্রেটার কোচবিহার: কিছু প্রাসঙ্গিক কথা', রমেন্দ্র নারায়ণ দে (সম্পা): দিন বদলের ডাক, অশান্ত কোচবিহার-শান্তি ফিরবে কবে? প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।
১৩৮. উমেশ শর্মা [৭৭], *সাক্ষাৎকার:* জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর, ২০১৯।
১৩৯. কঙ্কণ ভট্টাচার্য: *নিবারণ পণ্ডিতের গান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।
১৪০. জয়ন্ত ভট্টাচার্য: *পশ্চিমবঙ্গ: জমির অন্দোলন ও ভূমিসংস্কার,* (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ১০১- ১০৮।
১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
১৪২. সুখবিলাস বর্মা: *'দোতোরার জাদুকর টগর অধিকারী*, দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
১৪৩. নিখিল কুমার চন্দ: *টগর অধিকারী:* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, (কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪), পৃ. ২৮। রমেন্দ্রনাথ অধিকারী: *'টগর অধিকারী: জীবন ও সংগীত সাধনা'*, দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
১৪৪. মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী: *'টগর অধিকারী: দোতরার বিস্ময়*, দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।
১৪৫. সুধাংশু শেখর আদিত্য: *'সেই সুরের পথে হাওয়ায় হাওয়ায়*, দিগ্বিজয় দে সরকার, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় রাভা, সুধাংশু শেখর আদিত্য, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী (সম্পা): লোকশিল্পী টগর অধিকারীর স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
১৪৬. *'স্মরণে-মননে টগর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১৪৭. Octavio Paz: *In light of India*, Op.Cit., p. 49.
১৪৮. Sekhar Bandhyopadhyay and Anusua Basu Ray Chaudhary: '*Partition, Displacement and the decline of the Scheduled Caste Movement in West Bengal'*, Uday Chandra, Geir Heierstad, and Kenneth Bo Nielsen (ed): The politics of Caste in West Bengal, Op.Cit., p. 60.
১৪৯. সংবাদ আজকাল: ১১ অক্টোবর, ২০২১।
১৫০. Adril Engelsen Ruud: 'From client to supporter, Economic change and the slow change of social identity in rural West Bengal", Op.Cit., p. 193.
১৫১. Ayan Guha: Beyond conspiracy and coordinated ascendancy: Revisiting Caste question in West Bengal under Left Front Rule (1977-2011), '*Contemporary Voice of Dalit', 13(I) 50-65,* (Sage Publication, India (Pvt) Ltd. 2021).
১৫২. আবুল মনসুর আহমেদ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, (ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩) পৃ. ১৪৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

‘জাতি’ ও ‘শ্রেণি’ প্রশ্নটি ভারত তথা বঙ্গের সমাজজীবনে ওতপ্রতভাবে যুক্ত। এই যুক্ত থাকার বিষয়টি কীভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের নিরিখে রাখা যায় তার প্রেক্ষাপট ধরে গবেষণার শিরোনাম রাখা হয়েছে “বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১”

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে রাজবংশী সমাজের প্রভাব তাদের এক সতন্ত্র মাত্রা দিতে সাহায্য করেছে। বিশেষত বিশ শতক থেকে জাতি প্রশ্নের সচেতনার বিকাশ নতুন পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যার সঙ্গে বঙ্গের রাজনীতির একটা মিলগত জায়গা রয়েছে। উভয় স্থানের এই সাংস্কৃতিকতা থাকলেও উভয়ের স্বতন্ত্রতার প্রকাশ জাতির নিরিখে দেখানো হয়েছে। ফলত রাজবংশীদের এই কার্যক্রম একদিকে জাতি প্রশ্নটিকে উন্মুক্ত করলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব তাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বিশেষত ১৯৩০র দশক থেকে বঙ্গের বামপন্থীদের শ্রেণি চেতনার প্রভাব উত্তরবঙ্গে ফেলতে শুরু করে। বামপন্থীদের চিন্তাভাবনার প্রভাব রাজবংশী সমাজে লক্ষণীয় তেমনি জাতি চেতনার বিকাশ – এই দুইয়ের আর্দশ দিয়েই এই সময় নতুন ভাবে সমাজজীবন পরিচালিত হয়েছিল। যার বড় প্রভাব দেখা যায় ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনে। তেভাগা আন্দোলনে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ এক নতুন যুগের সূচনা ঘটাতে সাহায্য করে। কেননা বৃহৎ বঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে তেভাগার লড়াই মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত। সেই জায়গা থেকে বামপন্থী

আন্দোলনে রাজবংশীদের উপস্থিতি জাতির অভ্যন্তরেই শ্রেণি ভাবনা স্থাপনা ঘটাতে থাকে। উভয়ের এই সংযুক্ততার জায়গাটি ধরে আমাদের গবেষণা দেখাতে চেষ্টা করেছে কীভাবে রাজবংশী সমাজে শ্রেণি চেতনার বলয় তৈরি হয় এবং তার পাশাপাশি জাতি প্রশ্নটি কীভাবে থেকে গেল তার অভ্যন্তরে – এই ঘটনার প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছে আলোচ্য সন্দর্ভটি।

দেশভাগ পরবর্তীতে বিশেষত বামপন্থী আন্দোলনের চিন্তাভাবনার বিকাশ অনেকটা উদ্বাস্তু মানুষের আগমনকে ধরে স্ফীত হয়েছিল। ফলত অনেকের কাছে মনে হয়েছে জাতি প্রশ্নটি গুরুত্ব হারিয়ে এক নতুন সমতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাম-জমানায়। সেখানে আমাদের গবেষণা সন্দর্ভটি দেখাতে পেরেছে কীভাবে তার রূপান্তর ঘটল এবং বিবর্তিত ইতিহাস কীভাবে নতুন করে জাতি রাজনীতির জায়গাটি তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

বাম আন্দোলনের সঙ্গে রাজবংশীদের এই সংযুক্তি উপনিবেশিক বঙ্গে দেখা গেলেও দেশভাগ পরবর্তীতে তার সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা বিরোধাত্মক হয়ে ওঠেছিল। তার জটিলতার জায়গাটি প্রকাশ করতে বাম আন্দোলনের সংস্কৃতির সঙ্গে রাজবংশী সংস্কৃতির জায়গাটি ধরে দেখানো হয়েছে কীভাবে তার বিযুক্তি শুরু হয়েছিল। আমাদের গবেষণায় আমরা আর দেখিয়েছি যে জমিকে কেন্দ্র করে যে সমবায়-ভিত্তিক ভাবনা বামপন্থীদের মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটেছিল সেখানে তাদের সম্পর্কের সমীকরণ একই ভাবাদর্শে মেলানো যায়নি। এই মেলবন্ধন না হওয়ার পশ্চাতে দেখানো হয়েছে রাজবংশী সমাজ ও তার ইতিহাস অনেকটাই বামপন্থীদের চিন্তার পরিপন্থী হয়েছিল। যার কারণে উভয় উভয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিল।

ফলে অনেকটা বিচ্ছিন্নতার মাপকাঠি দিয়ে রাজবংশীদের নিয়ে আসা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে।

এই সংযুক্তি ও সংঘাত এমন একটা মেরুকরণ করে দেয় যা রাজবংশীদের চিহ্নিত করে ভিন্নতায়। এই স্বতন্ত্রতা অনেকটাই 'কাজের লোক', 'জঙ্গি' বা 'সন্ত্রাসে'র বয়ানের সঙ্গে সমর্থিত। তার সূত্র ধরে কীভাবে রাজবংশী সমাজে নতুন করে জাতি আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায় তার আলোচনা এবং বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তাভাবনা-একই সঙ্গে এমন এক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যা অনেকটাই জাতি প্রশ্নের নিরিখে বিচার্য।

'জাতি' ও 'শ্রেণি' প্রশ্নটির পারস্পরিকতা নিরিখে আমাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্যতাকে দেখাতে গিয়ে জাতি ও শ্রেণির ধারণা ও তার সমর্থিত সমাজ কাঠামের সুক্ষতা এমনভাবে মিলেমিশে রয়েছে একে অপরের সঙ্গে, অনেক সময় মনে হয়েছে কোন একটি বিষয় হারিয়ে গেছে। বিষয়টি সে রকম নয়। উভয়ের মধ্য যে নিজস্বতা তার ক্ষেত্রটি অনেক সময় সংযুক্ত ও অস্তিত্বের প্রশ্নে অন্যের অভ্যন্তরে থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করেছে। এই হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি জাতি প্রশ্নে প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করেছে। তাই বামপন্থী আন্দোলনে জাতি বিষয়টি আর থাকছে না (Disappear) এমনটা বলা যায়নি আমাদের সন্দর্ভে। অন্যথায় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের বামপন্থা নিয়ে সমাজকে সমতার নিরিখে বিচার করার প্রবণতা যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি জাতির প্রশ্নের স্ব নির্মাণ কিছুটা এই পর্বে অন্যরকম হয়ে গেলেও সে নিজের অবস্থানে বিচরণ করেছে।

সহায়ক পত্র পত্রিকা এবং গ্রন্থসমূহ

প্রাথমিক উপাদান

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), প্রথম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৩।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), দ্বিতীয় ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৪।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), চতুর্থ ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা মেট্কাফ্ প্রেস, ১৩১৬।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), পঞ্চম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, মেট্ কাফ্ প্রেস, ১৩১৭।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), ষষ্ঠ ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৮।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), সপ্তম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৯।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), অষ্টম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩২১।

ক্ষত্রিয় সমিতির বাৎসরিক কার্যবিবরণী (বৃত্ত-বিবরণী)

ক্ষত্রিয় সমিতি: *ক্ষত্রিয় সমিতি কার্য্য বিবরণী,* প্রথম বর্ষ, রঙ্গপুর নাট্যমন্দির ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৭।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সন্মীলনী ও কার্য্য বিবরণী ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী,* (৭ই, ৮ই ও ৯ই আষাঢ়) রংপুর নাট্যগৃহ, ১৩২০।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *পঞ্চম বার্ষিক সন্মীলনী কার্য্য বিবরণী,* (১৬ ও ১৭ বৈশাখ) রংপুর, ১৩২১।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *ষষ্ঠ বার্ষিক সন্মীলনী কার্য্য বিবরণী,* (৪ঠা, ৫ই ও ৬ই আষাঢ়) রংপুর ধর্মসভা গৃহ, ১৩২২।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *সপ্তম বার্ষিক সন্মীলনী কার্য্য বিবরণী,* (২২শে ও ২৩শে জ্যেষ্ঠ) রংপুর নাট্যগৃহ, ১৩২৩।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *অষ্টম সন্মীলনীর কার্য্য বিবরণী,* (২৭শে ও ২৮শে জ্যেষ্ঠ) ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার প্রাঙ্গন, দিনাজপুর, ১৩২৪।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *নবম বার্ষিক অধিবেশন* (৩১শে ও ৩২শে আষাঢ়) ডোমার, রংপুর, ১৩২৫।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *দশম সন্মীলনীর কার্য্য বিবরণী,* (২৮শে জ্যেষ্ঠ ও ১লা ও ২রা আষাঢ়) রংপুর, মনোহর বর্মা, ১৩২৬।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *একাদশ সন্মীলনী, কার্য্য বিবরণী,* (২১, ২২, ২৩শে জ্যেষ্ঠ) রংপুর, মনোহর বর্মা, ১৩২৭।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, কার্য্য বিবরণী,* (১৯, ২০, ২১শে আষাঢ়) ভান্ডারদহ স্কুল প্রাঙ্গন, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি, ১৩৩৪।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন, কার্য্য বিবরণী,* (১৫, ১৬, ১৭শে আষাঢ়) ভোটমারী, রংপুর, ১৩৩৫।

পত্র পত্রিকা, আত্মজীবনী, ডাইরি ও বই

অধিকারী, হরিনারায়ণ: *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* কলিকাতা, দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৮।

আহমেদ, মুজফফ্‌র: *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* প্রথম খণ্ড, ১৯২০-১০২৯, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৫।

আহমেদ, মুজফফ্‌র: *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১।

আহমেদ, আব্বাসউদ্দিন: *আমার শিল্পী জীবনের ইতিহাস,* কলকাতা, প্রতিভাস, ২০১০।

কোঙার, হরেকৃষ্ণ: *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

কোঙার, হরেকৃষ্ণ: *ভারতের কৃষক সমস্যা,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৪।

গুহ, কমল: *আমার জীবন আমার রাজনীতি,* কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০২।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ১, (১৯৪২-৪৪), কলকাতা, সেরিবান, ২০০৯।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ২, (১৯৪৫-৪৬), কলকাতা, সেরিবান, ২০১০।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ৩, (১৯৪৬), কলকাতা, সেরিবান, ২০১১।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ৪, (১৯৪৬-৪৭), কলকাতা, সেরিবান, ২০১১।

চন্দ, নিখিলকুমার: *টগর অধিকারী,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪।

ডাকুয়া, দীনেশ: *কামতাপুরী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১,

ডাকুয়া, দীনেশ: *কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

ডাকুয়া, দীনেশ: *উত্তরের গল্প,* কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০৫।

ডাকুয়া, দীনেশ: *যা দেখেছি, যা বুঝেছি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১০।

দত্ত, ভানুদেব: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপটঃ ভারত,* কলকাতা, মনীষা, ২০১৫।

দে, জীবন: *আমার জীবনের অক্টোবর,* তুফানগঞ্জ, সীমান্ত প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৭৮।

দত্তগুপ্ত, সমীরণ: *তিস্তাতটরেখা,* কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০।

দে, রমেন্দ্র নারায়ণ (সম্পা): 'দিন বদলের ডাক, অশান্ত কোচবিহার – শান্তি ফিরবে কবে?' *শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৮,* দিনহাটা, কোচবিহার, অনামিকা প্রেস, ১৪১২।

নন্দী, ভাস্কর: উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালী, কামতাপুরি এবং আদিবাসী-ঝাড়খন্ডী পরিচিতি, সি পি আই (এম-এল) প্রকাশনী, সন্তোষ রাণা কতৃক ১২১/৩ পূর্বাচল কালীতলা রোড, কলকাতা।

জোতদার্‌র্স এসোসিয়েসন: সাধারণ সভার নির্দ্ধারণ, জলপাইগুড়ি, ১৯/০৪/১৯২৩ ইং।

প্রধান, অমর রায়: *জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে,* মালদা, সংবেদন, ২০১২, (আনন্দ গোপাল ঘোষ, কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর [সম্পা.])।

প্রধান, অমর রায়: *উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ,* হলদিবাড়ি, কোচবিহার, দৈনিক বসুমতী, ২০০০।

পাল, হরিশ্চন্দ্র (সম্পা): *উত্তরবাংলার পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খণ্ড,* কলকাতা, স্যান্যাল য়্যান্ড কোম্পানী, ১৩৮০।

প্রধান, তপন রায়: *রাজবংশী লোককথা,* কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০৩।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৪।

বর্মণ, অভিজিৎ: *বাথান,* কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২০০৯।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* রায়গঞ্জ, রায় প্রিন্টার্স, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৬।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *উত্তর-বাংলার সেকাল ও জীবন-স্মৃতি,* জলপাইগুড়ি, শ্রীদূর্গা প্রেস, ১৩৯২।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* জলপাইগুড়ি, ১৯৪১।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* কলকাতা, নিউ ভারতী প্রেস, চতুর্থ সংস্করণ- ২৭শে মাঘ, ১৪০১।

বর্মন, পরিমল; বর্মন, কানু (সম্পা): লোক-উৎস, ভান্ডানী পূজাসংখ্যাঃ এক, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, রায় কম্পিউটার প্রেস, *শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি,* ১৪১৭।

বর্মন, কানু; বর্মন, অভিজিৎ (সম্পা): উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, ভান্ডানী দ্বিতীয়া সংখ্যা, সোদর, *শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি,* মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, ২০১১।

বর্মন, পরিমল: মারেয়া, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বছরকিয়া পত্রিকা, ভান্ডানী তিতিয়া সংখ্যা, *শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি,* কোলকাতা, বিভূতি পিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২০১২।

বর্মণ, হরিমোহন: *উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্য কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য,* রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ১৯৮৯।

বর্মণ, হরিমোহন: *কামতাপুর রাজ্যের কাহিনী,* রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ২০০৫।

বর্মণ, হরিমোহন: *মোর নিজের কাথা,* পশ্চিম খয়ের বাড়ি, রাঙ্গালীবাজনা, আলিপুরদুয়ার, ২০১৯।

বর্মণ, হরিমোহন: *বেকার,* জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০০।

বর্মণ, হরিমোহন: *কামতাপুরী ভাষা,* জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০১।

বর্মণ, হরিমোহন: *মহামানবের কথা,* উত্তরবঙ্গ প্রেস, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, ১৯৯২।

বসু, জ্যোতি: *যত দূর মনে পড়ে,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৫।

বসু, জ্যোতি: *নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

বসু, জ্যোতি: *বামফ্রন্ট সরকার ১৫ বছর,* কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৩।

বিশ্বাস, অনিল: *কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মতাদর্শ,* কলকাতা, এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

বিশ্বাস, কান্তি: *আমার জীবনঃ কিছু কথা,* কলকাতা, একুশ শতক, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, ২০১৪।

বেরা, অঞ্জন (সম্পা): *জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ,* প্রথম খন্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী): *কৃষকের হাতে জমি চাই,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স, প্রাঃ লিঃ, ২০০৫।

ভট্টাচার্য, কঙ্কণ: *নিবারণ পণ্ডিতের গান,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০০৮।

মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র: *ভারতের কমিউনিস্ট (মাকর্সবাদী) চিন্তাধারা ও তার পরিণতি,* কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২০১২।

মুখার্জি, মানিক: *উত্তরবঙ্গের জনজীবনের বর্তমান সমস্যা প্রসঙ্গে,* কলকাতা, গণদাবী প্রিন্টার্স এন পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৫।

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনারায়ণ: *পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা,* দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল, কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৩।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা): *পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৪।

মুখোপাধ্যায়, সরোজ: *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫।

মুখোপাধ্যায়, সুধীর; ঘোষ, নৃপেন: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৮৫।

রায়, ব্রজেন্দ্র নাথ: *মৈশালবন্ধু,* কোচবিহার, কোচবিহার সমাচার প্রেস, (নৃপেন্দ্র নাথ পাল, [সম্পা.], কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী), ১৯৮৫,

রায়, চারু চন্দ্র: *চারুরায়ের দারোগাগিরি,* কোচবিহার, প্রণতি বুকস্‌, ১৯৯০।

রায়, নিখিলেশ (সম্পা): *ডেগর,* ভাষা-সাহিত্যে-সংস্কৃতির নয়া দুনিয়া, পথথম বর্ষ, দুতিয়া সংখা, শিবমন্দির, দার্জিলিং, নর্থ বেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, ২০০৪।

রায়, গিরিজাশঙ্কর: *প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গঃ লোকসাহিত্য,* জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ১৯৮৩।

রায়, গিরিজাশঙ্কর (সম্পা): *সাতভাইয়া* (রাজবংশী কবিতা সংকলন), শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ২০০৩।

লাহিড়ী, অবনী: *তিরিশ চল্লিশের বাংলা, রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে,* কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯।

সিংহ, সন্তোষ: *দোতোরার ডাং,* শিলিগুড়ি, রাজবংশী একাদেমি, ২০১২।

সাহা, সঞ্জয় (সম্পা): *তিতির একটি সাহিত্য পত্রিকা,* অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৯।

সেন, রণেন: *বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, (১৯৩০-৪৮),* কলকাতা, বিংশ শতাব্দী, ১৯৮১।

সেন, রণেন: *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪),* কলিকাতা, বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ১৯৯২।

সেন, মণিকুন্তলা: *সেদিনের কথা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

সেন, মিনতি; গুপ্ত, শুভাশিষ: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, দেশভাগ পর্যন্ত, কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৬।

সেন, মিনতি; গুপ্ত, শুভাশিষ: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৪৭-১৯৫৩, কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৭।

সেন, মিনতি; গুপ্ত, শুভাশিষ: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* তৃতীয় খন্ড, ১৯৫৪-১৯৫৮, কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৮।

সুরজিৎ, হরকিষাণ সিং: *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, জয়ন্ত: *পশ্চিমবঙ্গঃ জমি আন্দোলন ও ভূমি সংস্কার,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

হোড়, সোমনাথ: *তেভাগার ডাইরি ও চা-বাগিচা কড়চা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯১।

ইংরাজি বই ও সরকারি রিপোর্ট (প্রকাশিত)

Banrjee, Dilip: *Election Recorded, An analytical Reference, Bengal, West Bengal, 1862-2012,* vol- 1, Kolkata, Star Publishing House, Sixth Edition, 2012.

Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook Kuch Bihar, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook Jalpaiguri, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Census of India, 2011, West Bengal Series 20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook North Dinajpur, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook South Dinajpur, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Chowdhury, H. N.: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement,* Cooch Behar, the Cooch Behar State Press, 1903.

Dutt, R. Palme: *India Today*, Bombay, People's Publishing House LTD. 1949.

Floud, Francis: Report of the Land Revenue Commission, Bengal, vol-I, Alipore, Bengal Government Press, 1940.

Ghoshal, Sarat Chandra: *A History of Cooch Behar, from the earliest times to the end of eighteen century A.D.*, Cooch Behar, The State Library Press, 1949.

Grierson, George Abraham: Linguistic survey of India, Vol-V, Part-I, Specimen of the Bengali and Assamese Language, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1903.

Gruning, J. F.: Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Jalpaiguri, Allahabad, 1911.

Hunter, W.W.: *A statistical account of Bengal,* vol x, London, Trubner & Co., 1876.

Malley, L.S.O.': *Indian Caste Custom,* পুর্নমুদ্রণ, London, Cambridge University Press, 2013.

Majumder, Durgadas: *West Bengal District Gazeteers,* Kuch Bihar, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1977.

Martin, Montgomary: *The History, Antiquity, Topography and Statistic of Eastern India,* Landon, W.H. Allen and Co. 1838, পুর্নমুদ্রণ, Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Risley, H. H.: *The Tribes and Castes of Bengal,* vol 2, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1892.

গৌণ উপাদান

বাংলা বই ও প্রবন্ধ

কবিরাজ, সুদীপ্ত: *মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান,* কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২২।

গোস্বামী, কমলেশ (সম্পা): *বিদ্রোহ ও আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা, প্রিয়া বুক হাউস, ১৪২০।

ঘোষ, শৈলেন্দ্র কুমার: *গৌড় কাহিনী,* কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৭।

ঘোষ, আনন্দ গোপাল: *উত্তরবঙ্গের নামের সন্ধানে,* শিলিগুড়ি, এন. এল. পাবলিশার্স, ২০০৬।

ঘোষ, আনন্দ গোপাল; দাস, নীলাংশুশেখর (সম্পা): *সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহঃ প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ,* মালদা, সংবেদন, ২০১১।

চন্দ্র, অমিতাভ: 'ষাটের দশকে ভারতের কমিউনিস্‌ট পার্টির প্রথম বিভাজন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমান্তরাল প্রয়াস: একটি পর্যালোচনা', অনিরুদ্ধ রায় (সম্পা.): ইতিহাস অনুসন্ধান- ১৯, *কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।*

চন্দ্র, অমিতাভ: 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩৫-১৯৩৯)', গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, *কলকাতা: কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০।*

চাকী, দেবব্রত (সম্পা): উত্তর প্রসঙ্গ, একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০১১।

চাকী, দেবব্রত (সম্পা): *উত্তর প্রসঙ্গ, একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ধর্মী জার্নাল,* ১৩ বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ: নাগরিক, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০২১।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ: *'কৃষকবিদ্রোহ ও রাষ্ট্র বিপ্লব*, অনিল আচার্য (সম্পা): তিন দশকের গণআন্দোলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৮।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার: *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* কলকাতা, মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

জামান, বদিউজ্ (সম্পা): *রংপুর গীতিকা,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাদেমি, ১৩৭৮।

ডাকুয়া, অরবিন্দ: *রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা,* আলিপুরদুয়ার জংশন, উপমহাদেশ পাবলিকেশন, ২০১৫।

দাস, সুকুমার: *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস,* কলকাতা, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৮২।

দাস, প্যারীমোহন: *ইতিবৃত-তত্ত্ব বা আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসা,* কলিকাতা, ললীত প্রেস, ১৩২২।

দাশ, সুস্নাত: *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও অবিভক্ত বাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,* প্রথম খণ্ড, (১৯২০-১৯৪১), কলকাতা, নক্ষত্র প্রকাশন, ২০১৮।

দাশ, সুস্নাত: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* কলকাতা, নক্ষত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭।

দাশ, চিত্তরঞ্জন: *পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি,* দঃ ২৪ পরগনা, মোক্ষদা প্রিন্টিং অ্যান্ড পেপার মার্ট, ২০০৯।

দাসগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পা): *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৮।

দত্ত, পরিতোষ; সরকার, চিত্রভানু (সম্পা): *উত্তরবঙ্গের রাজনীতি হিংসা ও সম্প্রীতি,* সহজ পাঠ, বি/১৩৮ ডি বাঘাযতীন বাজার, কলকাতা, ২০০১।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ: *বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন),* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০২০।

দত্ত, সত্যব্রত: *বাংলার বিধানসভার একশো বছর, রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২।

ধর, কমলেন্দু (সম্পা): স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, দেশকাল, ১৯৫৯।

দেব, রণজিৎ: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০১৪।

দুবে, এস. সি.: *ভারতীয় সমাজ,* ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ১৯৯৬।

বর্মণ, রূপ কুমার: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯।

বর্মণ, রূপ কুমার: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২।

বর্মন, ক্ষিতীশ চন্দ্র (সম্পা): *ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক,* কলকাতা, বীনাপাণি প্রেস, ২০০১।

বর্মা, ধর্মনারায়ণ: *কামতাপুরী ভাষা-সাহিত্যের রূপরেখা,* তুফানগঞ্জ, কুচবিহার, অন্তময়ী প্রিন্টার্স, ১৪০০।

বর্মা, যূথিকা: *জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা, সোপান, ২০২১।

বসু, সজল: *বাঙ্গালী জীবনে দলাদলি,* কলকাতা, কল্পন, ১৯৮৬।

বসু, নির্মলকুমার: *হিন্দু সমাজের গড়ন,* কলিকাতা, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।

বড়াল, মনোরঞ্জন: *প্রসঙ্গঃ তফশিলভুক্তদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা,* কলিকাতা, পথসংকেত প্রকাশনা, ১৯৯০।

বিশ্বাস, অশোক: *বাংলাদেশের রাজবংশীঃ সমাজ ও সংস্কৃতি,* ঢাকা, বাংলা একাদেমি, ২০০৫।

বিশ্বাস, বিপদ ভঞ্জন: *ভারত বিভাগ যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর,* কলিকাতা, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ২০০৩।

বেতেই, আন্দ্রে: *'কৃষি ব্যবস্থায় শ্রেণীর স্বরূপঃ জোতদারদের কথা'*, অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা): বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, কলকাতা, *কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,* ২০১৮।

বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ: *গোসানীমঙ্গল,* (নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পা.) কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২)।

ভদ্র, গৌতম; চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা): *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

ভদ্র সুজাতা; মন্ডল, পূর্ণেন্দু: *পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যা, ১৯৭৭-২০১০,* একটি সমীক্ষা, কলকাতা, ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ২০১৩।

ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা): *মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা,* ত্রয়োদশ বর্ষ, কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০।

ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা): *মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা,* ১৩৯৪।

ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা): *আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা, সমীক্ষা প্রকাশন, ২০০২।

ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রনারায়ণ: *জাতিভেদ,* কলকাতা, পি সি চক্রবর্তী এন্ড ব্রাদার্স, ১৩২৫।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র: *বাংলাদেশের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, দিব্য প্রকাশন, ২০১৭।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র: *বাংলাদেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭।

মোহাম্মদ, হাসান: *কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,* ঢাকা, ডানা পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

রায়, গিরিজাশংকর: *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ,* কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০১৫।

রায়, দীপক কুমার: *মনীষী পঞ্চাননের ক্ষাত্র আন্দোলন-অনালোচিত অধ্যায়,* চাঁচল, মালদা, কল্যানী পাবলিকেশন, ২০১৩।

রায়, দীপক কুমার: *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন বর্মা,* কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, ২০১৬।

রায়, জ্যোতির্ময়: *রাজবংশী সমাজদর্পন,* কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, ২০১২।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন,* মালদহ, নর্থ ইষ্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৯।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গের লোকজীবন চর্যা,* কলিকাতা, ভোলানাথ প্রকাশনী, ১৩৬২।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গ, উনিশ ও বিশ শতক,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫।

রায়, ধনঞ্জয় (সম্পা): *তেভাগা আন্দোলন,* কলকাতা, আনন্দ পাবলির্শাস, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৭।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,* কলকাতা, দে'জ পাবলির্শিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬।

রায়, নীহাররঞ্জন: *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫।

রায়, রণজিৎ: ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ: কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন, কলকাতা, নিজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫।

রায়, সুপ্রকাশ: *তেভাগার সংগ্রাম,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১।

রায়, হরিপদ: *গণ আন্দোলনে কোচবিহার,* কলকাতা, অ্যালবাট্রস, ২০১৯।

রূদ্র, অশোক: *'ভুমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন'*, কললেন্দু ধর (সম্পা): স্বাধীনতার-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, দেশকাল, ১৯৫৯।

রহমান, বজলে: *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ,* কলকাতা, শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশন, ২০০৮।

সরকার, ইছামুদ্দিন (সম্পা): *ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ,* আসাম, এন এল পাবলিশার্স, ২০০২।

সেন, ক্ষিতিমোহন: *জাতিভেদ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।

শর্মা, উমেশ: *জলপাইগুড়ির ইতিহাস,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৮।

ইংরাজি বই ও প্রবন্ধ

Barman, Rup Kumar: *Contested Regionalism*, A new look on the History, culture Change, and Regionalism on North Bengal and Lower Assam, Delhi, Abhijeet Publications, 2007.

Barman, Rup Kumar: *From Tribalism to State*, Reflections on the emagence of Koch-kingdom, (early fifteen to 1977), Delhi, Abhijeet Publications 2007.

Barman, Rup Kumar: *Partition of India and its impact on Scheduled Castes of Bengal,* New Delhi, Abhijeet Publications, 2012.

Barman, Rup Kumar: *Caste Class and Culture: The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh*, New Delhi, Abhijeet Publications, 2020.

Barman, Rup Kumar: 'Right-Left Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Election (from 1920 to 2016)', *Contemporary Voice of Dalit, Vol-10, Issue-2,* 216-231, Sage Publication, 2018.

Basu, Swaraj: *Dynamics of a Caste Movement, the Rajbansis of North Bengal, 1910-1947,* Delhi, Manohar, 2003.

Barma, Sukhbilas: *Indomitable Panchanan, an objective study on Rai Saheb Panchanan Barma,* New Delhi, Global Vision Publishing House, 2017.

Bandyopadhyay, Sekhar: *Caste, Potest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal, 1872-1947,* New Delhi, Oxford University Press, 2011.

Bandyopadhyay, Sekhar: *Caste, Culture and Hegemony, Social Dominance in Colonial Bengal,* New Delhi, sage Publication, 2004.

Bhattcharyya, Moumita Ghosh: '*The story of the lives and sufferings of the Rajbanshis of North Bengal'*, Debi Chaterjee (ed): Voice of Dalit, Vol 2, No 2, Kolkata, MD Publictions Pvt. 2009.

Bhattacharya, Jogendra Nath: *Hindu Caste and Sects, An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system.* Calcutta, Thacker, Spink and Co. 1896.

Bose, Sugata: *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947,* Landon, Cambridge University Press, 1986.

Chandra, Uday; Geir Heierstad and Kenneth Bo Neilsen (eds.): *The politics of Caste in West Bengal,* New Dilhi, Routledge, 2016.

Cooper, Adrienne: *Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal, 1930-1950*, Calcutta, K.P. Bagchi & Company, 1988.

Chaterji, Sunity kumar: *Kirata Jana Kriti*, Calcutta, Asiatic Society, 1951.

Chatterjee, Parth: *Bengal 1920-1947, Land Question,* Volume one, Calcutta, K P Bagchi & Company, 1984.

Chatterjee, Parth: *Nation and its Fragments, Colonial and Postcolonial Histories*, New Jersey, Princeton University Press, Princeton, 1993.

Chatterjee, Parth: *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism*, New Delhi, Oxford University Press, 1997.

Chatterjee, Parth: *Empire & Nation,* Himalayana, Permanent Black, 2010.

Chaterjee, Partha: '*Partition and Mysterious disappearance of Caste in Bengal'*, Uday Chandra, Geir Heierstad and Kenneth Bo Neilsen (eds): The politics of Caste in West Bengal, New Dilhi, Routledge, 2016.

Chatterji, Joya: *Bengal Divided Hindu Communalism and Partition, 1932-1947,* New York, Cambridge University Press, 1994.

Chatterji, Rakhahari (ed.): *Politics in West Bengal: Institutions, Processes and Problems,* Calcutta, The World Press Private Limited, 1985.

Chatterji, Rakhahari & Basu, Partha (ed.): *West Bengal Under The Left: 1977-2011*, New York, Routledge, 2020.

Choudhary, Profulla Roy: Left experiment in West Bengal, New Delhi, Patriot Publishers, 1985.

Dasgupta, Rajarshi: 'The CPI (M) 'Machinery' in West Bengal: Two Village narratives from Kochbihar and Malda', *Economic & Political Weekly*, Vol- XLIV, No- 9, February 28, 2009.

Dasgupta, Abhijit: *Land and Politics in West Bengal: A sociological study of a multi-caste village,* Doctoral thesis, University of Sussex, 1980.

Das Gupta, Ranjit: Economy, *Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947,* Delhi, Oxford University Press, 1992.

Das, Dhirendra nath: *Regional Movements, Ethnicity and Politics,* Delhi, Abhijeet Publication, 2005.

Das, Samir, Kumar: 'Living the Absence, The Rajbanshi of North Bengal', *Mumbai, Tata Institute of Social sciences, TISS working Paper No. 5*, March 2015.

Debnath, Sailen: The Koch-Rajbanshis from Panchanan to Greater Cooch Behar Movement, New Delhi, Aayu Publications, 2016.

Debnath, Sailen (ed): Social and Political Tensions in North Bengal (Since 1947), Siliguri, N. L. Publishers, 2007.

Dhanagare, D. N.: *Peasant Movement in India: 1920-1950,* New York, Oxford University Press, 1983.

Dirks, Nicholas B.: *Caste of Mind, Colonialism and the making of modern India,* New Jersey, Princeton, 2001.

Dutta, Nripendra Kumar: *Origin and Growth of Caste in India,* Calcutta, The book Company. Lm., 1931.

Dutta, *Nripendra* Kumar: *Origin and Growth of Caste in India,* vol. II, Castes in Bengal, Calcutta, Firma K.L.Mukhopadhyay, 1969.

Dumont, Louis: *Homo Hierarchicus, the Caste system and its implications*, New Delhi, Oxford University Press, 1998.

Franda, Marcus F.: Radical Politics in West Bengal, London, M.I.T. Press, 1971.

Franda, Marcus F.: Political Development and Political Decay in Bengal, Calcutta, K. L. Mukhopadhyay, 1971.

Gandhi, Leela: *Affective Communities, Anti-colonial Thought and the politics of Friendship,* Duke University Press, 2006.

Gait, Sir Edward: A History of Assam, Indian Reprints, Guwahati, EBH Publishers, 2008.

Guha, Ayan: 'Beyond conspiracy and coordinated ascendancy': Revisiting Caste question in West Bengal under Left Front Rule (1977-2011), '*Contemporary Voice of Dalit'*, Sage Publication, India (Pvt) Ltd. 2021.

Gupta, Amit: Crises and Creativities: Meddle-Class Bhadralok in Bengal 1932-52, Hydrabad Orient Blackswan, 2009.

Guru, Gopal; Sarukkai, Sundar: *The Cracked Mirror, an Indian Debate on experience and theory,* New Delhi, Oxford University Press, 2012.

Joseph, Miranda: *Against the Romance of Community,* London, University of Minnesota Press, 2002.

Karve, Irawaty: *Hindu Society-An Interpretation*, Poona, Sangam Press Private Ltd., Deccan College, 1961.

Kundu, Narattom: *Caste and Class in pre- Muslim Bengal, studies in social History of Bengal*, Doctoral Thesis, London, University of London, 1963.

Mallick, Ross: *Development policy of a Communist government: West Bengal since 1977,* London, Cambridge University Press, 1993.

Mukherji, Partha: 'Study of Social Conflicts, Case of Naxalbari Peasant Movement', *Economic and Political Weekly,* Vol. 22, No. 38, *Sep. 19, 1987.*

Paz, Octavio: In light of India, London, The Harvill Press, 1955.

Ray, Anuradha: *Cultural Communism in Bengal 1936-1952*, Delhi, Primus Books, 2014.

Rao, Anupama: *The Caste Question, Dalits and the Politics of Modern India,* Ranikhet, permanent Black, 2012.

Roy, Subhajyoti: *Jalpaiguri under Colonial rule, 1765 to 1948,* Doctoral thesis, London, University of London, 1997.

Ruud, Arild Engelsen: *Poetics of Village Politics, the Making of West Bengal's Rural Communism,* London, Oxford University Press, 2003.

Sanyal, Hitesranjan: *Social Mobility in Bengal,* Calcutta, Papyrus, 1959.

Xaxa, Virginius: Agrarian Social structure and Class relations in two villages of Jailpaiguri District: A comparative study of the subsistence and Plantation settings, Doctoral thesis, Department of Humanities and Social sciences, Indian Institute of technology, Kanpur, 1978.

সাক্ষাৎকার

বর্মণ, বলেন [৫৯], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

বর্মণ, হরিমোহন [৭০],*সাক্ষাৎকার,* রাঙ্গালীবাজনা, আলিপুরদুয়ার, ২০১৯।

রায়, সদানন্দ [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* ভাঐরথানা, শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৮।

রায়, মহিম [৬২],*সাক্ষাৎকার,* কইমারি, শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৯।

নাথ, প্রদীপ [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

রায়, শরৎ [৭৩],*সাক্ষাৎকার,* গোলকগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

পাল, নৃপেন [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৯।

লস্কর, গোপাল [৬১], *সাক্ষাৎকার,* পচাগড়, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

কচুমুদ্দিন, হাজি [৯৮],*সাক্ষাৎকার,* চান্দামারি, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

আসোয়ার, ধনবর [৬১], *সাক্ষাৎকার,* চান্দামারি, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

বর্মণ, চন্দ্রমোহন [৭০], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

বর্মণ, সাতারু [৭০], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০২০।

বর্মণ, ডোলগোবিন্দ [৬৮], *সাক্ষাৎকার,* জটামারি, শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৯।

অধিকারী, শ্যামল [৪২], *সাক্ষাৎকার,* জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

বর্মণ, মন্টু [৬১], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

আলি, ইউসুফ [৭৫], *সাক্ষাৎকার,* জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০২০।

চৌধুরি, অরুন [৬৩], *সাক্ষাৎকার,* পচাগড়, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

রহমান, বজলে [৬৫], *সাক্ষাৎকার,* কোচবিহার, ২০১৮।

চক্রবর্তী, রবীচরন [৭০], *সাক্ষাৎকার,* এলংমারী, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

রায়, তারিনী [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* কোচবিহার ২০১৯।

শর্মা, উমেশ [৭৭], *সাক্ষাৎকার,* জলপাইগুড়ি, ২০১৯।

মজুমদার, দেবাশিস [৫৪],*সাক্ষাৎকার,* গোলকগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০২১।

সংবাদপত্র
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আনন্দবাজার পত্রিকা
সংবাদ আজকাল

Webliography:
(https://thewire.in/inpolitics/bjp-bengal-elections-amit-shah-koch-rajbanshi-tmc-greater-cooch-behar